কুল্‌টুর্‌কাম্‌প্‌ফ্‌

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি

ডক্টর হিরণ্ময় ঘোষাল

ভারশৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক



এম, সি, সরকার এ্যাণ্ড সন্স লিঃ,

১৪, কলেজ স্কোয়ার,

কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ, ১৩৫২

দাম তিন টাকা

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
মুদ্রাকর : শ্রীসুধাংশুরঞ্জন সেন, ট্রুথ প্রেস, ৩ নন্দন রোড, কলিকাতা।

কুল্‌টুর্‌কাম্‌প্‌ফ্

হিরণ্ময় ঘোষালের অন্যান্য গ্রন্থ :

মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায় (প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি) ৩৲

হাতের কাজ (গল্প-সমষ্টি) ১।০

শাকান্ন (গল্প-সমষ্টি) ১৷৵০

দিবানিদ্রা (গল্প-সমষ্টি) ১।০

ছেলেমানুষি (ছোটদের ; যন্ত্রস্থ)।

বন্ধুবর শ্রীমান গোবিন্দপ্রসাদ ঘোষের উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্য ব্যতিরেকে এই গ্রন্থ লেখা বা প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। তাঁকে ভূরি ভূরি সাধুবাদ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

গ্রন্থকার।

সভ্যতার পরাকাষ্ঠা সংস্কৃতি

Mamusi

বিগত শতকের মধ্য-ইউরোপের ইতিহাসে যতগুলি ধস্তা-ধস্তি বা কাম্প্ফা-কাম্প্ফির পরিচয় পাই, তাদের মধ্যে জার্মানীর Kultur-kampf অন্যতম। কাতলিক যাজকদের কব্জা থেকে ধর্মস্থানগুলিকে মুক্ত করবার অভিপ্রায়ে তৎকালীন জর্মান ফ্যুরার বিস্মার্ক্ এমন একটি কাম্প্ফ্‌কে চালু করলেন, যার মন্ত্রবলে ওদেশের পাদ্রীবৃন্দ অচিরেই ধরাশায়ী হলেন। বিস্মার্কের সাফল্যের গোড়ার কথাই হলো তাঁর সংগ্রামের নাম-মাহাত্ম্য। Kampf বা সংগ্রামের সঙ্গে Kultur বা "সংস্কৃতি", এই বীজমন্ত্রটি যুক্ত না থাকলে তিনি এই অভিনব ধর্ম-জহাদে জয়লাভ করতে পারতেন কিনা তা সন্দেহের বিষয়। Kultur-এর প্রসাদে তাঁর কাম্প্ফে আপামরসাধারণ সকলেরই আন্তরিক সহানুভূতি স্বতঃস্ফূরিতরূপে অবাধে বর্ষিত হলো।

পাদ্রীদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে বিস্মার্ক্ বিজয়ী হলেন, কিন্তু তাঁর কাম্প্ফ্ বিরত হলো না। সহসা জর্মান জাতি আপন সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠলো। শিক্ষা ও সভ্যতায় জার্মানীর অবদান আজ পর্যন্ত কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি অস্বীকার করেছেন বলে মনে হয় না। যান্ত্রিক ও রাসায়নিক আবিষ্কার-ক্ষেত্রে তো বটেই অপিচ আধুনিক দর্শন

ও চিন্তায় আজ ইউরোপের যে এই অপ্রতিহত অগ্রগতি, সেই প্রগতির অক্ষদণ্ডই যে জার্মানী, সে বিষয়ে বুদ্ধির অনুষ্ণ বিচারে মতদ্বৈধের স্থান নেই। কিন্তু এই Kultur-এর সঙ্গে Kampf যুক্ত হয়ে এমন একটি সঙ্কর আদর্শ জন্মলাভ করলে যার প্রসাদে সাধারণ জার্মানের সদ্বুদ্ধির কিয়ৎ বিলোপ ঘটলো। Kulturkampf-এর ঐতিহাসিক অর্থ ক্রমে শব্দ-তাৎপর্যে পর্যবসিত হলো। অর্থাৎ উক্ত শব্দদ্বয় উচ্চারণ মাত্রেই হান্‌স্‌, পাউল্‌ বা হাইন্‌রিশ্‌-এর মনে এই ধারণার উদয় হলো যে, সে একজন জার্মান, তার Kultur আছে, এবং সেই Kulturকে জগতের সর্বত্র বিস্তৃত করার জন্যে Kampf চালানো তার জন্মগত অধিকার।

ঠিক এই সময়েই Kultur-ব্যবসায়ী জর্মান জাতি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলে যে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে সে জগৎ-বরেণ্য হওয়া সত্বেও পীনোম্নী কামধেনুরূপ এই যে পৃথিবী তার প্রায় সবকটি ক্ষীরনালীই ইংরেজ ও ফরাসীদের হস্তগত হয়েছে। অর্থাৎ কাঁচা-মাল-উৎপাদক ভূখণ্ডের সবটুকুই অধিকৃত হয়েছে, এবং পাকা-মাল মোলনেওয়ালা পীত, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণাভ নেটিভরা রাষ্ট্রিক কানূন অনুসাবে হয় ব্রিতানী নয় ফরাসী প্রজারূপে স্বীকৃত হয়েছে। অন্যথা, জ্ঞান ও সংস্কৃতির চর্চায় ব্যাপৃত জার্মানরা ঔপনিবেশিক বিস্তার কার্যে সত্যই বাস্‌ কেল করেছে।

ঔপনিবেশিক অধিকার-বিস্তারে ইংরেজ ও ফরাসীরা যদি আর্থিকরূপে লাভবান হয়ে থাকে, তাহলে সুসংস্কৃত জর্মান জাতির কর্তব্য এইটুকু প্রতিপন্ন করা যে, একাজে তাদের লক্ষ্য কাঁচা মাল আমদানী করে পাকা মাল রপ্তানী করা নয়, পরন্তু বিশ্বের সুদূর প্রান্তে জর্মান সংস্কৃতির রোশ্‌নাই বিকীর্ণ করা। তবে আনুষঙ্গিকরূপে যদি কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য করা যায়, তাতে তাদের আপত্তি নেই। জর্মান জাতির এই

মিশনের নামই Kulturkampf. Kampf এই জন্যে যে এ-কাজ বিনা যুদ্ধে সম্ভবপর নয়।

বিগত মহাযুদ্ধে বিস্মার্কের নীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত সম্রাট্ ভিল্হেল্ম্ যে Kulturkampf চালিয়েছিলেন, সে-কথা কারো অজ্ঞাত নেই। এবং জার্মানীর পরাজয়ে যে এই অপূর্ব সংস্কৃতিকে বিশ্বজনের পাতে দেওয়ার সুযোগ ঘটলো না, সেই দুঃখে সমগ্র জর্মান জাতি বিশ বছর ধরে গুমরে গুমরে মরেছে। হিট্লারের প্রসাদে তার সে দুঃখ ঘুচলো। মাইন্ কাম্প্ফ্-এর প্লান মাফিক্ প্রায় সমগ্র ইউরোপে কুল্টুর্কাম্প্ফ্ চালু হলো।

জর্মান অধিকারে পোলদেশে সংস্কৃতি-সংগ্রামের যে আকৃতি অহরহ চোখে পড়েছে তারই স্বল্প-বিস্তারিত বিবৃতি লিপিবদ্ধ করলাম।



১৪ই অক্টোবর, ১৯৩৯ সাল।

চার শ' মাইল পায়ে হেঁটেও পোলদেশ থেকে বেরবার পথ পাওয়া গেল না। ভারশৌ-এ ফিরছি।

মস্ত্ ক্যোর্বেজ্যা, ভীস্লার ওপর ঐ পুলটা পার হলেই শহর।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সাতটার পর পথ চলবার হুকুম নেই। হেমন্তর মাঝামাঝি হঠাৎ শীত এসে পড়েছে। টিপ্‌টিপিনী বৃষ্টি নেই, রাশি রাশি হাল্‌কা তুষার শূন্যে নিহত পাখীর পালকের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। পায়ের তলায় ভীসলা নদী ধূলোয়-ঢাকা আয়নার মত। যুদ্ধের আগে নদীর ওপার থেকে রাতের ভারশৌ দীপালির ভ্রম ঘটাতো; আজ সেখানে একটি প্রদীপের ক্ষীণ শিখাও নেই। শহরটাকে ওরা এমনিভাবে ধ্বংস করেছে। চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না।

পুল পার হয়ে শহরে ঢোকবার রাস্তা। এতক্ষণ পথ চলার পর মাত্র দুটি মানুষ চোখে পড়লো। পাশ কাটিয়ে যাবার সময়ে কানে এলো—হাল্ট্!—শুনে থমকে দাঁড়াই। জর্মান সান্ত্রীর কর্কশ কণ্ঠস্বর—ভোহীন্?—কোথায়?—শহরে ফিরছি, ৎস্যুরুক ইন্ ভারশাউ।—সন্ত্রস্তভাবে উত্তর দিই।—শহর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম, আবার

ফিরছি। সাতটা বাজতে মিনিট পাঁচেক আছে, একটু পা চালিয়ে চললে বাড়ী পৌছতে পারবো বোধ হয়।

কোথায় বাড়ী?

এই বড় রাস্তাটা পার হয়েই ডান দিকে।

আচ্ছা, যাও, ভাগো জলদি, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে! যাও, যাও, আভি, শ্নেল্‌! হেরাউস্‌!

সান্ত্রীর কাছে যে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তটি এতক্ষণ নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়েছিল, সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা জর্মান ভাষায় বললে—আবের সেহেন সী নিষ্ট্‌, এব্‌ ইষ্ট্‌ য়ুডে—দেখতে পাচ্ছেন না. ইহুদী?—মেয়েমানুষের গলা।

ভাস্‌? য়ুডে?!

য়া, য়া, য়ুডে শ্বাইনেবহুণ্ট্‌!—ইহুদী শোর-কুকুর!—ভদ্র, পরিমার্জিত মেয়েলী গলায় অনভ্যস্ত জর্মান কটু-উক্তি। সুষ্ঠু, সাবলীল দেহের গঠন, দামী ফার-কোটের খাঁজে খাঁজে তনু-রেখার সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। বয়েস পঁচিশের ওপরে নয়। বিশেষ প্রয়োজন না হলে এ সময়ে রাস্তায় বেরতো না। হয়তো আহত স্বামীর খবর পেয়েছে, শহরেব বাইবে কোথাও সেই রাত্রেই পৌছতে হবে। ভাবছি, একে এমন অসহায় অবস্থায় একলা ফেলে পা বাড়াই কী করে? পুল পার হবার পথে জর্মান সান্ত্রী তার গতিরোধ করেছে। তার রূপ যে অন্ধকারেও রাদিউমের মত জল-জল করে! দু'পা গিয়ে হাতের বোঝাটা নামিয়ে রেখে একটু জিরোবার ভান করি। মেয়েটি আবার বলে—ওঃ, এই ইহুদীগুলো আমাদের দেশটাকে ছারখার করে দিলে! ফুারেরের দয়ায় যদি এদের শেষ করা যায় তো এদেশে একটা প্রকাণ্ড কাজ করা হবে। ওহ্‌ ডি য়ুডে, ডি য়ুডে! আমার ক্ষমতা থাকলে নিজের হাতে ওর মাথা ভেঙে দিতাম।

ওহ্‌ য়া, ভারী তেঁদড় ওরা।—সান্ত্রী অনবহিতভাবে উত্তর দেয়।—চুলোয় যাক্‌ গে! আপনি কিন্তু ভারী মুস্কিলে পড়লেন আজকে। শাদে, শাদে, আফশোষ, আফশোষ, সাতটা বেজে গেল। পোল পার হওয়াও হবে না, ফিরে যাওয়াও চলবে না। এইখানেই রাত কাটানো ছাড়া উপায় কী?—বন্দুকের বাঁট দিয়ে ছোট কাঠের কুঠুরীটার দিকে সঙ্কেত করে।—শীত করবে অবশ্য একটু, তবে আমার গ্রেট্‌ কোট আছে, একটু আগুনও জ্বালা যাবে'খন, তারপর মানুষের দেহের উত্তাপও তো আছে, প্রয়োজন হলে—

মেয়েটি কথার ইঙ্গিতটাকে এড়িয়ে যায়—ডাঙ্কে, ডাঙ্কে ঈনেন্‌ ফীল্‌মাল্‌স্‌, প্রচুর ধন্যবাদ। একান্ত সাহায্যের দরকার হলে আপনারা তো আছেনই। কিন্তু, যা বলছিলাম, ঐ ইহুদীটা! রাতে কী মতলব নিয়ে বেরিয়েছে কে জানে?

ভাস্‌? ডের য়ুডে-ডা? ঐ ইহুদীটা? ড্‌, কম্‌ হীর—এই, এদিকে আয়!

হাত ও পিঠের বোঝা নিয়ে আবার ফিরে আসি। সান্ত্রী বন্দুকের বাঁটটা উঁচিয়ে শাসায়—চালাকি করলে মাথাটা গুঁড়িয়ে দেবো, বল তুই ইহুদী কিনা।

পকেটে ব্রিতানী পাস্‌পর্ত্‌, শত্রুবাহিনীভুক্ত না হলেও শত্রুপক্ষীয়। তাই সংক্ষেপে বলতে হয়—না ইহুদী নই।

তবে কী?

পোল।—একটু ইতস্ততঃ করে উত্তর দিই।

মেয়েটি তীব্র প্রতিবাদ করে—দেখছেন না ওর ঢেউ-খেলানো চুল, আর ঐ লম্বা নাক? ন্যাকামীর জায়গা পায় নি! ওদের নিয়ে এতদিন আমরা ঘর করছি, চিনি না ওদের? আমি হলে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ওর মাথাটা গুঁড়িয়ে দিতাম।

য়া, য়া।—সান্ত্রী অন্যমনস্কভাবে সায় দেয়। মানুষের মাথা গোঁড়ানো, সে আর এমন কি শক্ত ব্যাপার! তা ছাড়া, একটা গুলী খরচ করলেই তো ঝঞ্ঝাট চুকে যায়। এই ধরণের অনায়াস প্রভুত্ববোধের সঙ্গে সান্ত্রী আমার দিকে তাকিয়ে আবার শুধালো—ডু, বল্ শিগ্‌গির্ ইহুদী কিনা।—না ইহুদী নই।—উত্তর দিতে সঙ্কোচ হয়। তবুও বলি ইহুদী নই। কথাটা পঙ্গু প্রতিবাদের মত শোনায়। সান্ত্রীর আজ কেমন যেন ইহুদী-শিকারে উৎসাহ নেই। বলে—আচ্ছা যা, ভাগ্, ডবল মার্চ্!

কিছুদূর গিয়ে আবার মেয়েটির কথা শুনতে পাই—ওকে ছেড়ে দিলেন? এমনি করে আপনি আপনার ফ্যুরের ও ফাতেরলান্দের প্রতি কর্তব্য পালন করেন? দেখলেন না, ওর কাঁচুমাচু মুখের ভঙ্গিটা? মুসাফির সেজে গোয়েন্দাগিরি করতে বেরিয়েছে। খাঁটি পালেস্তিনী ইহুদী।

সান্ত্রী আবার হাঁক দেয়—ডু, হাল্ট্! কম্ হীর!

বিপন্ন মেয়েটিকে ছেড়ে যেতে মন সরছিল না। আবার তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াই।

ডু, শোন্। এখানে দাঁড়িয়ে রঙ্গ করবার সময় নেই আমার, বল্ তুই ইহুদী কিনা।

না।

দেখি তোর কাগজপত্তর কী আছে!

সঙ্গে কিছু নেই, পথে হারিয়ে গেছে।

দেখলেন, বলেছিলাম কি না!—মেয়েটি বিজয়গর্বে সান্ত্রীর দিকে তাকায়। তারপর আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলে—আপনি আপনার কাগজপত্তরগুলো ইচ্ছে করে হারিয়ে ফেলেছেন, তাই নয় কী?

না। টাকার ব্যাগে ছিল, পথ চলতে চলতে হয় হারিয়ে গেছে, নয় কেউ চুরি করেছে।

মুখে মুখে গল্প বানাতে পারেন তো বেশ!—তারপর সান্ত্রীকে লক্ষ্য করে মেয়েটি বললে—সাতটা তো বেজে গেল, আপনি এদের ছেড়ে দেবেন কী করে? আটকে রাখুন অন্ততঃ।

জাহান্নমে যাক্‌গে! ঐটুকু ঘরে ক'জনকে আটকানো যায় বলুন! তাছাড়া দু'পা যেতে না যেতেই অন্য সান্ত্রীরা ওদের আটকাবেই, চাই কি তেমন তেমন পাল্লায় পড়লে ওদের খুলিও উড়িয়ে দিতে পারে। বাছাধনরা নিষ্কৃতি পাবে, মনে করেছেন? উঃ আপনাদের দেশে কী ভয়ানক শীত! এমন জানলে কে আসতো, মাইরী বলছি।—তারপর আমাদের দিকে ফিরে বন্দুক উঁচিয়ে টিপ করার ভঙ্গি করে চেঁচিয়ে উঠলো—ডু, য়ুডে, ভাগ্‌ য়হাঁসে, শ্নেল! মার্শ্‌!

ওর ঐ সঙ্গিনীটিকেও ওর সঙ্গে ছেড়ে দিলেন? বেচারী পোল, ও-বেটার খপ্পরে পড়েছে আর কী। আমাদের দেশের কত মেয়েরই যে সর্বনাশ করেছে ওরা···মেয়েটির অন্য কথাগুলো শোনা গেল না।

দূর থেকে সান্ত্রীর শেষ গর্জন তুষার ও ধ্বংসস্তূপের নিঃশব্দ হাহাকার ছাপিয়ে প্রতিধ্বনিত হলো—ভাগ্‌ জল্‌দি, য়ূডে শ্বাইনের্‌হুণ্ট্‌ শ্নেল্‌! মার্শ্‌!

হিংসা-রিপুকে কাম-রিপু পরাভূত করলে। তখন যেমন আজও তেমনি এই প্রশ্নের সমাধান করতে পারি নি:

চিরন্তনের দৃষ্টিতে কার অধিকার আগে, আমার প্রাণ, না মেয়েটির নারীত্বের?

দুর্গপল্লীর পাশ দিয়ে পথ। সাত শ বছরের প্রাচীন রাজদুর্গ স্থাপত্যের সৌন্দর্য, রেখার সমন্বয় ও পরিকল্পনার সারল্যে অতুলনীয় ছিল। তার মাঝখানে ঐ উত্তুঙ্গ মিনার, মাথার ওপর তুলিপের কুঁড়ীর মত চূড়া, পোল স্থাপত্যের স্বকীয় উদ্ভাবন। বহুকালের পুরানো মিনার-ঘড়ী প্রবহমান সময়ের বুকে দিনের আবর্তন-সঙ্কেত নিঃশব্দে এঁকে চলতো বিরামহীন, অগোচর গতিতে। পোল জাতীয় জীবনের প্রতীক এই দুর্গ ভস্মস্তূপ আব ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। প্রাণহীন জীবের দেহে যে ভীতিপ্রদ, নিষ্ক্রিয় জড়ত্ব, দুর্গপল্লীর সর্বত্র দেখি সেই নিষ্প্রাণ রিক্ততা তুষারের শুভ্র কফনের তলায় থম্‌থম্‌ করছে।

মোড়ের ডানদিকে ছিল ভাবাচ্যীন্‌স্কির প্রকাণ্ড রুটির দোকান। সমগ্র পোলদেশে ভাবাচ্যীন্‌স্কির রুটি বিখ্যাত। কত হেরফের তার, শাদা, কালো, গমের তৈরী, যবের তৈরী, মৌরীর ছিটে দেওয়া, কারো গায়ে ছোটো ছোটো কালো জিরে বসানো। ভাবাচ্যীন্‌স্কির রুটির ফরমুলা কারো জানা ছিল না। বিশ্বের সমস্ত রুটি হতে সে সম্পূর্ণ পৃথক, অভিজাত। তার এক টুকরো মুখে দিয়েই বোঝা যেত, এ ভাবাচ্যীন্‌স্কি ছাড়া আর কারো নয়। দোকানটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

বাঁদিকে ছিল একটা পোষাকের দোকান। কলার, টাই, রুমাল ও মোজায় দোকানের মালিকের যে রুচি-বিচার লক্ষ্য করেছি, তা এমন কি প্যারীর খুব শৌখীন দোকানেও দেখা যায় না। ঢুকলে কিছু না কিছু পছন্দ না করিয়ে নিষ্কৃতি দিত না। ভারী কেতাদুরস্ত লোকটি। দোকানে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই এক রকম মিহি, ধাতব গলায় অভিবাদন কানে আসতো—মেয়ে উশানভানিয়ে পান্ন ! দ্রুত সঙ্কুচিতভাবে শোনাতো—ময়ুশানভ্‌ন্তেপ্ল্‌!—বেরবার সময়ে আবার শোনা যেত—ময়ুশানভ্‌ন্তেপ্ল !—লোকটির ঐ খানদানী ভদ্রতা ও ঈষৎ কৌতুকপ্রদ ভাবভঙ্গি সহজেই ক্রেতাকে আকৃষ্ট করতো। সাত-তলা প্রকাণ্ড ইমারৎ-খানার ভগ্নাবশেষ ছাড়া আর কোনো নিশানা নেই। ওরই নীচের তলায় ছোট্ট দোকানটার খবর কে দেবে ? লোকটি হয়তো তার রাশি রাশি শৌখীন পোষাক-পরিচ্ছদ বাঁচাতে গিয়ে জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে।

কিছুদূর গিয়ে থমকে দাঁড়াই। তুষারের ওপর ভোঁতা বুটের চাপা আওয়াজ। জর্মান সান্ত্রীরা শিকারে বেরিয়েছে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখি, আশেপাশে গা-ঢাকা দেবার মতও একখানা বাড়ী নেই। সুধু সামনে রাস্তা পার হয়ে ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীখানার ভগ্নস্তূপ ; যেন তার গায়ে নিবিড় অন্ধকারের ছোট একটা দাগ টানা, হয়তো একটা ভাঙা দরজার খিলেন। পথের ওপর ছাই আর ইটের গাদা, নরম বরফে পেছল হয়ে রয়েছে। পিঠের আধমণ বোঝা নিয়ে মাত্র পঞ্চাশ গজ পথ অতিক্রম করবার অভিজ্ঞতা কখনো ভুলবো না। আতঙ্কটা হয়তো জীবনের জন্যে নয়। মৃত্যুর কদর্যতায় মন তখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কামের স্বেচ্ছাচার, যা অধিকৃত দেশে নিতান্ত দৈনন্দিন হয়ে উঠেছে, তাকে তখনো অত সহজভাবে গ্রহণ করতে শিখি নি। "মাইন্‌ কাম্‌প্‌ফের" সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, "কুল্‌টুর্‌কাম্‌প্‌ফ্‌" তখনো দূরের জিনিষ।

ভাঙা দরজার খিলেনের ভেতর দিয়ে আমরা যে বাড়ীটায় এসে ঢুকলাম তার প্রায় সবটুকুই আমার জানা ছিল। এখানে থাকতেন আমার এক সহকর্মী অধ্যাপক; তিন তলার ফ্ল্যাটে ছিল তাঁর বিরাট গ্রন্থ-সংগ্রহ। স্লাভ ভাষা ও সাহিত্যের অতবড় গ্রন্থাগার খুব অল্প লোকেরই ছিল। নীচের তলার যে-ঘরখানায় আমরা এসে আশ্রয় নিলাম সেখান থেকে বেরবার পথ নেই। ঘরের মেঝের হাত পাঁচ-ছয় কোনো রকমে শূন্যে ঝুলে আছে। বাদবাকী নীচের ভিতকামরার ভেতর ধ্বসে পড়েছে। দেশলাই জ্বেলে অল্প অল্প করে আমাদের পারিপার্শ্বিক আবহের সঙ্গে পরিচয় করে নিই। দেওয়ালের সর্বত্র অগ্নিশিখার কালো লেহন-চিহ্ন। পায়ের তলায় ভিতকামরার গহ্বরের গর্ভে আধ-পোড়া আসবাব আর বিগলিত দেহের সে কী উৎকট দুর্গন্ধ! আক্রমণের সময়ে যারা এই বিশাল অট্টালিকার সুরক্ষিত "আশ্রয়ে" মাথা গুঁজেছিল, তারা হয়তো অনেকেই নিষ্কৃতি পায় নি।

দেওয়ালে পিঠ দিয়ে সন্তর্পণে বসে রাত কাটাতে হয়। সমস্ত পাড়াটা খাঁ-খাঁ করছে। বাইরের পথে কদাচিৎ সান্ত্রীদের চলার শব্দ অন্ধকার তোলপাড় করে দূরে মিলিয়ে যায়। আবার নিস্তব্ধতা ছম্‌ছম্‌ করে সারা রাত। আর অর্দ্ধদগ্ধ, বিগলিত দেহের বিবমিষাকর পূতিগন্ধ।

এ-পাড়ার ঐ দুই বোনকে সবাই চিনতো। ছিপ্‌ছিপে গড়ন, টানা-টানা, দুষ্টামি-ভরা চোখ, স্কার্টের সঙ্গে পুরুষালি ধরণের জ্যাকেট, টাই আর ক্যাপ এক অদ্ভুত আসক্তির সৃষ্টি করতো; কিশোর ও যুবতীর যে-সংমিশ্রণকে আমরা ভয়ে ভয়ে পাশ কাটিয়ে যাই, অথচ যা আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীতে এক দুজ্ঞেয় ও দুর্নৈতিক শিহরণ জাগায় ঐ দু-বোনের চেহারায় ছিল ঠিক সেই ধরণের কী এক প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ। তারা রাস্তায় বেরলে দোকানীরা কন্তোয়ারের ওপাশ থেকে খরিদ্দারকে লক্ষ্য করে চোখ টিপতো, পথের অতিকায় কাঠের বাক্সের ভেতর থেকে সিগারেট-ওয়ালারা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শীতের হাওয়ার বৃশ্চিকদংশন অম্লান বদনে সহ্য করতো, আর নবোন্মেষিত যৌবন যাদের কাছে একটা সমস্যায় দাঁড়িয়েছে এমনতর উঁচু ক্লাসের ইস্কুলের ছাত্ররা তাদের গা ঘেঁসে এগিয়ে যাবার সময়ে বীরোচিত ভঙ্গিতে সামরিক সেলাম ঠুকে মাফ্‌ চেয়ে যেত।

সেদিন ভোরে রাস্তায় পা দিতেই তারা পথরোধ করলে।

পান্‌স্ত্‌ভো! *

পানিয়ে! †

* আপনারা (স্ত্রী ও পুরুষ পক্ষে)।

† আপনারা (স্ত্রী পক্ষে)

আজ ফিরলেন বুঝি ?

না, কাল সন্ধ্যেবেলা। আপনারা কবে ফিরলেন ?

আমরা তো কোথাও যাই নি। চলুন একটু চা করা যাক্।

সামান্য মুখ-চেনা পরিচয় হঠাৎ কেমন করে আত্মীয়তায় পরিণত হয়, আশ্চর্য ! ওরা দুজনে ছাইয়ের গাদা আর ভগ্নস্তূপের পাশ দিয়ে খানকয়েক আধ-পোড়া কড়ির তলা দিয়ে প্রকাণ্ড একটা বাড়ীর উঠোনে এসে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলে—চিনতে পারছেন ?

কী জানি, কত নম্বর বলুন তো।

যদি বলি ছ নম্বর—

তাই নাকি ? সেই যার সামনেটায় প্রকাণ্ড একটা বারান্দা ছিল, যার দোতলার বড় হলে নিত্য নাচের আসর জমতো, আর যার ছাদের ওপর একটা গম্বুজ ছিল, যেটাকে শীতকালে বরফে-ঢাকা পাহাড়ের চূড়োর মত দেখাতো ?

হুঁ, সামনেটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।

আপনারা এইখানেই থাকতেন বুঝি ?

হ্যাঁ, ঐ চারতলার পেছন দিকের অংশটায়।

সিঁড়ির ওপর জায়গায় জায়গায় পোড়া কাঠ আর ছাইয়ের গাদা। বেশ বড় একটা ফ্ল্যাটের দরজাটা ঠিকরে গিয়ে সিঁড়ির আধখানা বন্ধ করে ফেলেছে। বাইরে থেকে মনে হয়, কোনো অবস্থাপন্ন পরিবার বাস করতো এখানে। মেঝের মাঝখানটায় কূপের মত প্রকাণ্ড একটা গর্ত। তার একপাশে বিশাল পিয়ানোফর্তের খানিকটা ঝুঁকে পড়েছে, দানের ওপর তখনো একখানা স্বরলিপি খোলা রয়েছে। ঘরের এককোণে একটা টেবিলে এক রাশ কাফির সরঞ্জাম ছড়ানো, কয়েকটা

কাপ মাটিতে গড়াচ্ছে। দেওয়ালে বড বড় ছবি টাঙানো, এবং গর্তটার ধারে ধারে খুচরো আসবাবগুলো এখনো ঠিক দাঁড়িয়ে আছে।

ওরা বললে, চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না।

ফ্ল্যাটে লোক ছিল নাকি ?

ছিল না? দশ-বারোজনের গোটা একটি পরিবার। তবে ওপরতলাগুলোয় শেষ পর্যন্ত আর কেউ ছিল না।

কী হলো এদের ?—ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি।

সব ঐখানে।—তারা গর্তটার দিকে দেখিয়ে দেয়।

এক সঙ্গে ?

হুঁ। বেশী দিন হবে না, তখন সহরের ওপর ভীষণ আক্রমণ চলেছে। ওরা ঠিক সেই সময়ে দু'চারজন বন্ধুদের ডেকে গানের আসর জমালে। ঐ অত বড় ঘরখানা মানুষে ভর্তী। দেখছেন না, কতগুলো কাফির কাপ? সব এই ঘরে এসে জমা হয়ে গান বাজনায় মেতে উঠলো। আমাদেরও বলেছিল আসতে, বলে, অতবড় বাড়ীখানা একেবারে খা-খা করছে, তাই যারা পড়ে রয়েচি, তারা একসঙ্গে বসে একটু গান-বাজনা করি না আসুন। তা আমাদের আর আসা হয়ে ওঠে নি, একটু বাইরে যেতে হয়েছিল। ফিরে দেখি এই কাণ্ড। ছাদের ওপর বোমা পড়েছিল একটা, ছোট গোছের। সেটা সেইখানেই না ফেটে সটান মেঝে ফুটো করতে করতে এসে এদের সবাইকে নিয়ে নীচের তলায় পড়ে ফেটে গেল। ঐ দেখুন না, কতকগুলো কাপে এখনো একটু একটু কাফি পড়ে রয়েছে।

বাড়ীটার অপর অংশে চারতলার ওপর ওদের ছোট্ট ফ্ল্যাটখানি। সদর দরজার ওপর কালো কালো ধোঁয়ার দাগ। সামনের জানালাটা ইট দিয়ে বন্ধ করা। ওরা বললে—এখানেও আগুন এসে পৌছেছিল,

সামনের ঐ জানলাটা দিয়ে, পাশের বাড়ীটা দাউ-দাউ করে জ্বলছিল কিনা। আমরা দু-বোনে ইট দিয়ে আগুনের ঐ অতবড় হাঁ-টা বুজিয়ে দিলুম। ভাবলে গা শিউরে ওঠে! ঠিক শয়তানের হাঁর মতন দেখাচ্ছিল জানলাটাকে। লম্বা লম্বা লক্‌লকে জিভগুলো এদিকে এসে আমাদের ফ্ল্যাটটাকে চাটবার চেষ্টা করছিল। আর কুল-কুল করে ফুঁ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়বার সে কী ছিষ্টি, মাগো! আমরা বেপরোয়া হয়ে দু-বোনে ঐ খান-খান ইটগুলো তার হাঁয়ের মধ্যে গুজে দিতে লাগলাম। ভাগ্যিস বাড়ী মেরামতের জন্যে ওগুলো এখানে ছিল! যাই হোক্‌, আগুন আর এদিকে আসতে পারে নি। কিন্তু সে কী ভীষণ গরম! মনে হয়, আমরা যেন পুড়ে ঝলসে গেলাম, যেন শয়তানটা আমাদের একটা আভেনে পুরে গেলবার আগে রোস্ট্‌ করে নিচ্ছে।

একটি ঘর ও ছোট একটি প্রবেশ কক্ষ নিয়ে এদের ফ্ল্যাট। পিঠের বোঝা নামিয়ে আমরা একটু স্থির হয়ে বসবার অবকাশ পেলাম। কাল সন্ধ্যা থেকে খাওয়া হয় নি, এবং সামনেই কয়লার স্টোভে একটা বড় কেৎলীতে চায়ের জল ফুটছে। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাত দুটো প্রায় অসাড় হয়ে উঠেছে। অক্টোবর মাসেই সে কী প্রচণ্ড শীত! কদিন ধরে তুষার আর নীহারের বিরাম নেই, শার্শির ওপাশটায় জমা বরফের হাজার রকমের এলোমেলো নক্সা। চায়ের জলের পাশেই একটা বড় পাত্রে কী রান্না হচ্ছে, গন্ধে টের পাওয়া যায় বাঁধা কোপি। এতদিন ধরে চলতি পথই আমাদের ঘরবাড়ী হয়ে উঠেছিল, গৃহাশ্রমের অগ্নিকুণ্ডের কথা আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। তাই এদের এই ক্ষুদ্র সংসারের ঘরোয়া আবহাওয়ায় আমাদের স্নায়ু-অণুস্নায়ুগুলো সহসা শিথিল হয়ে পড়লো, হাজার চেষ্টা করেও মোট-ঘাট নিয়ে উঠে দাঁড়াবার সাহস বা শক্তি সঞ্চয় করতে পারা গেল না।

বড় বোনটি বললে,—ওমা, পান্‌স্তভোর যে খাওয়া হয় নি কাল থেকে! আর আমি বোকার মতন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছি!—বলে সে ছুটি থালায় খানিকটা করে কোপির স্থপ আমাদের সামনে ধরে দিলে।

ভদ্রতা রক্ষা করবার জন্যে আমরাও আমাদের থলে খুলে খানিকটা পাঁউরুটি বের করলাম। হায়, হায়, অত কষ্টে আহৃত রুটিখানায় ছাতা পড়ে একেবারে সবুজমূর্তি হয়ে উঠেছে।

টেবিলের ওপর রাখা আধ-পচা রুটিখানার দিকে ওরা আড়ষ্ট হয়ে তাকিয়ে রইলো।

খানিকক্ষণ পরে ছোট বোনটি বললে—ওটা আপনারা তুলে রাখুন। শহরে রুটি নেই আজ কতদিন! এই আজ ভোরেও তো আমরা বেরিয়েছিলাম যদি পাওয়া যায় এই আশায়। কখনো কখনো চাষারা গাঁ থেকে আনে কিনা।

ও-রুটি কি আর খাওয়া যাবে? থলে-সুদ্ধ ডাস্ট্‌বিনে ফেলে দিয়ে যেতে হবে।

ক্ষেপেছেন! অমন কাজ করবেন না। শহরে দুর্ভিক্ষ চলেছে, সে-খবর আপনারা রাখেন না বুঝি?

কিছু পাওয়া যাচ্ছে না?

কিচ্ছু না! এই নেখুন না, এই কোপিটি কত মারামারি করে সেদিন কিনলাম। এতটুকু মাথাটি, দাম নিলে পাঁচ জ্‌লত্যী (২॥০)। আচ্ছা, দাঁড়ান, রুটিখানাকে আগুনে সেঁকে দি, স্থপ দিয়ে খেতে পারবেন।

ভাগ নিতে হবে কিন্তু।

একেবারেই ছাড়বেন না? আচ্ছা, বেশ।

টোস্ট্‌-করা পচা ব্রাউন রুটি আর কোপি-সেদ্ধ গরম জল, সে এক অপরূপ খাদ্য! এর পর আর চায়ের কথাটা তোলা শোভন হবে না ভেবে

আমরা উঠে দাঁড়ালাম। কারণ চায়ের জন্যে চা-পাতা, দুধ এবং চিনি এরা পাবে কোথায়! যদিও বা থাকে তো বৃথা অপচয়ের প্রয়োজন কী?

আবার আসবেন কিন্তু।—ওরা বিদায় জানায়।

নিশ্চয়ই। আপনাদের ফ্ল্যাটে এসে একদিন চড়াইভাতী করে যাবো। সঙ্গে খানিকটা মাংস নিয়ে এসেছি, দু-এক দিনের মধ্যেই আবার আসবো।

মাংস!—দুই বোনে নির্বোধের শূন্য, চিন্তাহীন দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

আবর্জনা-বহুল, ভাঙা সিঁড়িটা দিয়ে নামবার সময়ে বুভুক্ষা-শীর্ণ দু-খানি মুখের কথা মনে করে ভাবি, ওরা প্রকৃতিস্থ আছে তো?

এই সেই দুই বোন যাদের নিয়ে সমস্ত পাড়াটায় এত কানা-ঘুষো, এত চাঞ্চল্য। এদের বাদ দিয়ে কার্নিভালের সময়ে কেনো নাচের অনুষ্ঠানই সম্পূর্ণ হতো না। এদের নিয়ে কত বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, পুরুষে পুরুষে হয়েছে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। দুষ্টামি-ভরা চোখের নিষ্কলুষ দৃষ্টি হেনে এরা এক অদ্ভুত উপায়ে পুরুষের বুকে কামানার তৃষ্ণা জাগাতো।

বিশাল ধ্বংস-প্রান্তরের মাঝে দগ্ধপ্রায় বাড়ীখানার চারতলার ঐ ছোট্ট ফ্ল্যাটে ওরা দুজনে আবার সংসার পেতে বসেছে। পালিশ-করা নখের চন্দ্রকণা, চাহনির চোখ-ঠারা নিষ্পাপতা এবং নাচের ঐন্দ্রিয়ক, সাবলীল আত্মসমর্পণ ছাড়া এদের জীবনে আর কোনো সমস্যা ছিল না। এরাই আজ পথে পথে রুটি আর বাঁধা কোপির সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আহার্য এদের কোপি-সেদ্ধ সূপ, যে-কোপি দিনের পর দিন নব-নব জলপাত্রে স্বীয় নির্যাসের ক্ষীণ পরিস্রবণে আপন অস্তিত্বকে সপ্রমাণ করে মাত্র।

ভাবি, প্রত্যঙ্গের ক্ষুধার চেয়ে জঠরের বুভুক্ষা যে কত শক্তিমান, শুধু এই নিতান্ত সহজ সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্যেই কি এরা বেঁচে রইলো?

সেদিন সকালে নাকি সপ্তাহখানেক পরে সেই প্রথম রোদ উঠলো। মস্কৌ-অভিযানে নিহত নাপোলেঅঁ-র দীর্ঘাকার ফরাসী সৈনিকের মত প্রাণহীন ভারশৌ তুষারে ঢাকা। উপমাটা কেন মনে এলো, জানি না। শহরের দিকে যতবার তাকাই ততবারই মনে হয় যেন এক বিরাট যোদ্ধার দেহাবশেষ মাটিতে শোয়ানো, বুকের ওপর দু হাত বীরোচিত সম্ভ্রমে আবদ্ধ, মুখে নিবিষ্ট প্রশান্তি। কিছুদূর গিয়ে আবার এক নূতন উপমা মনে আসে। এ যেন কোন্ জহর-ব্রতে আত্মাহুতা নারীর দেহ, দুর্বৃত্তের পৈশাচ ভোগ-লালসার জন্যে দগ্ধপ্রায় অবস্থায় আগুন থেকে টেনে আনা হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের যতটুকু তুষারে ঢাকা ততটুকু মনে এক উত্তুঙ্গ ভাবের সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু যখন চোখে পড়ে তার নীচেকার নগ্ন কদর্যতা, তখন বারে বারে উপমার কদর্থ মনে এক দুরপনেয় দ্বন্দ্ব উপস্থিত করে।

পথে বেরিয়ে প্রতিপদে পথ চলাই অসম্ভব হয়ে উঠলো। এখনো রাস্তা জুড়ে ইট-কাঠের স্তূপ তুষারের প্রচ্ছাদনে গিরিশৃঙ্গের মত অটল-ভাবে পথিকের পথ রোধ করে রয়েছে। তাছাড়া রাস্তার দু-পাশে পায়ে-চলার অংশটুকুর ওপর পথ-সাফ-করা বরফের আবর্জনা জমা হয়ে

মানুষের মাথার সমান পাথরের প্রাচীরের আকার ধারণ করেছে। এবং রৌদ্রের কিরণে সদ্য-দোওয়া দুধের মত যে সামান্য উত্তাপ অনুভব করা যাচ্ছে তাতেই চারিপাশের বরফ আস্তে আস্তে যেন অতি গোপনে ক্লেদাক্ত হয়ে উঠেছে।

দিনের আলোতে রাস্তার দু-ধারের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ীগুলোর দিকে তাকাতে ভরসা হয় না। এক-একখানা পাঁচ-ছ-তলা ইমারতের আধপোড়া কাঠাম যে কী উপায়ে আপাদমস্তক চিড় খেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হয়, এই বুঝি একখানা বাড়ীর পদস্খলন হয়! তার আলসের তলায় তলায় যে জমা বরফের ঝুরি নেমে এসেছিল সেগুলো অল্প অল্প করে গলতে সুরু করেছে। চিড়-খাওয়া ফাটলগুলোর খাঁজে খাঁজে যে-বরফ জমে শক্ত সিমেণ্টের মত কাঠামের দুই বিচ্ছিন্ন অংশের মাঝে নিতান্ত সাময়িক সমঝোতা বজায় রেখেছিল তাও এই অসময়োচিত রৌদ্রের প্ররোচনায় ক্রমে শিথিল হয়ে আসছে।

বেশীর ভাগ বাড়ীরই বাইরের ঠাট ছাড়া কিছু বাকী নেই। জানলা দিয়ে বরাবর আকাশ দেখা যায়। চার-পাঁচ বিঘা পরিসরের এক-একখানা বাড়ী, রাস্তা থেকে দেখা যেতো ফটকের পর ফটক, দু-পাশে সারি সারি দোকান, প্রত্যেকটি যেন স্বয়ং-সম্পূর্ণ সমগ্র একটি জনপদ। এখন যতদূর দৃষ্টি চলে, তার বিস্তীর্ণ আঙিনার স্থানে স্থানে ভস্মস্তূপ। যে দু-একখানা ঘরে এখনো কোনোরকমে মাথা গোঁজা চলে, তাতেই এক-একটি সমগ্র পরিবার এসে আশ্রয় নিয়েছে। চারিপাশের এই নিতান্ত ভঙ্গুর অনিশ্চয়তার মাঝখানে এদের পারিবারিক অগ্নিকুণ্ডের অবস্থিতিসূচক ধূমকুণ্ডলীর দৃশ্য হৃৎকম্প উপস্থিত করে।

এই পতনোন্মুখ ইমারৎগুলির পাশ দিয়ে যাবার সময়ে এদের নীচে

কোথাও একটুকরো কাঠের ওপর আলকাতরায় লেখা জর্মান সতর্কতাবাণী কদাচিত চোখে পড়ে—Achtung !—হুশিয়ার !—কখনো কখনো পোলভাষাতেও লেখা আছে দেখি—Uwaga !—সাবধান !—নিয়ত-চলমান পথিকদের নিরাপত্তার জন্যে অধিকারীবৃন্দ যে এই সামান্য তক্‌লিফ্‌টুকুও স্বীকার করেছেন তার নিদর্শনস্বরূপ এই কাষ্ঠফলকগুলি নয়নাভিরাম সন্দেহ নেই। কিন্তু বাড়ীগুলো এমন রাস্তার ওপর খাড়া রয়েছে, যেখান দিয়ে লোক-চলাচল একেবারে বন্ধ না করে দিলে সাধারণ মানুষের পক্ষে মরণ-বাচন সম্বন্ধে ওটুকু ঝুঁকি নেওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক।

শহরের নয়া-বন্দোবস্তের (Die neue Ordnung) কৌতুক সুধু এইটুকুতেই যে পথ-চলা মানুষের মাথাগুলোর প্রতি সামন্য দৃষ্টি রাখা হয়েছে ; এবং যে-বাড়ী হুমড়ি খেয়ে পড়ে পথিকের কাঁচা উত্তমাঙ্গগুলিকে ডিমের খোলার মত পিষে ফেলতে পারে বলে অধিকারীদের আশঙ্কার উদ্রেক করেছে, সেই বাড়ীরই অন্যান্য অংশে সরকারের পরোয়ানা সমেত সমগ্র এক-এক একটি পরিবার এসে আশ্রয় নিয়েছে।

মানুষ একেবারে নিরাশ্রয় না হয়ে পড়লে আশ্রয়ের মর্ম বোঝে না। সামান্য মাথা গোঁজবার মত একটুখানি জায়গার জন্যে আমরা যে কতখানি বিপদের সম্ভাবনাকে তুচ্ছ করে মৃত্যুর সঙ্গে জুয়া খেলতে বসি, তার প্রমাণ এই আশ্রয়হীন পরিবারগুলি। এরা সবাই পশ্চিম অঞ্চলের লোক, বেশীর ভাগই পজ্‌নান্‌, কাতভীৎসে বা ল্যুজ্‌ থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারশৌএ আশ্রয় নিয়েছে। এদের কারো কারো কাছে শুনি পোলদেশের পশ্চিমাঞ্চল অধিকৃত হবার পর কী-ভাবে এদের আপন আপন ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে আসতে হয়।

যুদ্ধের প্রথম দিকেই জার্মানরা ও-অংশটুকুকে "উত্তরকুরু" বা

রাইখ্-ভুক্ত করে নেয়। এবং এ-কাজটি অবিলম্বে সাধিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা আবিষ্কার করে যে, যে-প্রান্তকে তারা বরাবর জর্মান-অধ্যুষিত বলে ঘোষণা করে আসছিল সেখানে খাঁটি উত্তরকৌরবের সংখ্যা এতই ন্যূন এবং তৎপরিবর্তে জর্মানেতর পোলদের সংখ্যা এতই অধিক যে, তার একটা বিলিব্যবস্থা না করলে যুদ্ধটা যদি তাড়াতাড়ি খতম হয়ে যায় (হিটলার সাহেব তখন বিশ্বাস করতেন, পোলদেশ অধিকার করা হয়ে গেলেই ইংরেজ ও ফরাসীরা তাঁর সঙ্গে সন্ধির কথা পাড়বে; অবশ্য উক্ত শক্তিদ্বয়ের মদদের বহর দেখে তখন অনুরূপ অনুমান নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল) তাহলে জমি-জায়গা নিয়ে তাদের রীতিমত মুস্কিলে পড়তে হবে। কারণ আবার যদি স্থানীয় অধিবাসিদের সংখ্যানুপত্য ও মতামতের কথা ওঠে তাহলে গোলে-হরিবোলে হাতানো মুলুকটুকু আবার বেহাত হয়ে যাবে। অর্থাৎ দেশটা যখন তাদের হাতেই এসে পড়েছে, তখন সেখানকার বাসিন্দারা যে জার্মান সে-কথা অস্বীকার করবে কে? অতএব ভাগাও পোলদের! শত শত বছর ধরে যে-পোলরা সেখানে বসবাস করছিল, এবং গত মহাযুদ্ধের পূর্বেও যখন ও-অঞ্চল জার্মানী-ভুক্ত ছিল তখনও যাদের ভিটে-মাটি-ছাড়া করা হয় নি, এইবার তাদেরই কুকুর-বেড়ালের মত বিদায় করে দেওয়া হলো।

এদের দেশ-ছাড়া করবার উপায়ও দস্তুরমত ফলপ্রসূ, কারণ জীবনে মায়া বলে যে-অনুভূতি মানুষের মনে দ্বিধা সৃষ্টি করে, তার অস্তিত্বের মূলে থাকে সময়। যাকে বা যে-বস্তুকে আমরা সহজে ছাড়তে চাই না তার সঙ্গে বিচ্ছেদ আমরা স্বেচ্ছায় ঘটাতে চাই না এইজন্যে যে, তার সম্বন্ধে নানা কথা চিন্তা করবার সময় পাই। যে সহসা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তার বিয়োগ আমাদের বিচলিত করতে পারে বটে কিন্তু তা আমাদের দৈনিন্দন জীবনে বাধার সৃষ্টি করে না। জার্মানরা

দার্শনিকের জাত বলেই হয়তো মনুষ্য-চিত্তের এই গোপন রহস্যটুকুর খবর রাখতো। তাই মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটিস দিয়ে ও-অঞ্চলের অধিবাসী পোলদের তারা দলে দলে ভিটে-মাটি ছাড়া করেছে।

হঠাৎ সদর দরজার ওপর পড়ে ইস্পাতের মত কড়া গাঁট্টার করাঘাত ও সঙ্গে সঙ্গে রুষ্ট কণ্ঠের অসহিষ্ণু চিৎকার—Machen Sie die Tuere auf! কেওয়াড়ী খোল্ দো!—ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে গৃহস্বামী জর্মান সৈনিকের সামনে দাঁড়ায়।—In zwei Stunde mussen Sie weg gehen, in zwei Stunde, verstehen. Sie?—দু-ঘণ্টার মধ্যে চলে যেতে হবে, দু-ঘণ্টার মধ্যে, বুঝলে?

In zwei Stunde?!

Ja, ja, d'sist klar, nicht?—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এর চেয়েও স্পষ্ট করে বলতে হবে নাকি?—পরে তুহীন কণ্ঠে যোগ করে—Aber, koennen Sie nur eine kleine valise mit nehmen, kein Gold, Silber oder andere Kostbaren—মাত্র একটি ছোট স্যুটকেস্ সঙ্গে নেওয়া চলবে, সোনা, রূপো বা অন্য দামী জিনিষ সঙ্গে নেওয়া চলবে না।—Heil Hitler!

সামান্য পরিচ্ছদ সঙ্গে নিয়ে এরা পথে বেরয় আশ্রয়ের সন্ধানে। দরজার কাছে সান্ত্রী হাঁকে—ফারের ওভারকোট নেওয়া চলবে না।—মেয়েটি তার গায়ের ওভারকোটটি খুলে তার হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে আসে। তারপর সুরু হয় পথ-চলা দিনের পর দিন, রাত কাটে গাছের তলায়। "রাইখ"-ভুক্ত পোলদেশে কে কাকে আশ্রয় দেবে? সবাই ছোট ছোট স্যুটকেস বা পুঁটুলি হাতে করে পায়ে হেঁটে চলেছে ভারশোএর দিকে। পথে অনাহার, মহামারী, তাছাড়া ফ্রাউ-বিরহকাতর জর্মান সৈনিকদের বপুতে অতিরিক্ত পুষ্টিসাধনের ফলে

জমেছে কাম এবং পোল মেয়েদের শরীরে ভগবান দিয়েছেন অপূর্ব সৌন্দর্য ও লালিত্য। পথশ্রান্ত, অনশনক্লিষ্ট, নিরাশ্রয় মেয়েদের ওপর জর্মান গোরাদের বলপ্রয়োগ নিতান্ত মামুলি জিনিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জার্মানদের ঘাঁটি, ছোটখাটো শহর ও গণ্ডগ্রাম এড়িয়ে যখন এরা দু শ আড়াই-শ মাইল পথ হেঁটে ভারশোএ এসে পৌছয় তখন এদের মানুষ বলে চেনা যায় না। সেদিন সকালে পথে বেরিয়ে যাদের দেখি তারা প্রায় সবাই পশ্চিমী পোল। সহস্র সহস্র ছিন্নবাস, শীর্ণদেহ নরনারী, শিশু স্মৃতিভ্রষ্টের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। অতবড় শহরটায় আজ মাথা গোঁজবার মত জায়গা নেই। এরা পাড়ায় পাড়ায় আপন আপন নিকট, দুর ও দুরতর আত্মীয় বা পরিচিতদের খুঁজে বেড়ায়। বিশ-পঁচিশ বছর আগে বড়দিন বা ঈস্টারের ছুটিতে দেখা যে-বাড়ীর প্রতিচ্ছবি এদের মনে এতদিন পর্যন্ত জীবন্ত ছিল, তার সঙ্গে পর্বতপ্রমাণ ভস্মস্তূপের কোনো সাদৃশ্য নেই। পোড়া বাড়ীব খাঁ-খাঁ-করা দোর জানলা দিয়ে ধ্বংসের রিক্ততা মৃত্যুর মত ছম্‌ছম্‌ করে। হানা শূন্যতার মাঝে যেন এদের আত্মীয়-পরিচিতদের অশরীরী উপস্থিতি এদের মূক অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু যাদের দেহ তখনো শৈত্য ও উত্তাপের প্রভেদ মেনে চলে তাদের আতিথ্যের ভার ওরা গ্রহণ করবে কেমন করে? এরা আবার চলতে সুরু করে।

ঠিকানার পর ঠিকানা উধাও হয়েছে। সমগ্র প্রতিবেশের চিহ্নমাত্র নেই। এক-একটি পল্লী যেন নগর-প্রতিষ্ঠার আগেকার অবস্থায় ফিরে গেছে, যখন খোলা মাঠের ওপর রাস্তা-ঘাট, অলি-গলির রেখা পড়ে নি, মানুষের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখে, হাসি-কান্নায়, ঘৃণা-ভালবাসায় অধিবাসের একটি প্রীতিপ্রদ, আবেষ্টিত, নিতান্ত ঘরোয়া আবহ সৃষ্ট হয় নি। সে বাড়ী নেই, ঠিকানা নেই, রাস্তার নিশানা পর্যন্ত নেই। সারি সারি

ইট পেতে এরা পচা, ছাতা-পড়া রুটি বা কাঁচা আনাজ চিবোতে চিবোতে ভাবতে বসে, সেদিন রাতে আশ্রয় পাওয়া যাবে কিনা। ভৌগোলিক পরিধির জার্মান গোরারা সবেমাত্র ফ্র্যুষ্টুক্ সেরে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে "কাজে" চলেছে বোধ হয়। আড়চোখে এদের দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে—ডীজে শ্বাইনে, ভিখিরীর জাত, কেমন কাঙালী-ভোজন চলেচে দেখচো হা হা, "গেল বার আমাদের রাইখ্ থেকে পমেরানিয়েন্, পোজেন, সিলেজিয়েন্ হাতিয়ে নেওয়া হয়েছিল, হাহাহা, সেসব মুলুকের খাওয়াটা কীরকম মাইরী, ইয়া ইয়া "ভুর্স্ট্" (সসেজ), আর সে মাছেরই বা সদ কী! এখন থাক্‌না, ওদের দেশের এই মাটি আর ইঁট-পাট্‌কেল।—কেউবা ব্যঙ্গের সুরে সবাসরি শুধায় —ভী গেহেট্‌স্, চলচে কেমন?—আর একজন বলে—ঐ কণ্টা-বেরুনো হাড়গিলের মতন ছুঁড়ীগুনোকে দেখলে সন্নিসী হয়ে যেতে ইচ্ছে করে, মাইরী, ওর চেয়ে তোমার মুটী-ধুমসী ইহুদী ছুঁড়ীগুনো ঢের ভালো।—তাদের থামিয়ে একজন বুড়ো সর্দার কাছে এসে বলে—রাত্‌হাউসে (নগর-সমবায়) যাও না কেন? থাকবার ঠিকানা সেখানে পাওয়া যায়। যাও, ভাগো, জল্‌দি, রাস্তায় ভিড় জমাবার হুকুম নেই।—কেটো গলায় নরম প্রাণ ঢাকবার নিষ্ফল সম্বৃতি এদেরও চোখ এড়ায় না। বুড়ো সর্দার মুচকে হেসে চোখ টিপে আবার কড়া গলায় হাঁক দেয়—আবের, গেহেন্ জী ভেক্, শ্নেল্, জল্‌দি, গেহেন জী নাখ রাত্‌হাউস্!

আশ্রয়ের শেষ অবলম্বন এই রাত্‌হাউস্। ঠিকানা ও পরোয়ানা সমেত এক-একটি পরিবার পোড়ো বাড়ীর নিষ্ঠুর নিয়তির হাতে আত্মসমর্পণ করে। ফাটল-ধরা মেঝের ওপর পাতবার জন্যে খড়-কুটো কোথা থেকে এরা সংগ্রহ করে, আশ্চর্য! চোখের সামনে দেখতে দেখতে এরা বাসা বেঁধে ফেলে। খড়ের ওপর পড়ে ছেঁড়া কম্বল, কেউবা পাতে

দামী গালচে, একদিন যার ওপর দিয়ে মখমলের স্লিপারে-ঢাকা ছোট ছোট দুটি পা লঘু, মদালস গতিতে চলাফেরা করতো। এক কোণে জ্বলে আগুন, ইট সাজিয়ে, কাপড় ঢেকে তৈরী হয় সারি সারি আসন, উষ্ণ বাষ্পের সঙ্গে কোপি-সেদ্ধ জলের অপ্রীতিকর গন্ধও কেমন উপভোগ্য হয়ে ওঠে। স্যুপের প্রতীক্ষায় মেয়েরা ঘরের কাজে লেগে যায়, পুরুষরা পাইপে শুকনো ওক্ পাতা ভরে ধূমপান করতে করতে ভাবে, একটু গুছিয়ে নিতে পারলেই একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করা যাবে'খন·· ইস্, ঐ ভাঙা জানলাটা দিয়ে কী ভয়নাক ঠাণ্ডা হাওয়া আসচে, য়ানেক্‌টার যে কাশী হয়েচে, কম্বলগুলো আবার মেঝের পাতা হয়েচে, আমার কোটটা টাঙিয়ে দিতেই হলো দেখচি, তারপর আগুনের কাছে একটু ঘেঁসে বসলেই হবে, পোড়া কাঠের কয়লার আগুন, ওতে কী ছিল কে জানে, অমন কদাকার গন্ধ কেন ?···

এই খণ্ড-খণ্ড শ্মশানগুলোয় আবার জীবন অঙ্কুরিত, পল্লবিত হয়ে ওঠে, চোরা বালির ওপর ঘর-সংসার। সেদিন সকালে চলতে চলতে দেখি, রাতে যে পোড়া বাড়ীগুলোকে ভুতের আড্ডা বলে মনে হয়েছিল, সেগুলো এক-একটি ছোট ছোট গ্রামের আকার ধারণ করেছে। ফাঁকা দরজা-জানলায় চট, কার্পেট, কোট টাঙিয়ে বাইরের শীতকে তুক্‌তাক্ করে ঠেকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা দেখবার মত। হয়তো পোড়া দোর-জানলার কয়লার আগুনে ভেতরটিতে একটি "হোম্"-এর অবসর-মধুর আবহ সৃষ্ট হয়েছে। দেখি কেউ কেউ মেঝের কম্বলের ওপর চিৎপতিত অবস্থায় পরম আরাম ও আলস্যে একখানা ছবিওয়ালা পুরানো মাসিকের পাতা ওল্টাচ্ছে, কেউ বা অনবদ্য নিষ্ঠায় ছেলের পড়া নিচ্ছে, সময়টা প্রেম কূজনের পক্ষে অনুপযুক্ত হলেও দেখি যুবক-যুবতীর পারস্পর প্রেক্ষণে কাম-বাসনা।

সংসার গড়ে উঠেছে। মানুষের মনের নিভৃত আশ্রয়টি এরা আবার খুঁজে পেলো বুঝি। আর ভয় নেই, ভাবনা নেই, যারা চলে গেছে তাদের স্মৃতি গত বছরের তুষারের মতই অলীক, ক্ষণস্থায়ী; যে বিধাতার রোষ এদের ছন্ন-ছাড়া করে, অসহনীয় পথ-ক্লেশে, অকথ্য অপমান, নিদারুণ বিয়োগ-শোকে পূত করে অবশেষে এই অজানা, অচেনা শহরে নূতন জীবন-বেষ্টনীতে নিক্ষেপ করেছে, সে রোষ এতদিনে থামলো বুঝি। নূতন জীবনের প্রারম্ভ, রোগ-মুক্তের স্নায়ুর মত এদের মন এক নূতন আশায় উন্মুখ, এক অপূর্ব হর্ষ-বিষাদে সংব্যথিত। ঘরের কোণের ঐ আগুন, পারিবারিকতার এই উত্তাপ, যারা আজো কাছে তাদের সশরীরী উপস্থিতির এই যে নিশ্চিন্তা, জীবনে এই তো সব। এর পর সামান্য ভাগ্য-পরিবর্ত্তন, কঠোর পরিশ্রম, আবার নিজেকে গড়ে তোলা যাবে বৈ কি। হানা বাড়ীর পোড়া দরজা-জানলার কয়লার আগুন, কোপি-সেদ্ধ জলের ক্ষুন্নিবৃত্তিসূচক গন্ধ, এদের মনে নির্ভরতার ঘোর লাগে, শান্তি, শান্তি, সে কী পরম নিরুদ্বেগ!

বরফ-চোঁয়ানো জলে পথে কাদা জমে উঠেছে। আতপ্ত রৌদ্রের প্ররোচনায় ভাঙা বাড়ীর গ্রন্থীতে গ্রন্থীতে ভাঙন ধরেছে। ফাটলে ফাটলে শক্ত সিমেণ্টের মত বরফ ছবিতে আঁকা ঝরণার মত নিশ্চল, রুপালী। অথচ তার কাচের মত ঝলমলানিতে স্পষ্ট বোঝা যায়, তার পরমায়ু কয়েক ঘণ্টা মাত্র। ওপরতলার ফাটলগুলো দেখতে দেখতে ফাঁক হয়ে পড়ে। আলসেয় আলসেয় বরফের ঝুরী ঝারার মত ঝরতে সুরু করেছে। পথে ভিজে, ময়লা নুনের মত তুষারের সঙ্গে বরফ-গলা কাদা জল আস্তে আস্তে গড়িয়ে চলে, তার ওপর অবিরত ছেঁড়া জুতো আর ভারী গলশের ছপ্‌ছপানি। চিড়-খাওয়া বাড়ীখানার প্রত্যেকটি অংশ সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে, আতঙ্কে তাকিয়ে দেখি। তার কোটরে

কোটরে মানুষের বাসা, সুমুখ দিয়ে চলেছে অপ্রতিহত জনস্রোত, ক্ষুধায় দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে। কে যেন এলোপাতাড়িভাবে পাঁচতলার সমান সারি সারি ইট সাজিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। কিংবা বাড়ীখানা যেন বিকৃত-মস্তিষ্ক, পক্ষাঘাত-রোগীর মত হঠাৎ দু-হাত তুলে উঠে দাঁড়িয়েছে; তার অনাস্থ পায়ের টলমলানি। হাওয়ায় ইটের দেুল্‌দোল্‌ দোলে রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটের মত। যারা দূর থেকে দেখে তাদের মনে এলোমেলো উপমার বিলাস আর আতঙ্কের থ্রিল্‌, নিতান্ত উপভোগ্য cathartic, স্নায়বিক জোলাপ, মন খোলসা করবার অব্যর্থ দাওয়াই।

গাঁথুনির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বরফ-গলা জল, অংশে অংশে এক নিমেষের তক্‌রার্‌। হঠাৎ পাঁচতলা বাড়ীখানা টুকরো টুকরো হয়ে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। মানুষের আর্ত্তনাদে-মেশা ইট-কাঠের বিকট হুঙ্কার। আকাশে ধুলোর মেঘ, দাঁতে বালি কিচ্‌কিচ্‌ করে। ভেতরে যারা ছিল তাদের কবর দেওয়ার হাঙ্গাম নেই। কিন্তু রাস্তায় ঐ যে কুড়ী পঁচিশ জন রক্তাক্ত দেহে শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করছে, ঐগুলোই গোল বাধাবে। পথ-চলা লোক পাকড়ে মুরদা-ফরাসের কাজ করিয়ে নেবে বৈত নয়। ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। কে যেন জল চাচ্ছে না? অমন কাজ নয়! ভবিতব্য ভবিতব্য।

হ্বেন্ দত্র্যী *পান্নু, পানি:য় প্রফেসয়্বে !†

হ্বেন্ দত্র্যী। আরে, পান্ ‡ মারিয়ান্ যে!—কোণের ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীখানার দারোয়ান মারিয়ান্ সেলাম ঠুকে সামনে এসে দাঁড়ায়, জিজ্ঞেস করে, এ অবস্থায় যে!

হবে না! সবে তো কাল ফিরছি।

শুনেচেন বোধায়?

কী বলো তো?—সসঙ্কোচে প্রশ্ন করি।

তিনি মারা গেচে।

প্রফেসর?

হ্যাঁ, পানিয়ে প্রফেসয়্বে।

আর পানী?

তিনি বেঁচে গেচে।

তাই নাকি?

* নমস্কার। † অধ্যাপক মহাশয়।

‡ ইতরভদ্রনির্বিশেষে ওদেশে নামের আগে পান্ (মস্তো) বা পানী (মাদাম) ব্যবহার করা রেওয়াজ।

হ্যাঁ, পানিয়ে প্রফেসৱ্জে। আপনি শুনলে আশ্চয্যি হয়ে যাবেন, প্রশেঁ পানা।*

দেওয়ালে পিঠের বোঝা ঠেস দিয়ে একটু জিরিয়ে নেবার অবসরে আমরা মারিয়ানের গল্প শুনতে থাকি। যে-বাড়ীর শূন্য কাঠামের আশ্রয়ে রাত কাটিয়েছি তারই পাঁচ তলার ফ্ল্যাটে অভিনীত একটি বিয়োগান্ত নাটিকা। মারিয়ান্ আমার দিকে তার কুড়িয়ে-পাওয়া সোনার সিগারেট-কেস মেলে ধরে। ইমারৎগুলোর সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী-ভেদের অলঙ্ঘ্য প্রাচীরও ধূলিসাৎ! মারিয়ানের ভঙ্গিতে আজ ঐ সোনার স্পর্শে অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস। রাতে দোর খুলে অন্ধকারে যে বক্‌শিস্-প্রার্থী হাত কতবার আমার সামনে প্রসারিত হয়েছে, সোনার সিগারেট-কেস ধরা এই কি সেই হাত? বলে, লিন্ না, প্রশেঁ পানা, আমার আচে তাই দিচ্চি, যেকে'ন থাকবে নে, তেকোন আবার আপনাদের ঠেঁয়ে চেয়ে নোবো।—পরে হেসে যোগ করে, মুখখেনা আস্ত আচে বলেই তো একনো সেকেনে সিগ্রেট্ ঠুস্‌তে পাচ্চি, আর এই থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেলে কি আর তা পাত্তুম? হা হা হা, আসুন লিন্।

এই শ্মশানপুরীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে মারিয়ানের মেঠো ইয়ারকি মন্দ লাগে না। সদ্য-টোল-খাওয়া সোনার সিগারেট-কেস থেকে একটি আব্‌দুল্লাহ্ ধরিয়ে মারিয়ান্ স-রোমাঞ্চে তার কাহিনী সুরু করে ঃ

তারপর শুনুন, পানিয়ে, যা বলছিলুম। আপনারা তো সব যে-যার নাকের সিদে পত ধল্লেন। আপনিও সাত তারিকেই (সেপ্টেম্বর)

* পোল ভাষায় "প্রশেঁ পানী" (পুং), "পানিয়ে" (পুং), "প্রশেঁ পানী" (স্ত্রী), "প্রশেঁ পান্‌স্ত্‌ভা" (পুং ও স্ত্রী), বাংলার "মশাই" শব্দ বা ইতালীয় "প্রেগো" শব্দের মত কথার ফাঁকে ফাঁকে অজস্র পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

বেরিয়েছেলেন তো? সাত তারিকেই সন্দে হতেই শওর পেরায় ফাঁকা, পতে একটা মরদ চোকে পড়ে না, একেবারে ছেলনা যে না নয়, তবে ঐ দুটো একটা কচিত-ককনো। আমি অবিশ্যি সটকাইনি, গিন্নী জেদ ধরেছেলেন, যেতেই হবে, শ্বাবরা* নাকি এসে আমায় শূলে দেবে। পানিয়ে, ও-সবে গলবার বান্দা আমি নই। দিলেই বা শূলে, মেয়ে-মানুষকে, পানিয়ে, আমি বিশ্বেস করিনে, ওদের ফেলে চলে যাও, তারপর গে তোমার পাচ বচ্ছর পরে ঘরে ফিরে দেকো চাদ্দিকে কাচ্চাবাচ্চা কিল্‌বিল্‌ কচ্চে, বুইলেন না, হে হে হে। আমি, পানিয়ে, বল্লুম, যা হবার হোক্‌, আমি শওর ছেড়ে যাচ্চি নে। ঐ অত বড় পেল্লায় বাড়্‌টে এক্কেবারে খাঁ-খাঁ কচ্চে। পুরুষদের সাতে মেয়েরাও সরে পড়েচে, কেউ কোথাও নেই। আমাদের ঘরে তো ঐ তিনটি পেরাণী, আমি, গিন্নী আর বাচ্চাটা। সারারাত আলো জ্বালিয়ে রাকি, ঘুম আসে না, যেতবার জানলা দে বাইরে নজর পড়ে, দেকি উটোনের অন্দকার যেন আলকেতরার মতন নীরেট, চট্‌চটে, সারি সারি সেই সাততলা পজ্জন্ত একটি ছিটে আলো নেই। হটাৎ দেকি পাঁচতলার একটা জানলা দে যেন একটুখেনি আলো ওপাশের দেলটার ওপর চুঁইয়ে পড়চে। মনে মনে বলি, তবে কি প্রফেসর পালায় নে! একবার ভাবলুম, হয়তো ফাঁকা পেয়ে চোরে সব লোপাট কচ্চে। যাই হোক্‌, বড় টর্চ্‌টা নে, মা মারিয়ার নাম জপ কত্তে কত্তে উটনু ঠেলে উব্‌রে গে। দোরে ধাক্কা দিতেই পানী প্রেফেসরভা দোর খুলে দিলে। মনে মনে বলি, অত বড় ঘরের ঘরুণী কিনা সামান্য চাক্‌রাণীর মতন দরজা খুলে দেয়! করবে কী বলুন, শওরেতে চাকরবাকর কোতায়? আমায় দেকে শুদোলে, বলে, আরে পান্‌ মারিয়ান্‌ এত রাত্তিরে? বল্লুম ভেবেছিলুম, আপনারা সব চলে গেচেন,

* পোল ভাষায় জার্মানদের অবজ্ঞাত অভিধা।

অতচ আলো জ্বলতেচে, তাই বলি হয়তো চোর ছেঁচড়, দিনকাল তো ভালো নয়।—আমার গলা শুনে ভেতর থেকে প্রফেসর ডাকলেন, কে মারিয়ান্? ইদিগ বাগে একবার আয় তো বাবা, একলা আর আমি পেরে উটচি নে। শুনে তো আমি ভিদ্‌রে গেন্নুন, দেকি, ওমা, প্রফেসর মই নাগিয়ে নাগিয়ে দেল থেকে যেতোরাজ্যির বই মেজের ওপর নাবিয়ে রাকচে। আমি তো অবাক্! দিনের বেলায় খাব্‌বেটাদের জ্বালায় তো থির হয়ে দুদণ্ড বসবার জো নেই, আধ ঘন্টা অন্তর অন্তর বোমারুর ঝাঁক। আর এই রেতের বেলায় কোতায় মানুষে একটু চোকেপাতায় কবে নেবে, না রাত জেগে যেতোরাজ্যির বইয়ের ধুলো মাকো! আমি একটু গুঁইগাই কচ্চি শুনে প্রফেসর বললে, তোর ছেলেটারে আমি একটা পণ্ডিত বানিয়ে দোবো রে মারিয়ান্, একোন আমায় একটু সাহায্যি কত্তো রে বাবা। আমি বলি, হ্যাঁ, পানিয়ে প্রফেসঝে, ছেলেটা অবিশ্যি পড়াশুনোয় ভালোই, এই সেদিন একখেনা বই পেরাইজ পেয়েচে, তা কী কত্তে হবে বলুন।—বলে, এই আমার পাঁচ হাজার বই, যেন পাঁচটি হাজার ছেলেমেয়ে, এদের পেত্যেকটির পেত্যেকটি পাতা আমার পড়া। এদের নে এদ্দিন কাটানুন্ তাই ভাবচি, এদের বাঁচাই কি করে? তা দেক্, আমি বলি কী, নীচোয় মাটীর তলায় যে কয়লা-রাকা পেল্লায় ঘরখেনা আচে না, সেকেনেই বইগুনোরে সরিয়ে নে রেকে আসি, কী বল্?—বলি, হ্যাঁ পানিয়ে প্রফেসঝে, সেকেনে দিব্যি রাকা চলতে পারে। অনেকক্ষণ ধরে যুক্তি করে ঠিক হলো, কাল আর পরশু সারা দিন ধরে আমরা একটা লিস্টি করবো, আমরা মানে আমি আর মুক্‌খু মানুষ, লিস্টি করবো কোত্থেকে, হে হে হে, মানে আমি বইগুনোরে নাবিয়ে নাবিয়ে মেজোয় রেকে শুদু নামটো পড়ে দোবো, আর তাই না শুনে প্রফেসর একটা মোটা খাতায় টুকে রাকবে, এই!

তার পরের দিন পানিয়ে, লিস্টি করে কার বাপের সাধ্যি! সারাটি-দিন কাটলো মাটীর নীচোয় কয়লার ঘরে বই গোচাতে নয়, মাতা বাঁচাতে, সারাটি দিন বোমারুদের সে কী গজরানি! তারপর রেতের বেলায় তোমার একটু ঘুমিয়ে না নিলে মান্‌ষে পারবে কেন? প্রফেসরের শরীলটে যেমনধারা তাতে ওসব বেশী দিন তো তেনার সয্যি হবার কতা নয়! পানী প্রফেসারভাও বললে, বলে, আমার বইয়ে কাজ নেই, তোমার শরীলটে একোন টেঁকলে বাঁচি! এমনি করে দু-চাদ্দিন কেটে গেলো। যেতো দিন যায়, তেতোই শ্বাবগুনো বাড়িয়ে চলে। সারাটি দিন একটু থির হয়ে বসবার জো নেই, কেবলই শোনো মাতার ওপর দে গরর্‌র্‌র্‌র্‌…! শেষ বরাবর প্রফেসর বললে, বলে, ধুত্তোর নিকুচি করেচে, আমি আর নীচোয় নাববো না, যা হবার তা হবে, বইগুনোর লিস্টি না করে ফেললে, কোতায় যে কী নণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে তার আর ঠিকঠিকেনা থাকবে না। এই না বলে প্রফেসর ফের কাজে নেগে গেলো। উদিকে শ্বাবরা বোমা ফেলচে আর ইদিকে প্রফেসর আপন মনে লিস্টি কচ্চে। আমি অবশ্যি সাহায্যি কিছুই কত্তে পারি নি। তবে যেকোনই যাই দেকি পান্‌ প্রফেসর একমনে বইয়ের লিস্টি কত্তেচে। লোকটা বোধায় বুইতে পেরেছেলো যে তেনার দিন ফুইরে এয়েচে। আমারে একদিন বললে, শোন্‌রে মারিয়ানিয়ে, আমি যদি মারা যাই তো বইগুনোরে দু-চারখেনা করে নীচোয় নাবিয়ে নে যাস বাবা, যে আগুনে বোমার ছিষ্টি, একেনে ওগুনোকে, বাঁচান যাবে কী?

হলোও তাই। দিনটা ঠিক মনে পড়তেচে না, পানিয়ে, বিশে কি বাইশে, সারাদিন শওরের উব্‌রে বোমা পড়েচে। আর উদিকে প্রফেসরের লিস্টিও শেষ হয়ে এয়েচে, তার দুদিন আগেই আমরা খানকতক করে বই নীচোয় নাবিয়ে নেসতে সুরু করিচি। প্রফেসর

অবিশ্যি উব্রেই ছেলো আর পানী নীচোয় মাটীর তলায় কয়লার ঘরে, ওনাদের ঐ পাঁচতলায় বারবার ওটা-নাবার মতন তো শিক্ষে-দিক্ষে নেই। তাছাড়া লিফ্‌টটাও খারাপ হয়ে গেচে। তাই আমিই পাঁজা করে করে, পানিয়ে, যেতোগুনো পারি বই নাবিয়ে নে আসি। পাঁচ হাজার বই, চাট্টিখেনিক কতা নয় তো! দু-দিনেও তোমার গে, মেজের ওপর বইয়ের গাদার একটি কোণও খালি হলো না। যাই হোক, সেদিন পরাণের মায়া আমরা কেউই করি নি পানিয়ে। প্রফেসর উব্রে আমার হাতে বই তুলে দিচ্চে, আর আমি ঐ পাঁচতলা থেকে বইগুনো নে মাটীর নীচোয় কয়লার ঘরে বয়ে আনতিচি, আর সেকেনে পানী প্রফেসরভা নিজের হাতে সেগুনোকে একটু আদটু গুচিয়ে গাচিয়ে রাকতেচে। জানেনই তো উনি কী ভয়ানক গোচানো মানুষ! এমনি কত্তে কত্তে সারাটি দিন কাবার হয়ে গেলো। মদ্দে একবারটি মিনিট দশেক থির হয়ে বসে দুটি খেয়ে নেওয়া গেছলো। পানী প্রফেসরভা এই তক্কেই ককোন যে রান্নাবান্না শেষ করে রেকেছেলো তা জানতিই পারি নি। ওনার হাতের রান্না তো নয়, যেন অমেরতো! মাংসর পুর দেয়া পিটে আর আগের দিনের বিগস্!* ওনারা ককনো ছোট-বড়র বিচের কত্তেন না। তাই এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেনুন্ আমরা, বিগস্‌টা বাসী বলে জরেছেলো খাসা, আহা একনো যেন মুকে তার সদটি নেগে রয়েচে। যাই হোক, উদিকে সন্দে হয়ে এলো, আর বোমারুগুনো বাসায় ফেরবার আগে আগুনের ডিম ছড়িয়ে যেতে আরম্ব কল্লে! তার কদিন আগে থেকেই শওরটো জ্বলতেছেলো। সেদিনকের যেন একটু বাড়াবাড়ি বলে বোদ হলো। আকাশ থেকে হু-হু শব্দে আগুনে বোমা ছড়িয়ে পড়তেচে, আর মাটিতে না হয় বাড়ীগুনোর ছাতে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই

* মাংস ও বাঁধা কোপির ছক্কা জাতীয় আহার্য।

যেন 'বাংলা আগুনে'র * মতন ফেটে চাদ্দিকে ছড়িয়ে পড়তেচে। আগুনের সে কী বাহার পানিয়ে! দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে দেকতে ইচ্ছে করে। তুবড়ীর মতন ফুলকি ফুলকি আগুন তোমার গে সেই হোতা পজ্জন্ত ছড়িয়ে পড়ে। তারপর সুরু হয় দাউ দাউ শব্দে অগ্নিকাণ্ড নণ্ডভণ্ড। এদ্দিন অন্য অন্য পাড়ার আগুনের আভা দেখছিনুন্‌, এব্‌রে একেবারে আমাদের পড়বি তো পড়্‌ বাড়ীর ছাতে! আমি, পানিয়ে, একলা মনিষ্যি, কে ছাতে গে বালি নে বোস্‌ থাকে? উদিকে শওরে জলের দপাও পেরায় নিকেশ হয়ে এয়েচে তো! চোকের সামনে দেকনু, মড়ার মাতার কাচে জ্বেলে দেবার বাত্তির মতন শাদা রঙের বোমাটা সটাং আমাদের ছাতের ওপর পড়ে ফেটে গেল। তারপর সে কী ফুলকি ছিটনোর ছিষ্টি! দেকতে দেকতে দেকি ওপরতলার একটা ফেলাট দে ধোঁ বেরুচ্চে। তবুও ছুটে গেনু উব্‌রে। ফেলাটে আবার তালা বন্দ, তালার ওপর তালা, সে তালা ভাঙে কার বাপের সাদ্দি! আর ঐ পেল্লায় দরজাখেনা নাতি মেরে ভেঙে ফেলা তো মুকের কতা নয়, পানিয়ে! আর আমি একলা কোত্তুনই বা কী? পাড়ার দু-পাঁচজন এসেও যে সাহায্যি করবে তারও উপায় নেই। দেকচেন তো কী হালটা হয়েচে, ও-সব ঐ একই দিনের ব্যাপার, সারি সারি সবকখেনা। যাই হোক, আমি নীচোয় নেবে আসতিচি, এমন সময় শুনি, পান্‌ প্রফেসর ডাকতেচে, মারিয়ানিয়ে, মারিয়ানিয়ে!—তেনার কাচে ছুটে যেতেই বললে—শোন্‌ রে বাবা, মারিয়ানিয়ে, এক দৌড়ে নীচোয় উটোনটোয় গে দাঁড়া, তুই আর পানী, একখেনা কম্বল-টম্বল যা হাতের কাচে পাস্‌, দুটো ধার ধরে দাঁড়াবি, ঠিক যেমন করে দমকলের নোকেরা জানলা থেকে নাপিয়ে-পড়া মানুষ ধরে, বুইলি? আর আমি জানলা দে দুদ্দাড় শব্দে বইগুনোরে ছুঁড়ে

* ইউরোপে বাজির চলতি কথা "বাংলা আগুন"।

ছুঁড়ে ফেলবো কম্বলটোর উব্‌রে। এমনি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেললে পারে অমন দামী দামী মলাটগুনো একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে, বুইলি না?—হ্যাঁ, শানভ্ন্তী* পানিয়ে প্রফেসরে।—বলেই আমি তো এক দৌড়ে নীচোয় গে পানীকে কয়লার ঘর থেকে ডেকে নে, একটা কম্বলের দু-ধার ধরে দাঁড়ানু। পানী কী থাকতে চায়! বোধায় বুইতে পেরেছেলো, কী একটা অলুক্ষুণ ঘটবে। উব্‌রে যাবার জন্যে দড়ি ছেঁড়া-ছিঁড়ি! পান্‌ প্রফেসর তাই না দেকে উব্‌রে থেকে এক দাব্‌ড়ি! যেমন করে পোড়োদের ধমক দেন, বলে, চুপ করে কম্বল ধরে দাঁড়িয়ে থাকো, একোন ঢলাঢলি করবার সময় নয়। পান্‌ প্রফেসর উব্‌রে থেকে দুদ্দাড় করে পাজা পাজা বই ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতেচে, আর আমরা কম্বলটো ভরে গেলে এক-একবার সেটা খালি করে নে আবার দাঁড়িয়ে পড়তিচি। এমনি করে দেকতে দেকতে উঠোনটোর একপাশে এই আপনার গে গাদা পেরমান বই জমে গেলো। আরে বাস্‌, বই কি ফুরোতে চায়, নোকটার পেটে এত বিদ্যেও ছেলো! আমরা বলে গে, ঐ একখেনা বই মাতার খুলির ভিদ্‌রে পুরতে ইয়ে করে ফেলি, হে হে হে, আর উনি ইয়া মোটা মোটা পাঁচটি হাজার গুণে গুণে, সব ঐ ঐটুকখেনি খুলির ভিদ্‌রে! বই তা আপনার গে হাজার দুই তিন ফেলা হয়ে গেচে, এমন সময়ে পানী হঠাৎ চীচ্‌কার করে উটলো, বলে, মারিয়ানিয়ে, আমাদের ফেলাটে আগুন, হোই উদিককার রান্নাঘরের জানলাটোয়!—ওনার কথা শুনে প্রফেসর আবার ধমক দে উটলো—চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো! একোনো দু-হাজার বাকী, সবচেয়ে দামীগুনোয় একোনো হাত পড়ে নে। মারিয়ানিয়ে, ঠিক হয়ে দাঁড়া!—আমার যেন ঝকমারি, ইদিকে পানী দড়ি ছেঁড়া-ছিঁড়ি

* শ্রদ্ধেয়।

কত্তেচে, আর উদিকে, বেশ বুইতে পাত্তিচি ওনাদের ফেলাটে আগুন নেগে গেচে। রান্নাঘরের জানলা দুটো দে কুলকুলিয়ে ধো, ঠিক ইস্টিমারের চোঙ দে যেমন ধোঁ বেরোয় তেমনি। মনটা এক-একবার বলতেচে যে, তেক্ষুনি উব্‌রে গে প্রফেসরকে ধরে পাকড়ে না নাবিয়ে নেসলে ওনার জীবন বক্ষে হবে না। কিন্তু ঐ বাগের কাছে এগোয় কার বাপের সাদ্দি! আমরাও তো এককেলে পাটশালায় গিচি, জানি, মাষ্টারবা বেগে গেলে তাদের জ্ঞানগম্যি থাকে না। পানী কম্বলটোর খুঁট ধবে দাঁড়িয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতেচে, বলে, মারিয়ানিয়ে, ওনাব খুন চেপে গেচে, দেকচিস্‌ নে, মাতার ঠিক আচে কী? তুই যা বাবা, ভরসা কবে, ধবে নে আয় ওনাবে।—বলি, প্রশেঁ পানী, আমার একলাঘোব ভরসায় কুলোবে না, বাপ্‌স্‌ মানুষ তো নয়, জলজ্যান্ত বাগ!—একটু পরে প্রফেসব উব্‌বে থেকে চেঁচিয়ে বললে—আরো হাজার দেড়েক। আমাব জন্যে ভয় কবো না তোমরা, আগুন শোবাব ঘরে এয়েচে, তারপর খাবার ঘর, বসবাব ঘর, তাবপর লাইবিরি।—বলে সমানে দুদ্দাড় শব্দে বই ফেলে চলতে নাগলো। কিন্তু বোমার আগুন তো একটি জায়গায় ছড়ায় নে! হটাৎ দেকি পাশের ফেলাট থেকে কুলকুলিয়ে ধোঁ বেরুচ্চে। আর সময় নেই। চেঁচিয়ে ডাকি, পানিয়ে প্রফেসম্ঝে, চাদ্দিকে আগুন, পাশেব ফেলাটেও নেগেচে, তাড়াতাড়ি নেবে আসুন।—শুনে তিনি শুদু হাতের ইসেরায় আমাদের ভরসা দে আবার বই আনতে গেলো। চুপিচুপি পানীকে বনু, বলি, এইবার আসুন দিকি ধরে আনতে পারি কিনা। বলে কম্বলটোরে ফেলে দে আমরা ছুটে সিঁড়ি দে উটতে নাগনু। সিঁড়িটে ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার। দোতলার বেশী উটতে পারি নে। সব কটা ফেলাট দাউ দাউ শব্দে জলতেচে। ছুটে বেরিয়ে এসে উটোন থেকে চীচ্‌কার করি, বলি, পানিয়ে প্রফেসম্ঝে, নেবে আসুন,

একটা মোটা সোটা ওবারকোট গায়ে দে, চাদ্দিকে আগুন, সিঁড়ি দে ওটা যাচ্চে নে।—এর মদ্দে দেকি প্রফেসর আমাদের না দেকতে পেয়ে তেনার জামা-কাপড়ে বই বেঁদে বেঁদে ফেলতেচে। তিন চারটে ওবারকোটে বাঁদা বই! তেনার আর গায়ে দেবার কিচ্ছু নেই। সত্যিই বোধায় তেনার মাতার ঠিক ছেলোনা। একটু পরেই দেকি, দুদ্দাড় করে কয়েকজোড়া জুতো এসে পড়লো! আর তারপর জানলা দে দু হাত বাড়িয়ে তেনার দামী ছাতাটোরে খুলে বেলুনের মতন করে উড়িয়ে দে বলে উটলো—হাম্বেরলাইন্‌!—যাই হোক্‌, ইদিকে পানীকে নে করি কী? দু-হাত দে তেনারে ধরে রাকতে পারি নে। উনি বলে কিনা সেই আগুনের ভেতর দে উব্‌রে যাবে! অতবড় ঘরের ঘরুণী, ওনারে ছোঁয়া কি আমাদের আস্পদ্দায় কুলোয়! তবুও করি কী? দুহাত দে জাপটে ধরে বেকে কাকুতি মিনুতি করি, বলি, পানী শানভ্না, ধয্যি ধরুন, একটু ধয্যি ধরুন, আমি নিজে গে ওনারে নাবিযে নেসচি। তাবপর গিন্নীকে ডেকে তার হাতে ওনারে জিম্মে করে দে, তাড়াতাড়ি ভেড়ার লোমের প্রকাণ্ড পুরু ওবার-কোটটো গায়ে দে উব্‌রে উটতে নাগ্‌নু। কিন্তু, হা মারিয়া, এগোয় কার সাদ্দি, আগুন আর ধোঁ, ধোঁতে দম বন্দ হয়ে আসে। খানিকটে উটে কাশতে কাশতে আবার নেবে আসি। নিজের পরাণটা দে যদি তেনারে বাঁচাতে পারা যেতো থালেও না হয় চেষ্টা করে উব্‌রে যেতুন্‌। পানিয়ে, মারিয়ার দিব্যি, কিন্তু ঐ পাচতলা পজ্জন্ত ধোঁ ঠেলে উটতে উটতে ঐ সিঁড়িতেই অজ্ঞান হয়ে পডে যেতে হতো। উটোনে পানীর সে কী আচাড়ি-পাচাড়ি! আর উদিকে প্রফেসর দিব্যি হাঁসি মুকে বিচনোর চাদরে বেঁদে বই ফেলতেচে। একবার ফেলবার সময়ে বলে গেলো—আরো পাঁচ শো! এই মারিয়ানিয়ে, অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকিস্‌ নে। বইগুনোরে একটু

গুচিয়ে রাক্।—তারপর অনেকক্ষণ তেনার দেকা নেই। শেষবার একটা বড় সুটকেস-ভরা বই দুম করে আমাদের কাচে এসে পড়লো। ধোঁয় তেনারে আর দেকতে পাওয়া গেলো না। তারপর তেনার কী হলো জানিনে, পানিয়ে প্রফেসঝে......

জামার হাতায় চোখ মুছে মারিয়ান্ একটু চুপ করে রইলো। তারপর আবার বলে চললো ঃ

পানীর সে অবস্তা দেকলে চোখ ফেটে জল আসে পানিয়ে। উটোনে সে কী আচাড়ি-পাচাড়ি! একটু পরেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লো। আমি আর গিন্নী দু-জনে ধরাধরি করে ওনারে বাইরে নে গেনুন্। তারপর খেয়াল হলো, আমাদের নিজেরও জিনিষপত্তর ঘর বোজাই। অবিশ্যি সে আর এমন ভয়ানক কিছু নয়। গোটা দুই সিন্দুক, আর বিচেনাপত্তর। ছেলেটাতে আর আমাতে ধরাধরি করে বাইরে টেনে নে গেনু। ছেলেটা বেশ বেড়ে উটেচে, তাই ওরে দে একটু আদটু কাজ মেলে। তবুও ঐটুকু বাঁচাতে পারাও আমার বাপের ভাগ্যি, পানিয়ে, দেকতে দেকতে সারা বাড়্‌টে জলতে নাগলো। ঘণ্টা পাঁচ-ছয়ের ভিদ্‌রেই তার সব্বাঙ্গে আগুন ধরে গেলো, তারপর দেকচেন তো ঐ অবস্তা। ইঁটের পাজা আর ছাইয়ের গাদা। মা মারিয়ার দয়ায় আমার জিনিষপত্তর বিশেষ কিছু যায় নে, ঐ বোধায় গোটা দুই ভালো পালকের বালিশ, বাস্। তবে প্রফেসরের বইগুনোর চিহ্নিত পজ্জন্ত নেই। জিনিষপত্তরের মদ্যে এই জুতো জোড়াটা! পানী প্রফেসরভার জ্ঞান হলে তেনার ঠেঁয়ে চেয়ে নিচি। আগেই এর দাম ছেলো ৫০ জ্‌লতী (২৫৲), একোন শ-খানেকের কম নয়। জুতো তো একোন পাওয়াই যাচ্চে নে, শ্বাব্‌-বেটারা সব কেড়ে বিকড়ে নেচে। তবু বলি কি, পানিয়ে প্রফেসঝে, যদি চান এক

জোড়া ভালো জুতো তো জোগাড় করে দিতে পারি, সন্দানে আচে, দু-একবার মাত্তর ব্যাভার করা। অবিশ্যি আমার এ জোড়াটার মতন নয়। প্রফেসর এই জোড়াটারে পায়ে দে পান্ প্রেসিদন্ত্-এর ওকেনে নাচে যেতো, দেকিচি। আমাদের পায়ে কি মানায় এসব পানিয়ে, অবিশ্যি ভারী আরামের। আমাদের ঐ কড়া হাঁটু-পজ্জন্ত বুট পরা অব্যেস, তাই মনে হয় যেন ওডুটো পায়েই নেই। তারপর কী বল্‌ছিমুন্, পানী প্রফেসরভা জ্ঞান হয়ে যেকোন সব শুনলে তেকোন আর কোনো গোলমাল করে নে। কেমন যেন কাট হয়ে গেলো। তেনারে তেনার ভেয়ের বাড়ীতে দিয়ে এয়িচি। পতে একদিন দেকাও হয়েছেলো, দেকমু সে ভাবটা একোনো কাটে নে। কেমন থম্‌থমে ভাবটা। আহা, অতবড় ঘরের ঘরুণী, অমন শোকটা পেলে, তবে একোনো বয়েস অল্প এই যা। আসুন লিন্, পানিয়ে, একটা সিগ্রেট !···

মরিয়ান্ আবার তার সোনাব সিগারেট-কেস আমার সামনে মেলে ধরে। না নিলেই নয়।

উলীৎসা মিয়দভা। রাস্তাটার নাম "মিয়দভা", "মধুময়" কেন, তার ইতিহাস জানা নেই। সে-পথে মধু বা মাধুর্য কিছুই কখনো চোখে পড়ে নি। চওড়া রাস্তা সটান বড় আদালতের সামনে গিয়ে হাজির হয়েছে। সারা দিন ট্রামের ঘড়ঘড়ানি আর ঘণ্টার আওয়াজ, জোব্বা আর একহাঁটু বুট-আঁটা, মাথায় পাথর-বাটি টুপী-বসানো ইহুদী পথচারীদের কর্কশ ঈড্ডিশ্-ভাষা, আর উকিলদের হ্রেষা, এর নামই উলীৎসা (রাস্তা) মিয়দভা!

এই পথের ওপরেই আমার একটি নোকরীস্থল ছিল: ইন্স্তীতুৎ ভ্স্‌হদ্নি, প্রাচ্য নিকেতন। প্রাসাদতুল্য ইমারৎ, চওড়া কাঠের সিঁড়ি বেয়ে একটি পোল নায়ক ঘোড়া ছুটিয়ে ওপরতলায় স্বীয়া নায়িকার দ্বারস্থ হতেন, এবং এই বাড়ীতেই নাপলেঁঅ রুশ অভিযানের পথে যৎকিঞ্চিৎ ফ্লার্টেশন্ সেরে যেতেন। ইতিহাসের অ্যালবামে প্রথম পাতায় রাখবার মত সামগ্রী। বাড়ীখানার সামনেই ছিল ত্রয়ানভ্স্কির কাফি-চা-মিষ্টান্নের দোকান। ত্রয়ানভ্স্কির খাবার মন্দ ছিল না, এমন কি সমজদার মহলে ত্রয়ানভ্স্কি ভালো না ভেঙ্গ্যেরক্যেভিচ্ ভালো, এ নিয়ে প্রায়ই বাক্-যুদ্ধ হয়ে থাকতো। তবে ত্রয়ানভ্স্কির "ইরানী

আঁখ” নামধারী মিষ্টান্ন যে উৎকৃষ্ট ছিল সে-কথা সবাইকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হতো। তাছাড়া কেকের সঙ্গে এখানে যে এক্‌স্‌ট্রা ক্রীম পাওয়া যেতো তাও অতুলনীয়। ত্রয়ানভ্‌স্কির আর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল এই যে, ১৯০৫ সালে এর ঠিক সামনে এক রুশ অফিসারের হত্যাকারী একটি পোল একটি বোমা বিস্ফোটিত করে যার ফলে দোকানটির একটি কাচের জানলা দস্তুরমত জখম হয়। তখনকার যুগে সে এক অভাবনীয় ব্যাপার। তাই প্রবেশপথে বিলম্বিত জানলা-ভাঙা ত্রয়ানভ্‌স্কির দোকানের একখানি প্রমাণ ফটোর দিকে সগর্বে অঙ্গুলিসঙ্কেত করে বৃদ্ধ অধিকারী গল্প বলতে বসতো : তারপর পানিয়ে, আমি তো ঘরের ভেতরে ক্যাশ্‌ আগলে বসে আছি, এমন সময়ে ঠিক এই জানলাখানার আধা-আধি রাস্তার ওপর ঠিকরে পড়লো।…বলতে বলতে সে একটা বাক্স থেকে কতকগুলো ভাঙা কাচ বের করে ক্রেতার বিস্ফারিত চোখের সুমুখে মেলে ধরে।…আব পানিয়ে, প্যরুণেব (বরুণদেব) পাঁচটা বাজ একত্তর করলে যে-রকম আওয়াজ হয় তার চেয়েও ভীষণ তার আওয়াজ !

হিট্‌লারদেবের বজ্র যে বরুণদেবের বাজ্রের মাথায় চাঁটি লাগাতে পারে তার পরিচয় বৃদ্ধ পেয়েছিল কিনা জানি না। উলীৎসা মিয়দভায় পা দিয়েই চোখে পড়লো ত্রয়ানভ্‌স্কির দোকানের ভগ্নাবশেষ। বাড়ীখানা বোমার চোটে প্রায় নিশ্চিহ্ন। জুতোর বাক্সে ভরা ১৯০৫ সালের বিদ্রোহে ভাঙা জানলার টুকরোগুলো যদি পাওয়া যায় তো তার ঐতিহাসিক পঙ্কোদ্ধার বিদ্বৎসমাজে একটি চিত্তাকর্ষক রহস্যোৎঘাটন বলে গণ্য হবে, সন্দেহ নেই। বাবিলনিয়া, মহেঞ্জোদাড়োর ভগ্নস্তূপ বানাতে মহাকালের যে অদৃশ্য, দীর্ঘসূত্র অধ্যবসায়, হিট্‌লারের ব্লিৎসের কাছে সে নিতান্ত সেকেলে, গৌশাকটিক যুগের জিনিষ। এক নিমেষে

একটি নিখুঁত ঐতিহাসিক ভগ্নস্তূপ সাজিয়ে দিতে বোমার তুলনা নেই। ভাবি, ত্রয়ানভস্কি যদি জীবিত থাকে তো তার সমগ্র বিপণিখানির এই অপরূপ স্তূপটিকে সযত্নে রক্ষা করবার মত জুতোর বাক্স সে পাবে কোথায়?

প্রাচ্য নিকেতনে ঢোকবার উপায় নেই। বাইরের কাঠামখানা ঝলসানো অবস্থাতেও দাঁড়িয়ে আছে, ভেতরের সবটুকুই ছায়ের গাদা, মাথার ওপর খোলা আকাশের চাঁদোয়া। মাত্র একটি ধূমনালী দিয়ে একটি ছোট্ট আগুনে বোমা কোথায় কোন্ ঘরে এসে ঢুকেছিল, তারই এই প্রতিক্রিয়া। প্রায় তিন সপ্তাহ আগে বাড়ীখানায় আগুন লেগেছিল, ছায়ের গাদার ভেতরে ভেতরে এখনো কী যেন গুমে গুমে জ্বলছে। পুরোনো ভিটের অন্তর্দাহ! ধোঁয়ার দিকে ইঙ্গিত করে বাড়ীর দারোয়ান বলে—পানিয়ে, এ শয়তানের আগুন, তিন হপ্তা ধরে জ্বলচে তো জ্বলেচেই। আর আমি এই তিন হপ্তা ধরে কোদাল-খন্তা নে বসে আচি, ককোন আগুন নিববে!···তারপর আমায় একপাশে নিয়ে গিয়ে খাটো গলায় বলে—আপনাদেঘরের ঐ যে ইস্কুলটো ছেলো না, সেটার আফিস-ঘরে ছেলো এই পেল্লায় এক নোয়ার সিন্দুক, তার ভিদ্‌রে এই আঁজলা আঁজলা সোণা-রূপোর টাকাকড়ি, যেতো সব গে পুব মুলুকের মোহর, তুর্কী, ইরানী, হিন্দুস্কি। যে থেকে আগুন নেগেচে, আমি সেই থেকে তক্কে তক্কে রইচি, বলি, এব্‌রে বুজি গরীবের কপাল খুললো। মেজেগুনো পুড়ে যখন হুদ্দাড় শব্দে নীচে পড়ে গেলো, তেকোনিই ঐ নোয়ার সিন্দুকটো পড়ার শব্দ আমি পষ্ট শুনিচি। ওর উব্‌রে এই তিনতল্লার সমান ছাই-পাঁশ! তা তারে খুঁড়ে বের করবো কী, সেই থেকে আগুন জ্বলচে তো জ্বলচেই!—

সিন্দুকের সঙ্গে সঙ্গে যে একাধিক যথের জীবন্ত সমাধি লাভ হয়েচে

তা ধোঁয়ার উৎকট জৈব উপাদানেই টের পাওয়া যায়। পোড়া বাড়ীর থম্‌থমে আবহাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো, গুপ্ত-ধনের সন্ধানে দারোয়ান আর তার ছেলেও হয়তো একদিন ঐ তিন তলার সমান আঙরার ভেতর তলিয়ে যাবে। মাথার ওপর ধূসর ঘাস, ঐ ছোট ছোট ধোঁয়ার চারা, সমাধিস্থলের সে এক শয়তানী চেহারা।···

পিঠে পঁচিশ সের করে বোঝা নিয়ে বেশীক্ষণ প্রাতভ্র্মণ করা চলে না। আমার আস্রা-মাটি সেখান থেকে দু-পা হলেও, সেটি ইতোমধ্যে আশ্রমলীলা সম্বরণ করেছে কিনা তার স্থিরতা নেই। তাছাড়া তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার কোনো জর্মান সৈনিকের হস্তে ন্যস্ত হয়েছে কিনা তাও সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চিত। বহুদিন প্রবাসের পর নিজের আস্তানার কাছাকাছি এসে পড়লে সাধারণতঃ মানুষের মনে যে চুলবুলোনি ধরে তা লক্ষ্য করবার বিষয়। সেদিন কেবলই ইচ্ছে করতে লাগলো, অন্য কোথাও যাবার আগে জিনষগুলো রেখে, দাড়ীটা কামিয়ে, স্নানটা সেরে, পোষাকটা বদলে এক কাপ চা করে নিলে হতো। নিয়তির সঙ্গে আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তির সে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব। আস্রা-মাটির প্রায় দোর গোড়ায় এসে কিসের টনকে আবার অন্য পথ ধরলাম।

যাবার আর জায়গা কোথায়? হয় দিদির* বাড়ী, না হয় তাঁর মায়ের কাছে। ওদিকে যেতে মন সরে না। রাস্তার দু-ধারে শহরের যে-চেহারা চোখে পড়ে তাতে ওঁদের সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করতেও সাহস পাই না। তবুও একবার পরস্পরের

* "মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়" দ্রষ্টব্য।

মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা ওঁদের বাড়ীর দিকেই চলতে লাগলাম।

তিন মাইল পথের এই ভ্রমণ-কাহিনী, মুসাফিরের রোজনামচার কয়েকটি পাতায় যতটুকু ধরে ততটুকু এর পরিসর।

মোড়ের ওপর দাঁড়িয়ে সূর্যের অবস্থান লক্ষ্য করে দিক নির্ণয় করতে হয়, চারিপাশের বাড়ীগুলোর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার নিশানাও বিলুপ্ত হয়েছে। প্লাৎস্ জ়াম্‌কভ্যী (দুর্গ-পল্লী) থেকে দক্ষিণ দিকে যে-রাস্তাটা ছিল তার নাম উলীৎসা সেনাতর্‌স্কা। মোড়ের ওপর ভেঙ্গ্যেরক্যেভিচের কাফি-খানা, আর একটি নিখুঁত ভগ্নস্তূপ। বাঁদিকে বরাবর ভস্মস্তূপ। এক দিকে আগুনে বোমা অপর দিকে গুঁড়োনো বোমার কীর্তিস্তম্ভ, যেন হিসেব করে, মেপে-জুপে তৈরী করা। ভগ্নস্তূপের মাঝখানে ছোট্ট রেস্তোরাঁটা কোথায় তার চিহ্নমাত্র নেই। ছোট্ট রোমান্টিক রেস্তোরাঁ, দিনের বেলাতেও আলো জ্বালা থাকতো, পেছন দিকটায় দু-জনকার বসবার মত একটি তেত্-আ-তেত্ কামরা, একটি স্ত্রী এবং একটি পুরুষ ভোক্তা এসে প্রবেশ করলে অন্যেরা সসম্ভ্রমে ইভ্যাকুয়েট্ করতো। ভাঙা জানলার ওপর হিংস্‌সুটে পরদা (jalousie) টাঙানো, তার ভেতর দিয়ে দেখা যেতো প্রমোদকানন বা বিবসনা মর্মরমূর্তি নয়, পাশের বাড়ীর খানিকটা নোংরা উঠোন, একটা ভাঙা বালতী আর জমাদারের ঝাড়ু। চোখে যাদের প্রেমের অঞ্জন লাগানো তাদের কাছে তা স্যুর্‌-রেআলিজ়্‌ম্-এর উৎকৃষ্ট উপাদান। প্রতিদিন দুপুরে এখানে উকিলদের হল্লা, হাকিমদের কেচ্ছা আর রূপবতী মক্কেলীন-বিশেষের আনাতমিয়া শস্তা সিগারেটের ধূম-বাষ্পিত আবহটিকে লালসা-মধুর দিবানিদ্রার মত উপভোগ্য করে রাখতো। তার ওপর এখানকার রাজহংস বা পেরুর নিটোল পদদ্বয় বা সুপুষ্ট বক্ষপার্শ্ব বা বৃষস্কন্ধ মেষের কাফ্‌কাসী শিক-

কাবাব, পরম নিরামিষাশীরও আজীবন ব্রত ভঙ্গ করতে সমর্থ হতো। ইট আর রাবিশের গাদার ওপর দিয়ে যাবার সময়ে পরিচারিকা পান্না* মারিয়ার সাবলীল চেহারাটি মনে পড়ে, নীলাক্ষী, nacre-দশনা, ক্ষীণকটিনী, কৃশপদী, এমন কি উকীলরাও গদগদকণ্ঠে আহার্য প্রার্থনা করতো—পান্নো মারিয়ো, লাল বাশ্চ্‌† আর গিনী-ফাউল, নিজের হাতে দেখে শুনে, কেমন? পান্না মারিয়ার হাতে খাবার জন্যেই তো বাড়ী থেকে ছুতো করে পালিয়ে আসা!—ইটের গাদার ওপর দাঁড়িয়ে কে বলবে এখানে প্রতিদিন নব-নব জীবননাট্য অভিনীত হতো?

সেনাতর্‌স্কাকে কেটে মিয়দভা পূর্ব-পশ্চিমে চলে গেছে: একটানা ধ্বংসস্তূপ। তারপর বাঁদিকে কৃষি-মন্ত্রিত্বের অট্টালিকা: আধপোড়া কাঠাম, আশ-পাশের বাড়ীগুলো হয় ইট না হয় ছাইয়ের গাদা। বেঁচেছে সুধু দু-পাশে দু-খানা দোকান, পণ্যহীন কাঠের বাক্স আর শূন্য মদের বোতল। দু-পা গিয়ে ভারশৌ-এর কেন্দ্রস্থল, প্লাৎস তেআত্রাল্‌নী। বাদিকে উলীৎসা ফশা, তারপর ত্রেম্বাৎস্কা, দুটো রাস্তায় খানকয়েক বাড়ী কোনো রকমে আত্মরক্ষা করেছে। শহরের এ-দুটি রাস্তাকে বাস্তবে দেখলে ফটো বলে ভুল হতো, এবং প্রতিদিন ট্রামে করে যাবার সময়ে মনে হতো যেন একটা জীবন্ত ছবি-পোস্ট্‌কার্ডের ভেতর দিয়ে চলেছি। একদিনের আক্রমণে বহু শতাব্দীর স্থাপত্য এবং একটি সমগ্র পল্লীর চারিত্রিক বিশেষত্ব সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়েছে।

প্লাৎস্‌ তেআত্রাল্‌নীর ডান দিকে বিশাল নগর-সমবায় ভবন যে এখনো মোটামুট অক্ষত শরীরে দাঁড়িয়ে আছে তা দেখে সত্যিই কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। ভেতরটার খানিকটা নষ্ট হয়েছে এবং ছাদের

* মাদ্‌মোয়াজেল্‌।

† বীট্‌রুটের সূপ।

স্লেটগুলোর জায়গায় জায়গায় ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়, কিন্তু পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এর আমূল অসামঞ্জস্য দৃষ্টিকে দস্তুরমত পীড়া দেয়। সমবায়-ভবনে এর মধ্যেই জর্মান সরকারের সেক্রেটেরিয়েট্ মোতায়েন হয়ে গেছে। সেদিন সকালেই লক্ষ্য করেছি, শহরের যা কিছু জ্ঞাতব্য, নালিশ বা অসুবিধার প্রতিকার এবং আর্তের সহায়তা তার মূল আধার নাকি এই সমবায়-ভবনের জর্মান কাছারী। একেবারে কোম্পানীর রাজত্ব! পথে পথে জনতাকে লক্ষ্য করে সহৃদয় জর্মান সৈনিকেরা বলে বেড়ায়—আবের গেহেন জ়ী নাখ্ রাত্‌হাউস্, যাও ঐ কাছারীতে, সব ঠিক হয়ে যাবে। সমবায়-ভবনের সামনে গোটা চত্বরটায় লোক ধরে না। ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পেছনে লম্বা লম্বা মানুষের লেজুড় গোলোকধাঁধাঁর জটিল রেখার মত একসঙ্গে জোট পাকিয়ে রয়েছে। আমাদের মুসাফিরী চেহারা দেখে একটি সৈনিক বুট খট্‌খটিয়ে কাছে এসে জিজ্ঞেস করে—কী চাই ?

যথাসম্ভব সংযতভাবে তৎপরতার সঙ্গে জবাব দিই—হ্‌ম্ হ্‌ম্, চাই বৈকি, অব্বিশ্যি, নিশ্চয়, না চাইলে পাবো কোথায় ?—চাহিদার বস্তুটাই যে উহ্য রয়ে গেলো তা জর্মান সান্ত্রীর বিশাল কাণ দিয়ে বিশালতর মরমে পশিল না সেইটেই আশ্চর্য! পায়ের বুট খট্‌খটিয়ে, লোহার "কুশ-বেড়ী" ঝন্‌ঝনিয়ে নিখুঁত সামরিক অঙ্গুলীসঙ্কেত দ্বারা প্রায় তিন শ গজ দূরের একটি লেজুড় বাংলে দিয়ে বললে—ঐখানে গিয়ে দাঁড়াও!—জানি না, হয়তো ঐ লেজুড়টি তাদের যারা চায় অথচ কী চায় তা জানে না। সুতরাং আমরা যখন অনেক কিছু চাই, অথচ কিছুই পাবার আশা রাখি না, তখন ভুল লেজুড়ে ঢুকে কোন্ এক অজ্ঞাত অরূপ-রতনের সম্মুখীন হলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী জেনে অসংখ্য লেজুড়ের গোলকধাঁধাঁর ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে, জর্মান সান্ত্রী আর

পোল পুলিশ কর্তৃক ভৎর্সিত হয়ে অবশেষে চাহিদার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম।

প্লাৎস্‌ তেআত্রাল্‌ন্যীর বাঁ দিকে পাশাপাশি তিনটে থিয়েটার। অপেরা বা তেআত্র্‌ ভ্যেল্‌কি, তেআত্র্‌ নারদভ্যী (জাতীয়) এবং তেআত্র্‌ নভ্যী (নব), যাদের অবস্থিতির প্রসাদেই সমস্ত চত্বরটার নাম প্লাৎস্‌ তেআত্রাল্‌ন্যী। পোলীয় জাতীয় জীবনে রঙ্গমঞ্চের অবদান যে কত ব্যাপক তার পরিচয় পাই পোলদের নাট্যসাহিত্যে। শতাধিক বৎসর পরাধীনতার যুগে পোলদের পোলীয়তাকে সজীব রেখেছিল ওদের ঐ থিয়েটার। বাস্তব জীবনে যা কিছু ওরা উপলব্ধি করতে পায় নি, রাষ্ট্রিক বা সামাজিক জীবনে যে-সব স্বপ্ন ওদের অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে, তার প্রত্যেকটির পুনঃসৃষ্টি দেখতে পাই ওদের নাট্যশালায়। জীবনকে মায়ার সোনার কাঠিতে বাস্তব করেছে ওদের ঐ রঙ্গভূমি। পাশাপাশি তিনটে প্রকাণ্ড থিয়েটার, এবং তার পেছন দিকে নাট্যশিল্প নিকেতন ও তার সুবৃহৎ গ্রন্থাগার আজ এক বিশাল ভস্মস্তূপ, সুধু বাইরের আধপোড়া কাঠামখানা জার্মানদের বিচার-বুদ্ধি ও সহৃদয়তা সম্বন্ধে বহির্জগতে প্রোপাগান্দায় সাহায্য করবার জন্যেই যেন এখনো খাড়া রয়েছে। মনূাশ্‌কোর জাতীয় অপেরা "হাল্‌কা" এবং ভ্যীস্পিয়াঞ্‌স্কির কাব্য-নাটক "ভেসেলে" (বিবাহ-বাসর)-এর তুলনা কোনো ইউরোপীয় সাহিত্যে মেলে না। যাদের পায়ে কোনদিন পরাধীনতার জঞ্জীর বাজে নি তাদের কাছে হয়তো ভেসেলের আবেদন তত শক্তিমান নয়। কিছুদিন আগেই জাতীয় নট্যশালার প্রেক্ষণগৃহে হাজার হাজার পোল ও পোলিকার মাঝে যে একটি তাম্রত্বক হিন্দুস্থানী বসেছিল, "ভেসেলের" শেষ দৃশ্যে তার সর্বদেহে সমানুভূতির রোমাঞ্চ। পোলেরা যে-স্বাধীনতার স্বর্ণশৃঙ্গ পেয়েছিল তা হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেল। বিবাহ-বাসরের

মেহমানদের মধ্যে মাত্র ক্ষণেকের বিমূঢ়তা। সত্যিই তো, কোথায় সেই সোনার শিঙা? কিন্তু পোল চাষীরা সেদিন অন্বেষণের প্রবৃত্তিও হারিয়েছে। কয়েক মুহূর্তের বিরাম। তারপর আবার তারা পোষাকের রঙের বাহার ঝলমলিয়ে নাচতে সুরু করে। ওরা আবার সেই স্বর্ণশৃঙ্গ হারালো। আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী! নৃত্যপর মেহমানদের লক্ষ্য করে সর্বাঙ্গ খড়ে-ঢাকা হোহোল্‌ বলছে—

পেয়েছিলি, বেটা, সোনার শিঙে,
টুপীতে বসানো ময়ূর-পাখা ;
টুপী নিয়ে যায় বাতাস,
বনেতে শিঙের হুতাশ,
হাতে তোর সুধু শিঙের দড়ি···

চলতে চলতে হোহোলের কথাগুলো কানে বাজে।

প্লাৎস্‌ তেআত্রাল্‌নী ছাড়িয়েই সামনে এচিং-এর মত রাস্তাটা উলীৎসা আল্‌বের্তা, সাস্কি পার্কে গিয়ে পড়েছে। তার দুপাশে সারি সারি ভস্মস্তূপ। বাঁ-দিকে উলীৎসা ভ্যেরু্‌বভা বা উইলো-বীথিকা। আগে এখানে হয়তো উইলো-গাছের প্রাচুর্য ছিল। আধুনিক ভারশৌ-এর এটি ছিল "মে ফেয়ার"-জাতীয় পল্লী। খুব অল্পসংখ্যক বসতবাড়ী। দু-পাশে বরাবর নামজাদা দোকান, জুতো, ফার, ঘর সাজাবার মনোহারী টুকিটাকি, দামী এক্সতিক্‌ ফুল, চকোলেট, শৌখীন পর্দা, এবং সর্বোপরী লার্দেল্লি নামধারী উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন এবং কাফির আড্ডা। এই রাস্তাতেই এমন একটি জিনিষ ছিল যার নামই জর্মান বৈমানিকদের পক্ষে যৎপরোনাস্তি লোভনীয়। সেটি একটি পান্থশালা, নাম হোতেল আঙ্গেল্‌স্কি, ইংলিশ্‌ হোটেল। ভারশৌ-এর ওপর ঘোরতর আক্রমণের সময়ে আমরা একদিন এই হোটেলটারই ভিত-কামরায় আশ্রয় নিতে

বাধ্য হই। রাস্তার ওপাশে পোলীয় পররাষ্ট্র-মন্ত্রিত্ব। সমস্ত রাস্তাটার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ইটের গাদা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। সুধু পররাষ্ট্র-মন্ত্রিত্বটাকে অদ্ভুত হাতের কারসাজিতে বাঁচানো হয়েছে। সেখানেও আর এক কোম্পানীর কাছারী, এবং ইটের গাদার ওপর দিয়ে রাস্তা জুড়ে লেজুড়ের পর লেজুড়।

আরো কিছুদুর গিয়ে সামরিক আফিস। এ বাড়ীটাকেও ভবিষ্যতে কাজে লাগাবার জন্যে বাঁচানো হয়েছে। তার সামনেও অসংখ্য মানুষ, তবে সবাই পুরুষ। খোঁজ নিয়ে জানলাম, এ-পাশের লেজুড়গুলো পোলীয় অফিসারদের; যাঁরা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের নামধাম টোকা হচ্ছে। শাস্তি-বিধানের আগে এঁদের স্বেচ্ছায় ধরা দিতে হবে। জার্মানী বন্দোবস্তের তারিফ না করে উপায় কী? লেজুড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমারই একটি সতীর্থ গণিতের অধ্যাপক সময় কাটাবার জন্যে পরম অভিনিবেশের সঙ্গে আঁক কষছেন। শুনলাম, তিনি গতকাল সারাদিন ঐ অসহ্য শীত আর তুহীনের মধ্যে দাঁড়িয়েও তাঁর নিজের নামধাম টোকাতে সমর্থ হন নি। স্বেচ্ছামৃত্যুকে বরণ করবার জন্যে এই যে অধ্যবসায় তার পেছনে গেস্তাপোর কোনো দুর্দমনীয় যাদু আছে কিনা জানি না। তবে এরা যে মরণ দিয়ে মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্করকে প্রতিরোধ করতেই এসে হাজির হয়েছে তা এদের মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

বাঁদিকে প্লাৎস্‌ পিল্‌সুদ্‌স্কিয়েগো। অনেকখানি খোলা জায়গা। তার ওপারে বিশাল পান্থশালা হোতেল এউরোপ্যেয়্‌স্কি। যুদ্ধের আগে রাজা মহারাজা-জাতীয় ব্যক্তিরাই (এবং ফিল্ম-নটীরাও) এ হোটেলে দু-এক রাত কাটাতে পারতেন। এখন সেখানে জর্মান অফিসারদের আড্ডা। তার সামনে ছিল মিলিটারী হেড্‌ কোয়ার্টার্স্‌, আর একটি

পোড়া কাঠাম। এদিকে প্রকাণ্ড প্রাসাদ পাল্যাৎস্‌ ক্রোনেন্‌বের্গা, স্থাপত্যের সৌন্দর্যে এবং আভ্যন্তরীণ কারুকার্যে বাড়ীখানা শহরের একটি গৌরবের বস্তু ছিল। তার ভেতরটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ডানদিকে উলীৎসা ক্রুলেভ্‌স্কা। ১০ নং বাড়ীখানা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা নিকেতন। প্রাচ্যবিদ্যা সম্বন্ধীয় প্রকাণ্ড গ্রন্থ-সংগ্রহ এবং সুরাটের নিকটবর্তী ধরমপুরের মহারাজার সাহায্যে গঠিত একটি ছোটখাটো ভারতীয় যাদুঘর ভারশৌ-বাসিদের একটি আকর্ষণস্থল ছিল। এখন সেটি একটি নিখুঁত ভস্মস্তুপ।

তাব সামনেই জ্যাহেস্তা, পোলীয় চিত্রগৃহ। সমগ্র অট্টালিকাটি ভস্মীভূত, আর তার ভেতরে যে শত শত আলেখ্য পোলীয় চিত্রকলাকে জগৎ-বরেণ্য করেছিল তাদের চিহ্নমাত্র নেই। জ্যাহেস্তার দাহকার্যের মূলে যে জর্মান বৈমানিকদের নিছক ধ্বংস-প্রীতিই ছিল তা নয়, তার মুখ্য লক্ষ্য ছিল মাত্র একখানি ছবি, শিল্পী মাতেইকোর আঁকা Gruenwald. বিষয়বস্তু গ্র্যুন্‌ভাল্ডের যুদ্ধে পোল কর্তৃক জার্মানদের পরাজয়। সুধু এই একখানি ছবিব ধ্বংস-কার্যে ওরা সমগ্র পোলীয় চিত্রকলাকে দগ্ধ করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। তবে সান্ত্বনা সুধু এইটুকু যে পোলরা সর্বস্ব পণ করে সুধু এই গ্র্যুন্‌ভাল্ড্‌কেই বাঁচাতে সমর্থ হয়েছিল। ছবিখানি যে আছে তা সবাই জানে, তবে কোথায় তা কেউ জানে না।

জ্যাহেস্তার ডান দিকে এভাঙ্গেলিক্‌দের গির্জা। পাকা হাতের বোমা। চারিপাশের বর্তুলাকার দেওয়ালটি খাড়া আছে; গম্বুজটিকে এমন নিখুঁতভাবে সরিয়ে দিতে গেলে কতখানি নৈপুণ্যের প্রয়োজন তা চোখে না দেখে বিশ্বাস করা যায় না। এভাঙ্গেলিয়া-পন্থীদের ওপর হিট্‌লার সাহেবের রাগের কারণ ছিল বৈকি। জার্মানদের সমধর্মী

হওয়া সত্ত্বেও তারা যে গুপ্তচর হতে রাজী হয় নি, এর চেয়ে অমার্জনীয় অপরাধ আর কী হতে পারে ?

বাঁদিকে উলীৎসা ত্রাউগুত্তা। তার একপাশের প্রায় সবটা জুড়ে কাউন্ট্‌ রাচ্যীঞ্‌স্কির প্রাসাদ। কাউন্ট্‌ রাচ্যীঞ্‌স্কি ছিলেন ইংলণ্ডের দরবারে পোলীয় প্রতিনিধি, (এখন তিনি পোলীয় পররাষ্ট্রসচিব), সুতরা তাঁর প্রাসাদের প্রসাদে সমস্ত রাস্তাটা একটা একটানা ইট, কাঠ আর ছাইয়ের গাদা।

তারপর উলীৎসা মাজ্‌ভ্যেৎস্কা, শহরের আর একটি অপূর্ব এচিং। বইয়ের দোকান, কিউরিয়ো, ছবি, গালচের দোকান, ঝ্যেমিয়াঞ্‌স্কি নামধারী ভারশৌ-এর সর্বোৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন-ভাণ্ডার, তার ওপর-তলায় ভারশৌএর সিলেক্ট্‌ কাবারে Qui pro quo. এক কথায় একটি ছোটখাটো বোহেমিয়া। মাত্র খানকয়েক বাড়ী আত্মরক্ষা করেছে, বাদবাকী সারি সারি অন্তর্দগ্ধ ইমারৎ।

প্লাৎস্‌ নাপলেঅনা, তাব পাশ দিয়ে উলীৎসা শ্বেন্তোক্‌শীস্কা। রাস্তার বাঁদিকের অংশটুকু গ্রন্থবিলাসীদের তীর্থস্থান ছিল, এখন যত দূর দেখা যায় ভস্মস্তূপ। হয়তো ভেতরদিককার কিছু কিছু অংশ বাসোপযোগী আছে, ছাই আর ইটের গাদার ওপর দিয়ে মানুষ চলেছে। দূর থেকে উইয়ের ঢিপি বলে ভুল হয়। প্লাৎস্‌ নাপলেঅনার ডান দিকে শহরের একতম অভ্রচুম্বী ইমারৎ, নীচের তলাগুলো কোনোরকমে খাড়া আছে। আশেপাশে চারিদিকে অগ্নিকাণ্ডের ধ্বংসাবশেষ। সুধু বড় পোস্ট্‌ আফিসটিকে যথেষ্ট নৈপুণ্যের সহিত বাঁচানো হয়েছে। জর্মান লড়াকুদের সঙ্গে স্ব স্ব জিলায় ফ্রাউদের খৎ-বিনিময় না চললে যে ঘরমুখো জার্মানদের বেশীদিন বিদেশে রাখা চলবে না, তার পরিচয় এই হিট্‌লাবী পতাকা-পৎপতান্বিত বড় পোস্ট্‌

আফিস। খবর নিয়ে জানা গেল, পোলদেশের এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশের কোনো পৌস্টিক সম্পর্ক নেই বটে, তবে পোলদেশ থেকে জার্মানীর যে-কোনো ক্ষুদ্রাপি ক্ষুদ্র পল্লীতে চিঠি লেখা চলে। পোস্ট্‌ আফিসের সামনে বড় বড় অক্ষরে লেখা ঃ

ইহুদীদের প্রবেশ নিষেধ।

জার্মানদের পোস্ট্‌ আফিস মার্ফৎ জার্মান আর পোল ইহুদীরা যে পরস্পরের সঙ্গে প্রেমপত্র-বিনিময় করবে না, তা অবধারিত বলেই ঐ বিজ্ঞপ্তিটুকু নিতান্ত বাহুল্য বলে মনে হর। কয়েক দিন রাজত্বের ফলেই যে জার্মানরা পোলদেশে ইহুদী-বিদ্বেষ এনে হাজির করেছে এইটুকুই লক্ষ্য করবার মত।

তারপর রাস্তার পর রাস্তা, শ্‌পিতাল্‌না, জ্‌গদা, প্লাৎস্‌ ট্রছেথ কৃশ্চীঝ্ন্যী, তারপর কিছুদূর গিয়েই দিদির বাড়ী। ধ্বংসস্তূপের মাঝে মাঝে দু-একখানা বাড়ী অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, জানলায় একখানা কাচ নেই, কোনো কোনো বাড়ীর চেহারা হাস্যের উদ্রেক করে। যে-সব বাড়ীর আধাআধি বোমার চোটে ভেঙ্গে পড়েছে তাদের বে-আব্রু অন্তঃপুর নির্লজ্জ উন্মাদিনীর মত অশ্লীল।

ছাই আর ইটের গাদার ওপর দিয়ে চলে অসংখ্য মানুষ, হানা শহরের বর্তমান অধিবাসী, পেটের জ্বালায় পাগল, শীতে আড়ষ্ট দেহ, আকৃতিতে আশার লেশমাত্র নেই, ভবিষ্যের কল্পনাহীন জীবন্মৃত কঙ্কাল, ছেঁড়া জামা আর ছেঁড়া জুতোর অদ্ভুত ম্যানিকিন্‌।

ঐ যে দিদির বাড়ী।

দিদির ফ্ল্যাট পাঁচতলায়। ওপরে সিঁড়ির কাছে কাঁচা হাতের দারোয়ানী লেখা ঃ

এই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠা বিপন্ন।

পঞ্চম তলে বম্বা পতন হইয়াছে।

ওখান থেকে সটান মায়ের বাড়ীর যাওয়া উচিৎ কিনা ভাবছি এমন সময়ে দারোওয়ান নিজের লেখার তারিফ করবার জন্যে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো, তারই হাতের লেখা পাঁচজনে পড়ছে সে-আনন্দ প্রথম গল্প ছাপানোর মতই রোমাঞ্চক। চোখ টিপে শুধায়—পানিয়ে প্রফেসঝে বানাম-টানাম কিছু ভুল হয়েছে নাকি? কদ্দিন নেকাজোকা অব্যেস নেই, তাই বলি, বলে দু-একটা বানাম-টানাম···আর চোকেও কি ছাই সে জোর আচে, কী নিকতে কী নিকি তার ঠিক নেই। তা আবনারা একেনে দাঁড়িয়ে রয়েচেন যে!—বলে একটা ছেঁড়া জুতোর বাক্সের একটুকরোর ওপর ছোট ছোট আখরে লেখা আর একটি বিজ্ঞপ্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঃ

উপরে উঠিবার পথ পিছনে রান্নাশালার দিক দিয়া।

তবুও জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাই না। আমাদের দ্বিধা লক্ষ্য করে সে নিজেই বলে—যান্ না উব্রে। ওনারা বোধায় বাড়ীতেই আচে।

পানীকে দেখেচ ?

তা আর দেকিনি ! নিত্যি দেকতে পাই, তবে শরীলটে তেনার ভালো নেই।

কী রকম পোষাকে দেখেচ ? কালো ?

এঁজ্ঞে না, কালো হতে যাবে কেন ? ওনারা সবাই যে বত্তমান। তবে পান্ আর উটতে হাঁটতে পারে না।

পানীর মাকে দেখেচ ?

তা আর দেকি নি ! এই আজ সক্কালেই এসেছেলেন যে। তেনার গায়ে আঁচড়টি পজ্জন্ত লাগে নে।

পেছনদিককার দেড় ফুট ধাপ-ওয়ালা সিঁড়ি বেয়ে পঁচিশ সের করে বোঝা নিয়ে পাচতলায় যে অতি সহজে ওঠা যায় তার প্রমাণ, কয়েক মুহূর্তেই আমরা দিদির দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। "পঞ্চম তলে" যথার্থ ই একটী "বম্বা পতন" হয়েচে, দিদির ফ্ল্যাট থেকে বিশ গজের মধ্যেই। ফ্ল্যাটটা আসবাব সমেত নীচের আর একখানা ফ্ল্যাটকে সঙ্গে নিয়ে তিনতলায় গিয়ে হাজির হয়েছে। ওদিককার সিঁড়ির অনেকখানি ভেঙে গেছে, এবং সেদিক দিয়ে নামতে যাওয়া সত্যিই "বিপন্ন", কারণ সামান্য পদস্খলনে পাঁচতলা থেকে একতলায় এসে পড়ার পথ মাত্র পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি।

দিদির দরজায় লাগানো ঘোরানো-ঘন্টা বাজিয়ে আমরা প্রায় রুদ্ধশ্বাসে তাঁর একটি-একটি-করে-এগিয়ে-আসা পায়ের শব্দ শুনতে লাগলাম। দিদিকে চেনা যায় না। ৭ই সেপ্টেম্বর যখন আমরা ভারশৌ ছেড়ে চলে যাই তখন ক্যের্বেজ্যা-পুলের কাছে তাঁর চেহারা মনে

পড়ে। তখনই রুগ্ন স্বামীর সেবায় এবং আত্মীয়, অনাত্মীয়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে হাজার রকমের উদ্বেগে তাঁর শরীর প্রায় ভেঙে পড়েছিল। আজ দেড় মাসের অনিদ্রা, শ্রান্তি এবং স্বল্পাহার দিদির চেহারায় একটি আকর্ষণী আধ্যাত্মিকতা এনে দিয়েছে বটে, কিন্তু তাঁকে দেখলে বেশ বোঝা যায় তিনি শুধু অদম্য মনের জোরেই নিজেকে তখনো ধরে রেখেছেন। দিদিব মুখে কথা সবে না। আমাদের জড়িয়ে ধরে হটাৎ কেঁদে ফেললেন, তারপর চোখ মুছে বললেন—তোদের খুব ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয় ?

পেয়েছ বৈকি, কিন্তু আগে ভেতবে ঢুকতে দাও।

ওমা, ঐ দেখো, তোরা যে বাইবে দাঁড়িয়ে রয়েছিস্ সে-কথা আমাব খেয়ালই নেই। আজকাল কেবলই ঐ রকম ভুল করে বসি।

এবার থেকে আর ভুল কবা চলবে না। এই দেখো এই একটি গেলাস টাটকা মাখন, আর এই সেব দশেক মাংস, আর এই পাঁচ সেব ছাতা-পড়া রুটি। মাখনটা কিন্তু কর্তার জন্যে, তাঁর শরীর কেমন ?

ঐ দেখ না।—বলে তাঁর আধো-ঘুমন্ত স্বামীর দিকে সঙ্কেত করলেন। আমাদের তিনি চিনতে পারলেন কিনা বলা শক্ত। খানিকক্ষণ অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জড়ানো কথায় জিজ্ঞেস করলেন—আউস্ট্রিয়া এ-যুদ্ধে যোগ দিয়েছে কি এখনো ?—তার পরের কথাগুলো বোঝা গেল না। রুগ্ন শরীরের ওপর ব্লিৎস্-যুদ্ধের অসহ্য শ্রান্তিতে তাঁর স্নায়ুমণ্ডলী বিকল হয়ে পড়েছে। আংশিক পক্ষাঘাতে পঙ্গু এই অত্যন্ত সুজন ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে আমাদের চোখ ফেটে জল এলো। দিদি ইশারায় আমাদের দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন—ওঁর সামনে ভাই তোরা চোখের জল ফেলিস্ নে। সব দিকে ওঁর নজর, ভেতরে ভেতরে টন্‌টনে জ্ঞান রয়েছে। তাছাড়া কাঁদবার অনেক সময় পাবি।—

বলে দিদি অন্য দিকে মুখ ফেরালেন, এবং পরক্ষণেই মুখে হাসি ভরে বললেন—তোরা যেন কী হয়ে গেছিস্‌! বস্‌, হাত-পা ধো, আমি কিন্তু এই চা ঢাললুম বলে। তোদের প্রত্যেককে ঠিক দু-মিনিট করে সময় দেওয়া হলো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘরে ফিরে দেখলাম, ভগিনীদ্বয় টেবিল সাজিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। শহরের এই অবস্থায় আহার্যের প্রকারভেদ ও প্রাচুর্য লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেলাম। দিদির পুরোনো অভ্যেস, অতিথি এলে কোথা থেকে যে তিনি হরেক রকমের খুঁটিনাটি খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে আনেন তা আমার কাছে বরাবরই একটি দুর্ভেদ্য রহস্য ছিল। কিন্তু ঠিক এই সময়ে ডিম, রুটি, মাংস, আলু, এবং তার ওপর চায়ের সঙ্গে প্রাক্‌-সামরিক যুগের ওয়াফ্‌ল্‌ ও চকোলেট কোথা থেকে জোগাড় করলেন তা জানি না।

অতিথি-ভোজন করানো ওঁদের একটি পারিবারিক কুসংস্কার। তাই দিদি প্রত্যেকটি পদের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ পূর্বক তা গলাধঃকরণ করবার জন্যে পৃথক্‌ পৃথক্‌ আদেশ দিতে লাগলেন। এবং আমিও নির্বিবাদে তাঁর আদেশ পালন করে চললাম :

খাওয়ার পর চা ঢালতে ঢালতে দিদি বললেন—এ এক অদ্ভুত চা! খেতে পারিস্‌ খা, না হয় ফেলে দিস্‌। এর নাম দিয়েছে "হের্‌বাতা" (পোল ভাষায় চা) নয়, "হের্‌বাতুম্‌।" ছোট ছোট শিশিতে করে বিক্রী হচ্ছে শহরে, গরম জলে এক চামচ আধ চামচ করে মেশালেই জলের রং চায়ের মত হয়ে ওঠে। স্বাদ-গন্ধ কিচ্ছু নেই। শুধু চিনি-পোড়া জলে গোলা, তার সঙ্গে কী একটা এসেন্স মিশিয়েছে।

ঐ নিদারুণ শীতে দেড় মাসের পরিশ্রান্তির পর দিদির হাতের হের্‌বাতুম্‌ দেব-পেয়র চেয়ে কম উপভোগ্য নয়। যে-কোনো আহার্য বা

পেয় দিদির আন্তরিকতায় এক অপূর্ব স্বাদ গ্রহণ করে, বরাবর লক্ষ্য করেছি। সেদিনকার ঐ প্রাতরাশের পরিতৃপ্তি আমার জীবনে একাধিকবার উপলব্ধি করেছি বলে মনে হয় না।

দিদির যে বড় আজ আফিস যাওয়া হয় নি?—জিজ্ঞেস করি।

আফিসটা আছে বটে, কিন্তু কাজ কোথায়? আজ আর নাই বা গেলাম।

সত্যি?

সত্যি। অবিশ্যি তোদের নিশ্চয় খুব ঘুম পেয়েছে। তোরা বরং যে যেখানে পাস্‌ শুয়ে পড়্‌, আমি না হয় আফিসটা একবার ঘুরেই আসি।

তাই বৈকি! তোমাদের এতদিন কী ভাবে কাটলো তা কিছুই যে এখনো শোনালে না! তাছাড়া ওঁর কথা—

দিদি চুপিচুপি বলেন—তাহলে চল্‌ ঐ দিকটায় টেবিলটাকে টেনে নিয়ে যাই।

তৃতীয় কাপ হের্‌বাতুম্‌ ঢেলে দিদি গল্প শোনাতে বসেনঃ

···সেদিন পোলের কাছে কোথায় যে তোরা হারিয়ে গেলি, খুঁজে পেলাম না। অবশ্য তখন খোঁজবার সময়ই বা কোথায়? আমি কেবল ভগবানের কাছে, অবশ্য হিরণের নেতিবাদী ভগবানের কাছে, কেবলই প্রার্থনা করছি, বলি, হে পরম "নাস্তি", ওদের দু-জনকে অন্ততঃ পোলটা পার করে দাও। দূর থেকে পোলের ওপর দু-মুখো ভিড়ের ধস্তা-ধস্তি দেখে মনে হচ্ছিল, হয়তো তোরা এমনিতেই সবশুদ্ধ পোল ভেঙে জলে

পড়বি। ওদিকে বোমা পড়তে সুরু করেছে, কাজেই আর একবার "নাস্তির" কাছে আবেদন জানিয়ে আমি বাড়ীর দিকে চলতে লাগলাম। নদীর ধার দিয়ে গেলেও বাড়ী সেখান থেকে চার কিলোমেত্র্। শহরের ওপরে তখন প্রচণ্ড আক্রমণ চলেছে, আর নদীর ধার দিয়ে গেলেও বিপদ কম নয়, কারণ ওপর থেকে বোমারু-শিকারী কামানের গোলা আর মেশিনগানের গুলী শিলাবৃষ্টির মতন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সেদিনকার মতন আক্রমণ তার আগে হয় নি। সুতরাং বুঝতেই পারছিস্, তার চোটটা কী রকম। সকাল থেকে বাড়ী যেতে পারি নি। ওঁকে সেই যে একটু দুধ আর রুটি খাইয়ে এসেছিলাম, তারপর আর বেচারীর পেটে কিছু পড়ে নি। তাছাড়া ওঁকে ওরকম করে একেবারে একলা ফেলে আসা! প্রাণটা ধড়ফড় করছে। তাই মরি কি বাঁচি করে বাড়ীর দিকে চলেছি। হয়তো ঘন্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছতেও পারতাম, কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই ও-পে-এল্-এর* লোকেরা আটকে ফেললে। একটা বাড়ীর ভিত-কামরায় ঝাড়া চারটি ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে। আমি বেচারীর তখন যা অবস্থা! এদিকে ভাবছি তোরা পোল পার হতে পারলি কি না, ওদিকে ভাবছি, মামুস্যা (মা) বেচারী হাঁসপাতালে নার্স্গিরি করছে, তারই বা কী অবস্থা হলো, কারণ ওরা তখন আর হাঁসপাতাল-টাঁসপাতালের খাতির করছে না। আর ওদিকে তোদের ভগিনীপোত বেচারী ক্ষিদেয় টাটা করছে, কিংবা হয়েই গেছে কি না তাই বা কে জানে! জানিস্ তো ওঁর তখন যা অবস্থা তাতে বোমার আওয়াজের শকেই কিছু হয়ে যাওয়া একেবারেই আশ্চর্য নয়। যাই হোক বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। কী ভাগ্যি, উনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। একে অসুখ শরীর, তার ওপর পেটের জ্বালা, এক ঘুমে দিন কাবার।

* Obrona Przeciwlotnicza—অর্থাৎ এ-আর্-পি।

তোদের দেশ-ছাড়া করে দিয়ে এসে রাতে ঘুমতে পারি না, যদিও ভেতরে কে যেন বলছিল, হিরণের "নাস্তি" ওদের ঠিক পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। এখন ভাবনার ওপর ভাবনা। ভাই দুটো তো যুদ্ধে গেছে, তাদের জন্যে ভেবে লাভ নেই। ভাবনা মামুস্থা আর ওঁকে নিয়ে। মামুস্থার অসম্ভব খাটুনি পড়েছে। আহত সৈনিকে সমস্ত হাঁসপাতাল ভর্তী, আর ওরা হাঁসপাতাল লক্ষ্য করেই বোমা ফেলছে। সে-সব তোমরা শুনো এখন মামুস্থার কাছে। আর ওঁকে নিয়ে সে যে কী মুস্কিল তা তোমরা ধারণাও করতে পারো না।

দিন কতক পরেই আফিস-টাফিস একেবারে ফাঁকা। তবুও যখন শহরে রয়েছি তখন কর্তব্যের খাতিরেও দিনে একবার করে ঘুরে আসি, ঘণ্টা দুই-তিনের জন্যে। ওঁকে একলাই ফেলে রেখে যেতে হয়, উপায় কী? বাড়ী ফিরে কিন্তু আর ওপরে বসে থাকতে ভরসা হয় না। সাইরেন বাজলেই ওঁকে নিয়ে পাঁচতলা থেকে ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামি, তারপর আবার সেই পাঁচতলায় ওঁকে নিয়ে উঠতে হয়। পরে অবশ্য একটু সুবিধে হয়েছিল এই যে, এক-একটা আক্রমণ তিনচার-ঘণ্টা ধরে চলতে লাগলো, সুতরাং দিনে বার তিনেক সাইরেন বাজতো, আর ওঁকেও নীচে বসিয়ে রাখতাম একরকম জোর করেই। নীচে ঐ রুগ্ন লোকটিকে কোথায় রাখি বলো তো? আর উনিও ঘর ছেড়ে বেশীক্ষণ থাকতে চান না। একদণ্ড বই হাতে না পেলে রেগে অস্থির। এখন কে ওঁর জন্যে গোটা লাইব্রেরীটি নীচে নিয়ে যায় বলো? তারপর শরীর ওঁর ক্রমেই ভেঙে পড়তে লাগলো, শহরে দুধ নেই, রুটি নেই, মাখন তো নেইই, শুধু কাশা* এক মুঠো আধ-মুঠো পাওয়া যায়, নুন দিয়ে কাশা সেদ্ধ খেয়ে আমরা নাহয় কাটিয়ে

* বার্লি-জাতীয় শস্য।

দিলাম কোনোরকমে। রুগীর জন্যে দুটো পোড়ার আনাজও কি পাওয়া যায় !

যাই হোক, তবুও একরকম করে দিন কাটছিল। তারপর শুরু হলো রাতে কামানের গোলা। জার্মানরা সন্ধ্যের সময়ে ফেরবার মুখে আগুনে বোমা ছড়িয়ে যেতো। তারপর জ্বলন্ত শহরের আগুন লক্ষ্য করে কাছের ঘাঁটি থেকে কামান দাগতে শুরু করলে। কামানের গোলা কখনো কখনো নীচের রাস্তায় পড়ে মানুষ মারে বটে, কিন্তু তার প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে বাড়ীর ওপরতলাগুলো। সে এক কুৎসিত ব্যাপার। দিনে বোমা রাতে কামান। আর সঙ্গে সঙ্গে শহর জ্বলছে। সে কী জ্বলুনি ! ও-পে-এল্‌ এর লোকেরা আর তা নেবাতে পারে না। দুদিন পরে জলও বন্ধ হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস আর ইলেক্‌ট্রিক্‌। দিনের বেলায় কোনোরকম করে ওকে নিয়ে নীচে যাই কিন্তু রাত্তিরে এক হাতে মোমবাতী ধরে ওঁকে নিয়ে নামা-ওঠা সে কি সহজ কথা! শেষকালে উনিও বেঁকে বসলেন, বলেন, যা হয় হবে, নীচে আর নামতে পারবেন না। বোমার আওয়াজে আর ভেবে ভেবে ওর ব্লাড-প্রেসার ভয়ানক বেড়ে গেছে। তাই আমিও জেদ করলাম না, কিন্তু ওরকম করে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে তো থাকতে পারি না। তাই নীচের তলায় একখানা ফ্ল্যাট খুঁজতে আরম্ভ করলাম।

শহরের বাড়ীই প্রায় আধাআধি শেষ হয়ে এসেছে, তার ওপর পশ্চিম থেকে জার্মানরা যাদের তাড়িয়ে দিয়েছে, তারা এসেছে হাজারে হাজারে। ঘরে ঘরে বসবার দঁড়াবার জায়গা নেই। শেষকালে মনে পড়লো আন্তেল্‌কা-মাসীর ফ্ল্যাট একতলায়! হিরেণের "নাস্তি" যেন কানে-কানে বলে দিলে। চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে ওঁকে নিয়ে সেইখানেই হাজির হলাম। মাসিমার ঐ তিনখানি ঘর, ওঁর নিজের

অতবড় সংসার, তার ওপর ওঁর শ্বশুরবাড়ীর কারা এসে আশ্রয় নিয়েছে। সেইখানেই আমরাও গিয়ে মাথা গুঁজলাম। ওঁর লাইব্রেরী ফেলে কিছুতেই যাবেন না। অনেক ভুলিয়ে ভালিয়ে রাজী করলাম। তখন সেপ্টেম্বরেব শেষাশেষি, শহর ঘিরে যুদ্ধ চলেছে, সে-সব কথা আর একদিন শুনো এখন।

মাসীব বাড়ীতেও কি রক্ষে আছে! চারিদিকে যেন আগুনের বেড়া। একদিন বাড়ীটার ওদিককাব মহলে বোমা পড়লো। সে কী ভীষণ আওয়াজ! তবে উনি তখন আর আওয়াজ-টাওয়াজেব পরোয়া করেন না, যেন কেমন হয়ে গেছেন। তারপব রাত্তিরে একদিন একটু শুয়েছি, এমন সময়ে কামানের গোলা। সামনেব বাড়ীটার আধখানা উড়িয়ে নিয়ে গেল। মনে হলো যেন আমাদের বাড়ীতেই পড়েছে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বাতী জ্বেলে ছুটে ওঁব কাছে গিয়ে দেখি উনি বিছানার ওপর উঠে বসেছেন। আমায় যেন কী বলছেন। ঠোঁট নড়ছে কিন্তু কথা বেরুচ্ছে না। আওয়াজে হঠাৎ শক্‌ লেগে ঐরকম হয়ে গেছেন। আমি ওঁর কথা বুঝতে পারছি না দেখে ওঁর সে কী রাগ! শেষকালে ধড়মড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে আমার পায়ের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। এতক্ষণ পরে লক্ষ্য করলাম, আমার পায়ের গাঁটের কাছটা কেটে গেছে, আর হু হু করে সে কী রক্ত! আওয়াজে মাসীব ঘরের বড় আয়নাখানা ভেঙে গিয়ে তার টুকরো কখন যে পায়ে লেগেছিল তা বুঝতেও পারি নি।

তার দিন দুই পরেই যুদ্ধ থেমে গেল।

অর্থাৎ এখানে থামলো বটে, কিন্তু সত্যিকার যুদ্ধ শুরু হলো, কী বল্‌? হ্যাঁরে, তোরা কিছু শুনিস্‌ নি পথে আসতে আসতে, ইংরেজ আর ফরাসীরা নাকি ওদের মেরে তুলো ধুনে দিচ্ছে?

তারপর ওঁকে নিয়ে তো বাড়ী ফিরলাম। আমাদের ফ্ল্যাট্টার কিছু হয় নি অবিশ্যি, কিন্তু ওদিককার ফ্ল্যাটটার চেহারা দেখেছিস্? ওদের আর কেউ বেঁচে নেই। একবার ওঁর জন্যে এক গেলাস দুধ ধার করেছিলাম, এখন কাকে যে তা ফেরত দিই তার ঠিক নেই। ওমা, হিরণ এমন ঠকাতেও পারে! ওয়াফ্ল্গুলোর একটাতেও হাত দেয় নি। নে, খা ভাই। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, এখানে এসে ওঁর লাইব্রেরী ফিরে পেয়ে ওঁর শকের ভাবটা দিব্যি কেটে গেল, এমন কি আস্তে আস্তে ভালোও হয়ে উঠতে লাগলেন। ওঁর ও-অবস্থা কী করে হলো, সে আর এক ব্যাপার।

চতুর্থ কাপ হের্বাতুম্ ঢেলে দিয়ে দিদি আবার বলতে থাকেন :

…ভার্শাভা আত্মসমর্পণ করলে। তারপর শহরের যে কী ভীষণ চেহারা, তোরা ভাবতেও পারিস্ না। এখন তো কিছুই নেই। তখন শহরের একটি রাস্তাও ইটের গাদার তলা থেকে খুঁড়ে বার করা হয় নি, আর চারদিকে কেবল মরা মানুষ আর মরা ঘোড়া। এখন আর কী দেখছিস, তার তুলনায় এ কিছুই নয়। এখন মনে হয় যেন যুদ্ধ হয়ই নি। যাই হোক শহরে জল, আলো, খাবার কিচ্ছু নেই। তাছাড়া রাস্তায় বেরলেই মড়া ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে দু-চার গজ এগুনো যায় তার পরই চার-তলার সমান ভাঙা বাড়ীর ইট-পাটকেল, কত মানুষ যে চলতে চলতে তার ভেতর হঠাৎ পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারে নি তার ঠিক নেই। সে-সব দেখবি এখন আজই। যাই হোক, ঘরে কিছু খাবার ছিল তাতেই

চলছিল কোনরকম করে, উনিও আস্তে আস্তে সেরে উঠেছিলেন। তারপর এই মাসেরই গোড়ার দিকে, অর্থাৎ ভারশাভা আত্মসমর্পণ করবার দিন তিন-চার পরেই শহরময় কিসের কানাঘুষো চলতে লাগলো, যেন যুদ্ধের চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু একবারে শহরের কাছে এসে পড়েছে, মহামারীর চেয়েও ভয়ঙ্কর। সেদিন ঘরে বসে আমি একটু গোছগাছ করছিলাম, উনি শুয়ে শুয়ে ওঁর প্রিয় কবি মিৎস্‌ক্যেভিচ্‌ পড়ছেন, এমন সময়ে দরজার ওপর যেন হঠাৎ বাজ পড়লো। কড়া গাট্টার আওয়াজ, দোরখানা বুঝি ভেঙেই পড়ে। তাড়াতাড়ি দোর খুলে দিতেই দেখলাম সামনে কতকগুলো জার্মান সৈনিক, জিজ্ঞেস করলে, কে থাকে এখানে? —যুদ্ধের পর বাড়ী বাড়ী তল্লাস চলেছে, তাই ভাবলাম ওরা এইবার ঘরে ঢুকে সব তছ্‌নছ্‌ করে দিয়ে হাতের কাছে যা পাবে তাই নিয়ে চলে যাবে। তাই বেশ একটু মোলায়েম সুরে বললাম, অবশ্য ভেতরে ভেতরে ইচ্ছে হচ্ছিল সব কটার মুখে নুড়ো জ্বেলে দিই, বললাম, আসুন না ভেতরে। উত্তরে তারা হিড়ির-বিড়ির করে কী বললে তা কি ছাই বুঝতে পারি! হাত নাড়া আর চোখ ঘোরানোর ভঙ্গি দেখে মনে হলো, ওরা যেন মক্ষম চটে গেছে। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, এখন করি কী, এমন সময়ে একজন হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে ওঁর হাতটা ধরে এক হেঁচকা মেরে বিছানা থেকে তুলে দিলে। মনে হলো, ওঁর হাতখানা যেন ওরা ছিঁড়ে নিলে। ঐ রুগ্ন চেহারা, বেটাদের কি একটু মায়াদয়াও নেই গা? ওঁকে ওরা ড্রেসিং গাউনটা গায়ে ফেলে পায়ে চটিটাও গলিয়ে নিতে দিলে না। ঐ অবস্থায় ওরা ওঁকে গুঁতো মারতে মারতে ঠেলে নিয়ে চললো। দেখলাম, রাগে, দুঃখে, অপমানে ওঁর সর্বশরীর থরথর করে কাঁপছে। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে, যেন কেমন হয়ে গেছি। এমন সময়ে

হঠাৎ খেয়াল হলো, ওরা ওঁকে নিয়ে গেল যে! তাড়াতাড়ি ওদের পেছু পেছু চলতে লাগলাম। শুধু আমাদের ফ্ল্যাট নয় রাস্তার ধারের সবকখানা ফ্ল্যাট থেকেই ওরা সবাইকে টেনে বের করে দালানে সান্ত্রী খাড়া করে দিয়ে নীচে নিয়ে চললো। ওদিককার সোজা সিঁড়িটা ভেঙে গেছে দেখেছিস্ তো? তাই ওরা আমাদের ঐ পেছনদিককার সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে চললো। ঐ রকম উঁচু উঁচু ধাপ, ওঁর হার্ট্ তখন কীরকম দুর্বল তা তো বুঝতেই পারছিস্। আর ওরা ওঁকে গুঁতো মারতে মারতে ঐ সিঁড়িটা দিয়ে নীচে নিয়ে চললো। উনি আমার দিকে চেয়ে কী যেন বলতে গেলেন, কিন্তু ওরা ওঁকে এমন ধমক দিয়ে উঠলো যে, মনে হলো হয়তো ঐখানেই উনি পড়ে যাবেন। তারপর লক্ষ্য করলাম, ওঁর ঠোঁট নড়ছে, কিন্তু মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরচ্ছে না। আমি ইশারায় ওঁকে শান্ত হতে বলে ওঁর পাশে পাশে চলতে লাগলাম। ওর হাতখানা ধরে যে ঐ উঁচু উঁচু ধাপগুলো নামতে একটু সাহায্য করবো তারও কি উপায় আছে? নীচে নিয়ে গিয়ে ওরা আমাদের সবাইকে উঠোন ছাড়িয়ে সেই একেবারে ভেতরদিককার একখানা ঘরে পুরে সান্ত্রী খাড়া করে দিলে। শুধু আমরা কী? এই এত বড় বাড়ীখানার সামনের দিকের পাঁচখানা তলার সবগুলো ফ্ল্যাট থেকে ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, রুগ্ন, অসুস্থ, আহত সবাইকে টানতে টানতে নামিয়ে নিয়ে এসে ঐ ঘরখানায় পুরে রাখলে। তারপর ছ-টি ঘণ্টা ধরে সে কী অসহ্য যন্ত্রণা! একটু বসবার জায়গা নেই, ভালো করে দাঁড়াতেও পারা যায় না। উঁনি সেই ছ-টি ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে, আমার কাঁধ ধরে। কখনো কখনো কী যেন বলতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরলেও ওঁর আর একটা কথাও বোঝা যাচ্ছে না। বুঝতে পারছি ওঁর কিসের ভয়। যুদ্ধের পরে উনি প্রায়ই বলতেন, ওঁকে ওরা নিয়ে গিয়ে হয়তো

নানা নোংরা কাজ করিয়ে নেবে, মেথরগিরি বা ঐরকম কিছু। গেল যুদ্ধের সময়ে জার্মানরা ঐসব করাতো কিনা, সেগুলো মনে আছে। যাই হোক, ছ-ঘণ্টা যে কীভাবে কাটলো তা তোদের বলে বোঝাতে পারবো না। সারাদিন খাওয়া নেই, আর ঐ রকম আতঙ্ক, ওরা কী করবে তা কে জানে? সন্ধ্যের দিকে হঠাৎ সান্ত্রীরা চেঁচিয়ে হুকুম দিলে যে-যার ঘরে ফিরে যাও। আবার ওঁকে ধরে ধরে কোনরকমে ওপরে নিয়ে গেলাম। কিন্তু যে-মানুষ ঘর থেকে বেরিয়েছিল সে-মানুষ আর ফিরলো না। শক্‌ লেগে মগজের কাজ ঠিক হচ্ছে না, তাই কথা পড়ে গেছে। সত্যি ভাই, এক-এক সময়ে ভাবি, এই অসহ্য কষ্ট সহ্য করবার জন্যেই কি উনি বেঁচে রইলেন?

যাই হোক, পরে শুনলাম, ভার্‌শাভাকে ঠিকমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে কিনা দেখবার জন্যেই হিট্‌লার নিজে এখানে বেড়াতে এসেছিল। তাই রাস্তার ধারের সব ফ্ল্যাটগুলো খালি করে দিয়েছিল ওরা, পাছে কেউ জানালা থেকে কিছু ছুঁড়ে টুঁড়ে দেয়।

দিদির স্বামী এতক্ষণ অর্থহীন দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। একটু পরে জড়ানো কথায় বললেন—কী মুস্কিল, একটা গ্রীক্‌ কন্‌জুগেশন্‌ কিছুতেই মনে করতে পারছি নে!

দিদির গল্প আর ওঁর স্বামীর ঐ অবস্থা আমাকে ভেতরে ভেতরে অস্থির করে তুলছিল। তাই একটু দিবানিদ্রা দিয়ে বিধ্বস্ত ভারশৌয়ের প্রতিচ্ছবিগুলোর সঙ্গে মনকে খাপ খাইয়ে নিয়ে সুস্থ হয়ে দৈনন্দিন

জীবন-সংগ্রামে প্রস্তুত হবার জন্যে নিজের আ-স্রা-মায় ফেরাই সমীচীন বোধ হলো। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—দিদি, এবার তোমার বোনটিকে ফিরে পেলে তো ?

আর হিরণকে পাইনি বুঝি ? শোন্, তুই যে বড় অমন ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালি ! কারুর সঙ্গে রান্দেভু আছে নাকি ?

এই এতক্ষণ তেত্-আ-তেত্-এর পরে কি আর কারো সঙ্গে রান্দেভু ভালো লাগবে ? ভাবছিলাম একবার নিজের আস্তানাটা ঘুরে আসি, কোনোখানে রাত কাটাতে হবে তো ?

তোর আবার আস্তানা কোথায় ?

মানে ? ! গেছে নাকি ?—সন্ত্রস্তভাবে জিজ্ঞেস করি।

বাড়ীটা আছে কি গেছে জানি না, তোর বাসা আমি কিছুদিন আগেই ভেঙে দিয়েছি। তোমার ঐ আ-স্রা-মাটি ভাঙবার সময়ে এমন এমন সব ডকুমেণ্ট্ পাওয়া গেছে যা হালীনাকে দেখালে ও আর তোমার মুখদর্শন করবে কি না সন্দেহ। যাই হোক ভয় নেই, সে-সব তোমার ডকুমেণ্ট-কেসে চাবি-বন্ধ করা আছে। এখন কথা হচ্ছে এই যে, তোমার শখের আ-স্রা-মাটির ঠিকানা বদল হয়েছে, সুতরাং বরং একবার বেরিয়ে তোমার শিষ্যাদের নতুন ঠিকানাটা দিয়ে এসো।—দিদি হেসে উত্তর দেন।

ঠিকানা বদল করবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল নাকি ? অতগুলো শিষ্যা-সেবিকা হাত-ছাড়া না হয়ে যায়।

ঠিকানা বদল করবার দরকার ছিল বৈকি। হিরণ তুই একেবারে ছেলেমানুষ, নিজের ভালো-মন্দ বুঝিস্ না। যুদ্ধ থেমে গেলেই যে জার্মানরা তোর পুরোনো ঠিকানায় সটান এসে হাজির হতো, এর মধ্যেই হাজির হয়েছে কিনা কে জানে ? তোর এখনো অনেকদিন

ওদিক মাড়ানো চলবে না। তাছাড়া জিনিষগুলো ওখান থেকে সরিয়ে না আনলে যুদ্ধের পরই যখন হুহু করে অন্য শহর থেকে ভবঘুরের দল এসে শহরে ঢুকলো, তারা কি আর কিছু রাখতো? এর মধ্যেই একজনরা ওখানে এসে বাসা বেঁধেছিল, তবে কিছু সরায় নি, ভদ্র পরিবার।

আমার আ-স্রা-মায় ঢুকলো কি করে? বেচারাদের অবস্থা দেখে তুমি ওদের ওখানে স্থিতু করে দিয়েছিলে বুঝি?

না রে না, তোর আ-স্রা-মার অবমাননা আমি প্রাণ থাকতেও করতাম না। শহরের ওপর যখন খুব বোমা পড়ছে তখন একদিন তোর ওখানে গিয়ে দেখি ফ্ল্যাটটি কারা দখল করে বসেছে। ভাবলাম, বুঝি তোরই শিষ্য-সেবকরা আ-স্রা-মার দেখাশুনো করছে। জিজ্ঞেস করি, আপনারা কোত্থেকে? ভদ্রলোক হাত জোড় করে বললেন, আমরা নিরাশ্রয়, এই শহরে এসে পড়েছি। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ এইবাড়ীটার দরজা খোলা পেয়ে এখানেই আশ্রয় নিয়েছি, অতগুলো এণ্ডাবাচ্ছা কোথায় যাই বলুন। বলেন তো, আজই আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি।— শুনলাম, পাশের ফ্ল্যাটে বোমা পড়াতে তোর দরজার তালা ভেঙে হাট হয়ে খুলে গিয়েছিল, তাই বেচারারা বাড়ী খোলা পেয়ে ভেতরে ঢুকেছিল।

তুমি অবশ্য বললে, বেশ তো থাকুন না। আর এই ভাঁড়ার-ঘরের চাবি, আর এই কয়লা ঘরের চাবি, যত খুশী খরচ করুন, হিরণ তো ফিরবে না।

ওমা, তাই বৈকি! আমি বললাম, বেশ থাকুন, তবে বাড়ীওলার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে, আমি কালই এসে জিনিষপত্র সরিয়ে নিয়ে যাবো। মানে, কী জানিস্‌, তোর একজোড়া জুতো, সেই ফার-দেওয়া, আর রোমের আস্ত্রাহান্‌ টুপীটা, দেখি, নেই। ওরা অবশ্য নেয় নি বলেই মনে

হয়। যাইহোক, ভাবলাম, তুই ফিরে এসে আমার ওপর রেগে কাঁই হয়ে যাবি, তার চেয়ে বরং মানে মানে জিনিষপত্তরগুলো সরিয়ে ফেলাই ভালো।

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করি—কিন্তু শহরের ঐ অবস্থায় আমার ঐ দু-হাজার বই, খাট-বিছানা, দিভান্, আসবাব্, খাবার, কয়লা সরালে কী করে, আর সরিয়েই বা নিয়ে গেলে কোথায়? এখানে তো দেখতে পাচ্ছি না!

দিদি বলেন—নিয়ে যাবার জায়গা অবশ্য আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। অর্থাৎ আমার এক বান্ধবীর একটি লুকোনো ঘর ছিল, তোর বাড়ীর কাছেই, পাচতলার ওপর ছোট্ট একটি কুটুরী। সেখানে সে ছবি আঁকতো, মানে, তাকে ঠিক স্তুদিও বলা যায় না, সেখানে সে বাড়ীর ঝামেলা থেকে প্রায়ই পালিয়ে এসে ছবি আঁকতো এই যা। সে শহর ছেড়ে চলে যাবার সময়ে ঘরখানা আমার জিম্মেয় দিয়ে গেল। ঘরখানা হাতে পেয়েই প্রথমে মনে পড়লো, তুই ফিরলে ঐখানেই তোকে লুকিয়ে রাখবো। সেখানে তোর বইগুলো আর তোর ঐ ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্মের মতন প্রকাণ্ড টেবিলটা, আর কিছু কিছু খুচরো জিনিষ ভরে রেখেছি। বাদবাকী সব মাসীর বাড়ী। খাবারগুলো এইখানেই রেখেছি, আর কয়লা মামৃস্তার কয়লার ঘরে।

কিন্তু সরালে কী করে?

সে আর বলো না। সে কথা ভাবলে গায়ে জ্বর আসে। এমনিতেই রাস্তায় বেরুনো যায় না, তার ওপর বাড়ীবদল করা! অনেক খুঁজে খুঁজে একখানা ঠেলাগাড়ী তো মিললো, কিন্তু তার আব্দার শোনো, আগে গোটা দশেক জ্লতীতেই মান্ষে খুশী হয়ে বাড়ী বদল করে দিত। সে ব্যাটা বলে, টাকা চাই না, চাই পাঁচ সের ময়দা আর তোর ঐ

ওভারকোটটা যেটা আনলায় টাঙানো ছিল। পাঁচ সের ময়দা কি মুখের কথা? কিন্তু করি কী, তাতেই রাজী। কিন্তু তোর সেই মোটা ওভারকোটটার দিকে আঙুল দেখিয়ে যখন বললে ওটাও চাই তখন ভাবলাম তার গালে ঠাস্‌ করে একটা চড় মারি। যাই হোক শেষ পর্যন্ত ওভারকোটও দিতে হলো, তবে তোরটা নয়, ওঁর একটা 'ওভারকোট দিয়ে রফা করলাম। বইগুলো আর টেবিলটা তো সরানো গেল। তাই বা পারা সহজ নাকি? তোদের ওপাড়ায় এত মানুষ হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে যে একখানা ঠেলাগাড়ী যাবার পথ নেই। তার ওপর যেরকম সরু সরু গলি! বলবো কী, দু-একটা মড়াকে টেনে সরিয়েও দিতে হলো। মুস্কিল হলো, বাদবাকী আস্‌বাব্‌, কয়লা আর খাবার নিয়ে। এক টন্‌ কয়লা, জ্বালানী কাঠ, ব্যাটাকে একা ছেড়ে দিই কী করে? কোথায় সরে পড়বে তার ঠিক কী? কাজেই দুবার দুবার গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে এই চার-পাঁচ কিলোমেত্র্‌ পথ।

জার্মানরা তোমার হিরণের বাড়ীবদল করার খবর পেয়ে সেদিন আর বোমা ফেললে না বুঝি?

হ্যাঁ তাই বটে। ঐ ক-ক্রোশ যেতে আসতে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত পথে কাটলো। হিরাণ্যে *, সে কী কাণ্ড, যদি চোখে দেখতিস্‌, তাহলে বুঝতে পারতিস্‌, ঝাবা † তোকে খুব ভালো না বাসলে ও-অবস্থায় তোর জিনিষপত্তর নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে পারতো না।

তা চোখে না দেখলে বুঝি জানতে পারতাম না। ভাগ্যিস জানিয়ে দিলে।

ভগবানই জানেন। তোর মতন অমন উড়ো মনিষ্যি প্রায় সারা

* সম্বোধন কারক।

† দিদির ডাক নাম। তার ভালো নাম য়াদ্‌ভীগা।

ইওরোপ ঘুরে আমাদের এখানেই আটকা পড়লি কী করে, আশ্চর্য! তারপর শোন্‌ না, যা বলছিলাম। এক ক্লেপ তো কোনো রকমে রেখে আসা গেল। তার পর আস্‌বাব্‌। বাপ্‌, কী জিনিষটাই জড়ো করেছিলি, একখানা ঠেলাগাড়ীর ওপর পর্বত-প্রমাণ আস্‌বাব্‌! লোকটা বলে, একজনের পক্ষে অত জিনিষ ঠেলা সম্ভব নয়। মানে, আরো কিছু উপরী পাওয়নার চেষ্টা আর কী! ময়দা, চাল, চিনি, কাশার ঠোঙা চোখে পড়েছে কিনা! আমি তো তাড়াতাড়ি সবগুলো ঠোঙা তোর ঐ উক্রাইনী কার্পেটটায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধলাম। মণ দেড়েকের একটি মোট, তাকে এখন রাখি কোথায়? ওদিকে লোকটা বেঁকে বসেছে, বলে একলা ঠেলতে পারবে না। ভাবছি, করি কী! আবার প্রার্থনা করি, হে পরম "নাস্তি," হিরণের এই খাবারগুলো বাঁচিয়ে দাও বাবা। বলতে বলতে দেখি একজন চলেছে সাইকেলে করে, একটি ছাত্র, আমায় জিজ্ঞেস করলে—প্রশেঁ পানী, আপনি একলা এই কাজ করছেন! বলেন তো আমার দ্বারা যদি কিছু সাহায্য হয় তো করতে পারি।—ছাত্রটির মাথায় সত্যই ভারি বুদ্ধি, সে করলে কী, ঠেলাগাড়ীর পাশে সাইকেলখানা বেঁধে দিলে, আর তার ওপর চাপালে ঐ দেড়মণ খাবারের মোট। বলে আপনি সাইকেলখানার হ্যাণ্ডেল ধরে ধরে চলুন, আর আমি ওর সঙ্গে গাড়ী ঠেলতে ঠেলতে চলি। তারপর পথে সে কী বোমা পড়ার সৃষ্টি! দু-পা করে যাই, আর ছুটে যেখানে পারি মাথা গুঁজি। তারপর যাবি তো যা, খানিক দূর গিয়ে গাঁট্‌রী খুলে এক ঠোঙা চিনি পড়ে গেল রাস্তায়। বেশী ছিল না, সের দুই। ঠোঙাটা ছেঁড়ে নি। ছাত্রটি তা কুড়িয়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চললো। তা ভাই আমি আর তার হাত থেকে তা ফিরিয়ে নিই নি। কিছুতেই নেবে না। শেষকালে যখন শুনলে তা পান্‌ প্রফেসর ঘোষালের চিনি তখন আর আপত্তি করলে না।

বলি—ধন্যি মেয়ে যা হোক। এখন হিরণকে যে আশ্রম-ছাড়া করলে, তার আজ রাত কাটাবার কী ব্যবস্থা হবে বলো তো ?

আজ অবশ্য এখানেই। তবে পরে অন্য জায়গায় ব্যবস্থা করতে হবে। নীচের দারোয়ান ব্যাটার একটা ভাই আছে, ওটাকে ভাই বিশ্বাস হয় না। আমার মনে হয়, ও-ব্যাটা গেয়েন্দা। কদিন ধরে দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং আজকের জন্যে ভাবনা নেই, তবে সে ফিরলে তোকে অন্য জায়গায় সরাতেই হবে। নাহলে এখানেই তো দিব্যি থাকতে পারতিস্‌, এমনকি শিষ্যা-সেবিকা-পরিবৃত্ত হয়ে। বেচারী হিরণ, ওদের দেখবার জন্যে ওর প্রাণটা ধড়ফড় করছে, আর আমরা ওকে আটকে রেখেছি ! তা যা না, একটু ঘুরে আয় না ভাই, তোকে দেখে তাদেরও প্রাণটা ঠাণ্ডা হোক, কি বলিস্‌ হালকো ?

হাল্‌কা বা হালীনা নামধারিণী ব্যক্তিটি তখন টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমারও চোখ আর বাধা মানে না। বললাম, দিদি, আমার চোখ-দুটো নিয়ে কী করি বলো তো, আর যে খুলে রাখা যাচ্ছে না।

দিদি বলেন—ওমা, আমার আক্কেল দেখো ! গালেচ্‌কা-টা* ঘুমে নেতিয়ে পড়েছে, ছোট্ট বোনটি। হ্যাঁরে, তোদের পথে খুব কষ্ট হয়েছিল বুঝি ? তা শোন্‌, তুই ঐ দিককার দিভান্‌টায় সটান হয়ে শুয়ে পড়্‌।

দিদির সঙ্কেতমাত্রেই আমি উক্ত দিভানের আশ্রয় গ্রহণ করলাম। বারান্দার জানলা দিয়ে সামনের একখানা বাড়ীর আধা-আধি কেটে-নেওয়া চেহারা চোখে পড়ে। পাঁচতলার ঐ ঘরখানার আধখানা হয়তো কোনো শিকার-বিলাসীর। দেওয়ালের ওপর চারিদিকে হরিণের মাথা, দুটো অবশিষ্ট কোণে বড় বড় দুটো কাঠের আলমারীর ভেতর নানা

* হালীনা নামের অত্যাদর-সংস্করণ।

রঙের মরা পাখী, মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড সেক্রেটেরিয়েট্ টেবিলের আধখানা শূন্যে ঝুলছে, দেওয়ালের একপাশে প্রকাণ্ড পিয়ানোফর্ত্। ঐ ভাঙা ঘরখানায় আটকে পড়লে কী করে নামা যেতো সেই সমস্যাই বারে বারে মনে এক স্নায়বিক উদ্বেগের সৃষ্টি করতে লাগলো। চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয় যেন সামনের ঐ ঘরখানা থেকে টেবিলটা শুদ্ধ হুড়মুড় করে নীচে পড়ে গেলাম। দু-একবার চমকে উঠতেই অনুভব করলাম, দুখানি স্নেহপ্রবণ হাত আমার গায়ে একখানা নরম কম্বল চাপা দিয়ে কাঁধ আর পায়ের কাছে গুঁজে দিয়ে গেল।

চোখ মেলে দেখলাম ঘরে আলো জ্বলছে। হানা শহরের মাঝে প্রাক্-সামরিক যুগের একটি বাস-গৃহের নিতান্ত সাধারণ, আশ্রয়-ভরা আবহ হটাৎ-জেগে-ওঠা মন কেমন বিশ্বাস করতে চায় না। আমার মুখের বিমূঢ় প্রকাশভঙ্গি লক্ষ্য করে দিদি বললেন—হায় হায়, হিরণের আর আজ বেরুনো হলো না, সাতটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে!

বলো কী! আমি কি আট ঘণ্টা ঘুমিয়েছি নাকি!

তা নয় তো কী? হালীনাও প্রায় তাই। কে এসেছে দেখছিস্?

ভালো করে চোখ চেয়ে দেখলাম, টেবিলের আধো-অন্ধকার কোণটায় বসে মামুস্যা আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। বললেন—ওঠ্, হের্বাতুম্ ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

এইবার ওঁদের তিনজনের পারিবারিক কুসংস্কার চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে যে আমায় দ্বিতীয়বার দস্তুরমত ঔদরিক কসরৎ করতে হবে সেজন্যে আগে থেকেই মনে মনে তৈরী হয়ে নিতে হলো। কারণ ঘরের আব্‌হাওয়ায় টাটকা কেক তৈরী করার একটি লালসাকর গন্ধ, যা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, মামুস্যা আমার ঘুমের অবসরটুকুকে তাড়াতাড়ি কাজে লাগিয়েছেন। দুর্দিনকে একটি পরম উপভোগ্য

সুদিনে পরিণত করতে ওঁদের তুলনা মেলে না। সেদিনকার সাপাবে বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্য না থাকলেও ছিল প্রাচুর্য এবং ওঁদের একটি স্বকীয় আন্তরিকতার পরিতৃপ্তি। চায়ের রঙ-করা পোড়া চিনি গোলা গরম জল ঢালতে ঢালতে মামুস্যা হেসে জিজ্ঞেস করলেন—কিসের মাংস খেলি, বুঝতে পারলি ?

কেন বলুন তো, আশা করি মানুষের নয়।

দুর পাগল। ঘোড়ার মাংস। তাও কি পাওয়া যায়? তোরা ফিরেছিস্ শুনে আমি তখুনই ছুটলাম মাংস কিনতে। সারাটি শহর খুঁজে সেই ইহুদী পাড়ায় খানিকটে ঘোড়ার মাংস পাওয়া গেল। শুনে বিঘ্ন হচ্ছে না তো ?

ওসব কুসংস্কার আমার নেই মামুস্য্য, তাছাড়া প্রাচীন কালে আমাদের দেশের ক্ষত্রিয়েরা ও-মাংস পরিতৃপ্তি সহকারে ভক্ষণ করতো।

যাক্, তবু ভালো, ভাবছিলাম তোর ধর্মে বাধে এমন মাংস অজান্তে খাইয়ে হয়তো পাপের ভাগী হলাম। তোদের আবার খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে যেরকম বাচ-বিচার !

আমাদের দেশে প্রচুর খাবার, তাই সেখানকার মানুষে বাচ-বিচার করতে পারে। আবার ঐ দেশেতেই যদি এইরকম একটা ঝড় বয়ে যায় তাহলে তারাও ও-বিলাসটুকু বর্জন করতে বাধ্য হবে। আপনারা কি যুদ্ধের আগে ঘোড়ার মাংস খেতেন ?

আরে রামঃ, ও কি খাওয়া যায় ! আর ঐ মাংসেরই এতটুকু পাবার জন্যে আমরা গো-ভাগাড়ে শকুনের মত একা-একটা যুদ্ধে-মরা ঘোড়ার ওপর গিয়ে পড়েছি ! এখনো কত লোকে কত বাসি মরা ঘোড়ার মাংস কেটে এনে তবে ছেলেপুলেকে খেতে দিতে পারছে। তাই রোগও বাড়ছে হুহু করে। তার ওপর শহরে আর হাঁস্পাতাল নেই বললেই হয়।

বলেন কী, অতগুলো হাঁসপাতাল, তার একটাও নেই!

দুটো-একটা কোনোরকমে কাজ চালাচ্ছে, তাও জার্মানদের জন্যে, বাদবাকী ওরা ভেঙে চুরে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে।

কেন, রেড ক্রসের নিশেন ছিল না?

ছিল বলেই তো ওরা টিপ করবার সুবিধে পেয়েছিল।

আচ্ছা, মামুস্ত্য, আপনি তো ছিলেন, বলুন তো হাঁসপাতালে সৈন্য লুকিয়ে রেখে কামুফ্লাঝ্‌ করা হয়েছিল কিনা।

মামুস্ত্যা যেন একটু মর্মাহত হয়ে উত্তর দেন—তোর ওকথা জিজ্ঞেস করাই ভুল বাবা। প্রথমতঃ, ওরকম গর্হিত কাজকে আমরা কামুফ্লাঝ্‌ বলি না, ও ডাহা জুচ্চুরী। ওসব কাজ করা আমাদের কুষ্টিতে লেখে না। এই দেখ্‌ না ভেবে একটা সামান্য কথা। জার্মানরা যে প্রথমেই আমাদের শহরে শহরে গাঁয়ে গাঁয়ে বোমা ফেলে নিরীহ বে-সামরিক মানুষগুলোকে মেরে গেল তার জবাবে কি আমরা ওদের দেশে একখানা উড়ো জাহাজও পাঠিয়েছি? দ্বিতীয়তঃ, শহরে ওদের এত গুপ্তচর ছিল যারা অনবরত বেতারে ওদের খুঁটিনাটি সব খবর পাঠাচ্ছিল। তারা কি ঐ সামান্য খবরটুকু পাঠায় নি যে, আমাদের হাঁসপাতালে আহত সৈনিক ছাড়া এমন কি অসামরিক একজন রোগীকেও রাখা হয় নি? আর এ-যুদ্ধে আহত মানে একটা আঙুল কাটা বা খানিকটা ছড়ে যাওয়া সৈনিক নয়। যারা আহত তারা সত্যিই যাকে বলে hors de combat, এমন কি তারা যে কোনো দিন পাঁচ-সাত বছর পরেও আপন জীবিকার জন্যে কোনো কাজ করতে সমর্থ হবে তাও বিশ্বাস হয় না।

আপনি তো বরাবরই পিল্‌সুদ্‌স্কি হাঁসপাতালে ছিলেন, সেটা গেল কেমন করে?

সে অনেক কথা। একদিনে কত বলবো? তাছাড়া ঐ মানুষটা বিছানায় পড়ে আছে, ও-বেচারীর ঘুমের ব্যাঘাত হবে।

দিদি প্রতিবাদ করেন—না মামুস্যা কিছু হবে না। আমরা বরং মাঝখানের বড় আলোটা নিবিয়ে দিয়ে কোণের টেবিল-ল্যাম্প্‌টা জ্বেলে বসি চলো। হাঁসপাতালের গল্প বলবার আগে হিরণকে তোমার বাড়ীর ব্যাপারটা শোনাও।

হিরণ শুনেছে, আমার ফ্ল্যাটটা ভেঙে গেছে?

হ্যাঁ, তবে কী করে, তা শোনে নি।

···সে এক মজার কাণ্ড! হাঁসপাতালে অসম্ভব খাটুনিতে আমার শরীর ভেঙে পড়ে আর কী, বুড়ো হাড়ে কত সইবে বলো? ডাক্তাররা বলে, প্রশেঁ পানী, আপনি অন্ততঃ একদিনের ছুটী নিন। বাড়ীতে গিয়ে সারাটি দিন চব্বিশটি ঘণ্টা বিছানায় শুয়ে থাকুন, সঙ্গে খানিকটা ওষুধ দিচ্ছি, একটু দুধও না হয় পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবো, ব্যস্‌। অন্ততঃ একদিন জিরিয়ে নিলে তার পরের দিন আপনি আবার তাজা মন নিয়ে সুস্থ হয়ে কাজে লাগতে পারবেন। আমি বলি, হ্যাঁঃ, আমার আবার ছুটী চাই! ওসব হবে না ডাক্তারবাবু, আমি অতগুলো রুগী ফেলে বাড়ীতে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে থাকতে পারবো কেন? ছুটীফুটী সেই যুদ্ধের পরে।—সেইদিনই আমার বাড়ী গিয়ে বিছানায় আড় হয়ে পড়ে থাকবার কথা, আর আমি হাঁসপাতালময় ছুটোছুটী করে বেড়াচ্ছি। সন্ধ্যেবেলা সত্যিই আর শরীর বয় না। তাই ভাবলাম একটু অন্য আব্‌হাওয়ায় অন্ততঃ রাতটা কাটিয়ে এলে হয়তে পরের দিন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবো। দিনরাত্তির ঐসব আহত সৈনিকদের ভীষণ অবস্থা চোখের সামনে দেখে দেখে হয়তো মনটা একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে, বুড়ো হাড়ে আর কত সইবে গা? যাই হোক, বাড়ী তো

ওখান থেকে দু-পা, তাই সন্ধ্যেবেলা ছুটী নিয়ে বাড়ীর দিকে চললাম। ও য়েজ্‌্‌স্‌ মারীয়া! বাড়ীর সামনে গিয়ে দেখি পাশের ফ্ল্যাটটি নেই, আর আমার ফ্ল্যাটের প্রায় সবটাই গেছে, শুধ্‌ দালানের ড্রেসিং-টেব্‌ল্‌টা যেমন ছিল তেমনি আছে, বাদবাকী ইটের পাঁজা। শোবার ঘরের আস্‌বাবের মধ্যে আছে শুধ্‌ দেওয়াল-আয়নাখানার ফ্রেমটি। আর এদিককার দারোয়ানের ঘরের ওপর যে ফ্ল্যাটগুলো ছিল, তার একখানাও নেই, তবে আশ্চর্য, নীচের তলায় দারোয়ানের ঘরখানা যায়নি। আহা, বুড়ো মানুষ, কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে থাকতো, ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন ওদের। যাই হোক, দারোয়ানের কাছে শুনলাম, পড়্‌তো পড়্‌ বোমা কি ঠিক সেই দিনই পড়তে হয়, যেদিন আমার আরাম করে বিছানায় শুয়ে থাকবার কথা! শুনলাম, আমার পাশের ফ্ল্যাটটায় যে আর একটি আমার মতন বুড়ী থাকতো, সে বেচারী মারা গেছে। তার মরণও অদ্ভুত বাপু। একেই বলে নিয়তি। সাইরেন বাজবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর সবাই তো নীচে নেমে এসে মাটীর নীচে ভিতকামরায় ঢুকেছে। তখন আর সাইরেন বাজতে তর সয় না, সঙ্গে সঙ্গে বোমা। বুড়ী খানিক পরে বলে কী, ওমা, আমি যে আমার গলশ্‌-জোড়াটা ওপরে ফেলে এলুম গা, সামনে শীত আসচে, গেলে জুতোর উপর পরবো কী, বেতো মনিষ্যি বাবা, সান্নিপাতিক হয়ে মারা যাবো। বলে না বুড়ী ছুটলো ওপরে তিনতলায় তার গলশ্‌ আনতে। সবাই বারণ করে, বলে, যেওনা। কিন্তু কে শোনে কার কথা! বলে, আমি এই এলুম বলে, নতুন গলশ্‌-জোড়াটা গেলে আর কিনতে পারবো না। তারপর বুড়ীও ওপরে যাওয়া আর সঙ্গে সঙ্গে কড়্‌-কড়্‌—কড়াৎ করে বোমাও পড়া, একেবারে বেচারীরর ফ্ল্যাটের ওপর, যেন টিপ করে। অথচ ভিতকামরায় যারা ছিল তাদের গায়ে আঁচড়টি লাগেনি। একে ভবিতব্য ছাড়া আর কী বলবে বলো?…

মামুস্তার গল্প শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই খুব কাছেই পথে ঠাঁই করে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। নিঃশব্দ রাত্রির বুকে তার প্রতিধ্বনির বর্তুল, পরিবর্দ্ধমান বিস্তৃতি যেন আমাদের ঐ পাঁচতলার ঘরখানার ভেতরেও এসে পৌছলো। আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য করে মামুস্ত বললেন—আর একজন গেল।

কোনো বিদ্রোহী নাকি?

তাহলেও কথা ছিল। গেল একজন সাধারণ মানুষ। হয়তো খাবারের খোঁজে শহরের বাইরে গিয়েছিল, সময় মত ফিরতে পারে নি। গাঁয়ে ঘড়ী পাবে কোথায়? হয়তো ভেবেছিল একটু পা চালিয়ে চললেই বাড়ী পৌছে যাবে। সবারই তো একই অবস্থা। এই ধর্‌না, আমি যদি মাংসের খোঁজে আরো ঘণ্টা দুই কাটিয়ে দিতাম, তাহলে কি আর আজ বাড়ী ফিরতে পারতাম, পথেই কোনো ভাঙা বাড়ীর তলায় রাত কাটাতে হতো। কিন্তু প্রাণটা ধড়্‌ফড়্‌ করতো তো, ভাবতাম, আহা বাচ্চাগুলোর জন্যে মাংস কিনলাম, অথচ ওদের খাওয়াতে পারলাম না। তাই হয়তো কপাল ঠুকে আমিও বাড়ীর দিকেই ছুটতাম, যদি পৌছতে পারি। সবাই তাই ভাবে কিনা। সাতটার এক মিনিট পরে রাস্তায় বেরবার হুকুম নেই, মানলাম, কিন্তু মানুষটাকে কাছে গিয়ে গ্রেপ্তার করে তবে যদি তেমন তেমন বুঝিস্‌, গোয়েন্দা ফোয়েন্দা হয়, তো নাহয় গুলী করিস্‌। তা না, দূর থেকে মানুষের মতন কাউকে দেখলেই ওরা গুলী করছে। আবার বাহাদুরী কতো! তার পিঠে কাগজে লিখে দেওয়া হচ্ছে "সাতটা তিন মিনিটে পথে বেরিয়েছিল।" আজকের লোকটার সাহস আছে বলতে হবে, আটটা বেজে গেছে, এই সময়ে পথে, বে-আক্কেলে মনিষ্যি! কে জানে হয়তো বিদ্রোহী-টিদ্রোহীই হবে। হাজারে হাজারে মানুষ তলে তলে কাজ করছে তো। তবে অবিশ্যি

বিদ্রোহীরা রাত্তিরবেলায় পথে বেরুবে কেন? তারা দিনের বেলাতেই যা করছে তাতেই জার্মানরা অস্থির হয়ে উঠেছে।

দিদি বলেন—মামুস্যু,* হিরণকে কেবল গল্পই শোনাচ্ছো, আর ও যে হাত গুটিয়ে বসে আছে সে দিকে নজর আছে? আহা বেচারীরা এতদিন পরে ফিরলো, পথে কত কষ্টই না হয়েছে। ওদের যে বুক পুরে খেতে দেবো তার উপায় আছে কী?

মামুস্যা সায় দেন—ওমা, ঐ দেখেছো, আমার একেবারেই খেয়াল হয়নি, হাল্‌কা-টা ঘুমোলো নাকি? আর খানিকটা গরম হের্‌বাতুম্‌ করে দি।

সবার অলক্ষিতে দিদি ওকাজটি আগেই সেরে ফেলেছেন। ওয়াফ্‌ল্‌এর সঙ্গে গরম হের্‌বাতুম্‌ দিয়ে নিজেকে অন্যমনস্ক করতে চাই। কিন্তু বারে বারে বন্দুকের সেই একটি হিংস্র "ঠাঁই" শব্দ কানে বাজে। হয়তো একটি বাঁধা কোপি আর গোটাকয়েক আলু-ভরা থলে-শুদ্ধ লোকটা অন্ধকারে পথের ওপরেই উপুড় হয়ে পড়েছে, রক্ত-মাখা ফুটপাথ বেয়ে আলুগুলো গড়িয়ে চলেছে, চলেছে, চলেছে। আলুগুলো থামতে চায় না যে! আমারও আবার ঘুম এলো নাকি? হঠাৎ মামুস্যার গলার স্বর শুনতে পাই:

...তারপর শোনো না হাঁসপাতালের গল্প। গল্পই বটে। এই তো দিন কুড়ী-বাইশের কথা, অথচ মনে হয় যেন সবটাই স্বপ্ন। তোরা যখন শহর ছেড়ে চলে যাস্‌ তখনই তো কাজের চাপে নিঃশেষ ফেলবার অবকাশ পাইনে। তবু তখন বাড়ীতে এসে দুদণ্ড স্থির হয়ে বসতে পেতুম। জার্মানরা যখন শহরের কাছে এসে পড়লো, তখন আমার বাড়ী ফেরাও বন্ধ হয়ে গেল। শহরের চারদিকে তখন যে ভয়ানক মাথা-কাটাকাটি

* সম্বোধন কারক।

চলেছে! সারা দিন ধরে আম্বুলাঁস্‌ বোঝাই হয়ে আহত সৈনিক আসছে, দু-একজন করে জার্মানও আসছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে, আতুরের তো জাত নেই রে বাবা। ঐ প্রকাণ্ড পিল্‌হ্‌দ্‌স্কি হাঁসপাতাল, একটা গোটা শহর বললেই হয়, সেটাতে আর একখানা খালি খাট পড়ে নেই। শেষকালে মেঝের ওপরেই গড়ে গড়ে বিছানা পেতে তাদের শুইয়ে দিই। অপারেশন-থিয়েটার বলে তখন আর কিছু নেই, সমস্ত হাঁসপাতালটাই একটা অপারেশন-থিয়েটার হয়ে উঠেছে। সেসব বিবরণ দিলে তোরা আবার যেরকম ভয়তরাসে মনিষ্যি, রাতে ঘুমোতেই পারবি নে। যাই হোক, আমাদের হাঁসপাতালটা কী করে গেল তা শুনিস্‌ তো বলি।

…দিনটা কী তা ঠিক মনে নেই, যুদ্ধের শেষাশেষি আর কি। সকাল থেকে আর আকাশ দেখা যায় না। ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু। সেদিন সেই যে সাত সকালে একটিবার সাইরেন বাজলো, তারপর আর সন্ধ্যে পর্যন্ত আক্রমণ শেষ হবার আওয়াজ শোনা গেল না। সারাটি দিন শহরের ওপর হাজার কিলোর গুঁড়োনো বোমা, গুঁড়োনো বোমাই বটে, যার ওপর পড়ে তাকে যেন হামান্‌-দিস্তেয় কুটে দেয়। আমরা গত যুদ্ধের সময়ে বাপু বরাবর জানতুম, লাল্‌ ক্রুসের নিশেন উড়লে সাত খুন মাপ। এতদিন হাঁসপাতালের ওপর কিছু পড়েও নি। যে দু-একটা পড়েছিল তা মনে হয়েছিল, ভুল করে। সেদিন যেন ওরা লাল ক্রুসের নিশেন দেখে দেখে হাঁসপাতাল আর গির্জেয় বোমা ফেলতে লাগলো। আমরা খবর পেয়ে ভাবছি এইবার তাড়াতাড়ি ওপরতলার মানুষগুলোকে নীচে নামিয়ে নিয়ে আসবো। তিন-চার শ গজের এক-একটি তলা, আর ঐরকম আট-নটি তলা। সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে অতগুলো আতুর মনিষ্যিকে নামানো কি সোজা কথা! লিফ্‌ট্‌ তো মাত্র গোটা চারেক। তাছাড়া বেচারীদের মনের অবস্থা যেরকম হয়ে

রয়েছে, তাতে হঠাৎ ওপরতলা খালি করে নীচে নামাবার কথা শুনলেই অনেকে শকে মারা যাবে। ওদের যেরকম ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখতে হতো! অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করার পর আমাদের কাছে একটু মায়া-দয়া পেয়েই ওরা কেমন যেন ভারী ছেলেমানুষ হয়ে উঠেছে। রোগ-মুক্তির সময়ে মানুষ যেমন একটু আব্দারে হয় না, সেই রকম আর কী? আমরা ওপর-ওলাদের কাছে হুকুম পেয়েছি, আহত সৈনিকদের মনের সুস্থতার দিকে যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। চারদিকে ঐ বোমা পড়ার ছিষ্টি, তার আওয়াজেই আমাদের বাড়ীখানা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। কী ভাগ্যি, আগেই কাঁচের জানলাগুলো খুলে রাখা হয়েছিল! তোদের মাসী আন্নেল্‌কাও আমার সঙ্গে। আমরা দুজনে এক ঘরেই কাজ করতাম। মাথার ওপর ঐ ঝাঁক ঝাঁক বোমারুদের গজরানি, কানে যেন তালা ধরে যায়। তার ওপর শুনছি খুব কাছেই বোমা পড়ছে। বোমাগুলো আমাদেরই লক্ষ্য করে ফেলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ছাদের ওপর থেকে অনবরত বোমারু শিকারী কামান দাগা হচ্ছিল বলে ওরা একেবারে কাছে এগুতে পারছিল না। বেশ বুঝতে পারছি, যুদ্ধটা আমাদের মাথার ওপরেই চলেছে। রোগীরাও কি তা বুঝতে পারছে না? বেচারীদের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। আহা বেচারারা, ওদের ওঠবার শক্তি পর্যন্ত নেই। একজন বলে, প্রশেঁ পানী, ডাক্তারবাবুকে বলুন, আমি এই অবস্থাতেই আবার লড়তে যেতে রাজী আছি। কিন্তু সকাল থেকে মরবো কি মরবো না এই নিয়ে মনে মনে জুয়ো খেলতে খেলতে পাগল হয়ে যেতে চাই না। বলে, প্রশেঁ পানী, খোলা মাঠে যুদ্ধের একটা আনন্দ আছে। জানি, হয় ও মরবে আর না হয় আমি মরবো। আর এ কী!—যাই হোক, আমরা তাদের নানা উপায়ে অন্যমনস্ক রাখবার চেষ্টা করছি।

বোমা পড়লে, জানলার কাছে গিয়ে ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলি, ঐ অতদূরে বোমা পড়ছে, কিন্তু তার আওয়াজ শুনেছো, আজ হাওয়াটা একটু ভিজে কিনা, তাই আওয়াজটা অত কাছে শোনাচ্ছে। ওদের কথায় ভুলিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ঠাণ্ডা করে রাখতে পারি কী? শেষকালে হুকুম এলো, যত শীঘ্র সম্ভব, কোনো অযথা গোলমালের সৃষ্টি না করে সমস্ত হাঁসপাতাল খালি করে ফেলতে হবে, একটু আগেই একটা হাঁসপাতালে বোমা পড়েছে। বড় ডাক্তারবাবু নিজে ঘরে ঘরে গিয়ে সবাইকে বলে আসেন: "সমস্ত পোলজাতি আজ সৈনিক, আপন আত্মসম্মানের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতে আমরা কুণ্ঠিত নাই। তা না হলে তোমাদের মত লোকেরা নিজের ইচ্ছেয় প্রাণ দিতে যেতে না। যুদ্ধ এখনো শেষ হয় নি, তা তোমরা জানো। তোমাদের অবসর এবং শান্তি যুদ্ধে জয়লাভ করার পর। যুদ্ধক্ষেত্রে তোমরা যে চরিত্রের দৃঢ়তা দেখিয়েছো, তার চেয়ে কঠিন পরীক্ষা তোমাদের আজই দিতে হবে। জানি, তোমরা তৈরী। যদি মরি তো সবাই একসঙ্গে মরবো, যদি বাঁচি তাও একসঙ্গে। তোমরা যে যেমন করে পারো নার্স্‌দের সঙ্গে আস্তে আস্তে কোনো গোলযোগের সৃষ্টি না করে হাঁসপাতাল ছেড়ে দেবার জন্যে প্রস্তুত হও। তোমাদের জন্যে অন্য জায়গার ব্যবস্থা হয়েছে।" এর পর ওরা সব কেমন যেন মনের বল ফিরে পেলে। যে-যার সামান্য জিনিষপত্র নিয়ে যাবার জন্যে তৈরী হলো। একটি নিমেষও লাগলো না। এমন কি যাদের স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হতে লাগলো তারাও স্থির হয়ে শুয়ে রইলো, সাত-আট তলা থেকে স্ট্রেচারে করে নামানো মুখের কথা নয় তো! চারটে লিফ্‌ট্‌-এ কতই আর নামানো যায় বলো? তবুও আমরা ওপরতলাগুলো খালি করে দিলাম। আর দিতে না দিতেই হাঁসপাতালের ওপর বোমা পড়া শুরু

হলো। ধন্যি সাহস ছাদের ওপর ঐ কামান নিয়ে বসে-থাকা মানুষগুলোর! বেচারীরা যতটা পারছে ঠেকাচ্ছে বটে, কিন্তু অমন ঝাঁকে ঝাঁকে উড়োজাহাজ এলে কী করে বলো? শেষ পর্যন্ত ওদের কী হলো জানি না। ওপরতলাগুলো যাওয়ার সময় কি আর ওরা নিজেদের বাঁচাতে পেরেছিল! রুগীদের নীচে নামানো পর্যন্ত ওরা সমানে কামান দেগেছে। যাই হোক্, এখন অতগুলো আহত সৈনিকদের বাইরে নিয়ে যাওয়া সেও এক সমস্যা। জার্মানদের আমরা সঙ্গে নিই নি ভাবছো? সবাইকে সঙ্গে নিয়েছি। স্ট্রেচারের ওপর শুয়ে শুয়ে একজন জার্মান শেষকালে মুখ ফুটে বলে ফেললে, ন্যেখ্ ঝীয়ে পোল্স্কা! (পোলদেশের জয়!) বলে, হিট্লার নিপাত যাক্!—আমরা সবাইকে সামলে নিয়ে বেরুতে পারি কী! ওপরতলাগুলো হুড়মুড় করে ভেঙে চারিদিকে ইট, কাঠ, ভাঙা কাঁচ আমাদের গায়ের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে। তার ওপর ভেতরকার ময়দানটার ওপর বোমা পড়ে মাটি ছিটিয়ে বালি ছড়িয়ে আমাদের একেবারে কাণা করে দিচ্ছে। আর ঐ অতগুলো রুগীকে ধরে ধরে আস্তে আস্তে একটু একটু করে গেটের দিকে চলছি। শুধু বোমা নয়, ওপর থেকে মেশিন-গানও চালিয়েছে ওরা। দু-পা যাই, আর যেখানে পাই মাথা গুঁজি। সবাই কি আর বেরুতে পারলে? তবে, কথায় যে বলে, ঘর-পোড়া গরু আগুনে মেঘ দেখলে ভয় পায়, ওদের বেলা তা একেবারেই খাটে না। কারো মুখে এতটুকু আতঙ্কের ছায়া পর্যন্ত নেই। সবাই দিব্যি হাসি-ঠাট্টা করে গল্প করতে করতে এগিয়ে চলেছে। এমন কি স্ট্রেচারের রুগীগুলো পর্যন্ত ঠট্টা-মস্করা করে। পেছন দিককার একটা দলের আর চিহ্ন পাওয়া গেল না, নার্স্ ডাক্তার সবশুদ্ধ। তাতে যে ভয় পাওয়া, ওমা কিছু না, শুধু বুকে ক্রুস্ চিহ্ন এঁকে আবার চলে। এমনি করে তো

বেরিয়ে আসা গেল। বড় রাস্তায় বেরিয়ে আর এক বিপদ। ঐ প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা উন্টীংসা শুস্তেগো শ্পের্প্‌নিয়া, একেবারে ফাঁকা। সুতরাং ওপর থেকে এতগুলো মানুষ দেখলে ওরা মেশিন-গানেই সবাইকে শেষ করে দেবে। অত দুঃখে নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখে হাসিও পায়, মনে হয় যেন পরপারে গিয়ে হাজির হয়েছি, সে এক অদ্ভুত মৃতের শোভাযাত্রা, এক মাকাব্র্‌ দৃশ্য! উড়োজাহাজগুলো একটু ওদিকে যাচ্ছে কি আমরাও দু-চারজন করে সুট সুট করে রাস্তা পার হয়ে, অলি দিয়ে গলি দিয়ে খানিকদূর গিয়ে যার বাড়ী পারছি ঢুকে পড়ছি। একেবারে যেন নিজেদের বাড়ী। আপত্তি করা দূরে থাক্‌, যার যার বাড়ী তারা ছুটে এসে আমাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে নিজেদের বিছানাপত্তর সব ছেড়ে দেয়। তা ছাই সে কি দু-একজন? এক-একটা ফ্ল্যাটে বিশ তিরিশ জন করে ঢুকতে হচ্ছে। অত বিছানা কোথায়? শক্ত কেসগুলোকে খাটে শুইয়ে বাদবাকী মাটিতেই গড়ে গড়ে কম্বল, কার্পেট পেতে পাশাপাশি ফেলে রাখি। আর সে কি রক্তের ছিষ্টি, মাগো! ঝাবো, তুই বাপু আর দু-বার সেসব কথা শুনিস্‌ নি, আবার মনে বিঘ্নি জন্মে তিন দিন খেতে পারবি না তো! যাই হোক, ওদের তো কোনোরকমে বাঁচানো গেল। এখন মুস্কিল হলো ওষুধ নিয়ে। আগেই শহরে এক ফোঁটা টিন্‌চার আইওডিন পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন আর কিছুই নেই। শুধু কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে ওদের মন খুশী রেখে যদি সারানো যায় এই ভরসা। হাঁসপাতাল থেকে বেরবার সময়ে পেছনে তাকিয়ে দেখি সমানে বোমা ফেলে হাঁসপাতালটাকে জার্মানরা গুঁড়ো করে দিচ্ছে। দোতলার রাস্তার দিকে অপারেশন-থিয়েটারটা দেখলাম চুরমার হয়ে গেছে। কত হাজার হাজার জ্‌লতীর অস্ত্রপাতি টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ছে। তারপর? তারপর যুদ্ধ খতম

হয়ে গেল। নতুন জার্মান সরকার এসে আমাদের জবাব দিলে। শুনছি নাকি, কিছু কিছু রুগী কোথায় নিয়ে গিয়ে রেখেছে। বাদবাকী যারা একেবারে অথর্ব্য, যাদের সারতে অনেক দিন লাগবে, তাদের নিয়ে ওরা কী করেছে, ভগবানই জানেন। আহা, সেই রুগীটার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। বেচারীর দুটো হাত, দুটো পা-ই গেছে। ঠাট্টা করে বলতো, প্রশেঁ পানী, ভগবান মুখখানা তো রেখেছে, কিছু না পারি দাঁত খিঁচিয়ে ওদের গাল পাড়তে পারবো তো! আর ঐ দেখ, বুড়ো হয়েছি, সব কথা আবার মনেও থাকে না। হাঁসপাতালে বায়ান্‌ও* ছিল। সে নাকি বের্লীন্‌-এর ওপরে গিয়ে হাজির হয়। তারপর গুরুতর রমকে আহত হয়ে ফিরে আসে। শুনছি নাকি একটু ভালো হয়ে উঠে সে আবার ওরা আসবার সঙ্গে সঙ্গেই সবে পড়েছে।

মামুস্থার গল্প শেষ হলে দিদি বলেন—জানো মামুস্যা, হিরণরা বলে কি যে, ওরা শহরের বিশ কিলোমেত্র্‌ আগেও নাকি কাল পর্যন্ত যুদ্ধ দেখে এসেছে। আর আমরা ভাবছি, সব থেমে গেছে। আর পথে আসতে আসতে নাকি ওরা বরাবরই একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে এসেছে। বেচারীরা শহরে ঢুকে তবে বিশ্বাস করে, ভার্‌শাভা সত্যিই আত্মসমর্পণ করেছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। তুমিই বাপু ওদের ভার্‌শাভার অত্মসমর্পণের কথাটা শোনাও। শুনেছো, ওরা বলে নাকি হাঁটতে হাঁটতে এমন একখানা গাঁ দেখে নি যেখানে বোমা পড়ে নি। তাই ভেবেছিল শহরে আমরা দিব্যি আছি।

কেন মন্দটাই বা কী?—মামুস্থা প্রতিবাদ করেন।—নিজের মান

* বিখ্যাত পোল বৈমানিক।

বাঁচাতে প্রায় গোটা শহরটা ছারখার হয়েছে, এমন উদাহরণ ইতিহাসে কটা মেলে শুনি ?

হ্যাঁ, তা বটে।—দিদি বলেন—কিন্তু আমাদের মাথার ওপর দিয়ে কী ঝড়টা গেছে বলো তো।

তা আর যাবে না! কিন্তু ভেবে দেখ্‌তো, ঐ ঝড় সহ্য না করলে কি আমরা আজ জগতের কাছে মুখ দেখাতে পারতাম ? তোরা দেখে নিস্‌, আমাদের এই শহরে যুদ্ধের পরে লোকে তীর্থ করতে আসবে। জগতের স্বাধীনতার প্রতীক হবে এই ভার্‌শাভা।

রক্ষে করো মা।—দিদি বলেন।—ভার্‌শাভার মাঝখানে নভ্যী ইয়র্কের স্বাধীনতার প্রতিমূর্তিটির মতন একটি হেরড্‌ বাবা-য়* কাজ নেই আমাদের। ভার্‌শাভা থাকবে আমাদের নিতান্ত আপনার, প্রাণের জিনিষ। বিদেশে গেলে এর প্রত্যেকটি রাস্তার জন্যে আমাদের মন কেমন করবে। এখানে অতিথি এলে পাবে আদর, যত্ন, আশ্রয়, হৃদ্যতা। কিন্তু, যেখান থেকে সেখান থেকে যে-সে এসে যে এখানে মুঠো মুঠো টাকা ছড়িয়ে নবাবী করবে, ও-ধরণের টুরিস্টে কাজ নেই আমাদের। সত্যি কথা বলতে, আমরা যে-জন্যে শহরটা ছারখার করতে দিলাম, তা কি যুদ্ধের পরে ওটাকে একটা নভ্যী ইয়র্ক্‌ করে তোলবার জন্যে, না আমাদের একান্ত পোলীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার জন্যে ? কাদের ভরসা করে আমরা যুদ্ধে নেমেছিলাম ? আর কাদের মুখ চেয়েই বা আমরা ধ্বংস হলাম ? আমাদের কাছে এ-যুদ্ধ তো জুয়োখেলা নয় মা, বা ট্রেনের কামরার শান্তাঝ্‌ও† নয়, ভার্‌শাভা জগতের যেখানে যত পোল আছে, দেশে, বিদেশে, সকলের আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যেই

* জাঁদরেল মেয়েমানুষ।

† ব্ল্যাক্‌ মেলিং।

আত্মাহুতি দিয়েছে। ভবিষ্যতে যদি সে কারো তীর্থস্থান হয় তো সে শুধ্ পোলদের। ইতিহাসে এইবার নিয়ে এই যে চারবার পোল্‌স্কাকে * দখল করা হলো, তার জন্যে জগতের মানুষের মাথাব্যথা লক্ষ্য করেছো কী, মা? পোল-জার্মানে এই যে লড়াই হয়ে গেল, আমার মতে এ একটি সম্পূর্ণ পৃথক্ যুদ্ধ। যে দ্বিতীয় মহাসমর হবার কথা ছিল, তা এখনো শুরুও হয় নি। এতেও বুঝতে পরছো না, আমাদের জন্যে কাদের মাথাব্যথা? জার্মানরা ওদের অস্ত্রবল, জনবল দিয়ে আমাদের বাহুবলকে পরাস্থ করেছে, চাতুরী আর নিষ্ঠুরতা দিয়ে জয় করেছে আমাদের সারল্য আর বিবেক-বোধকে, কিন্তু শোধ যদি নিতে হয়, তো কি ভাবছো মা, পৃথিবীশুদ্ধ মানুষ আমাদেব জন্যেই ওদের ওপর প্রতিশোধ নেবে?

মামুস্‌যা স্বর নামিয়ে সভয়ে বলেন—ঝ্‌বো, তুই থাম্ বাছা, তোর একবার বক্তৃতা করতে পেলে হয়! এই রাতদুপুর পর্যন্ত আলো জ্বেলে বসে আছি আমরা, রাস্তা থেকে সব দেখা যাচ্ছে তো! তুই কি জানিস্ কেউ দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছে কি না?

দিদি বলেন—এমন ভয়ে ভয়ে চোরের মতন বেঁচে থাকার চেয়ে মরা ভালো, মা। আমার দ্বারা ওসব হবে না।

মামুস্‌যা অকাট্য যুক্তি প্রয়োগ করেন—মানলাম। কিন্তু তোর ছেলেমান্‌ষি এখনো গেল না ঝ্‌বো। তুই কি ভুলে গেছিস, হিরণ আমাদের মতন কথা বলে, ও আমাদেরই একজন হলেও ওর পাস্‌পোর্ট্‌টা ইংরেজী?

হঠাৎ আতঙ্কে দিদির মুখখানি এতটুকু হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি আর এক কাপ করে হেব্‌বাতুম্ ঢেলে দিয়ে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে বললেন—

* পোলদেশ

ঐ দেখ, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বোধ হয়। হিরণ যে পর মানুষ তা কি ছাই সব সময়ে মনে থাকে ?

বলি—পর মানুষ না হলে কি আর তাকে দেশ ছাড়া করে দিয়ে নিজেরা দিব্যি এই যুদ্ধের সবচেয়ে বড় ঘটনাটিকে দেখে নিলে ?

দিদি প্রতিবাদ করেন—কেন, সঙ্গে কি একজন আপনার লোক দিই নি রে ? আচ্ছা, বল্ তো ভাই, বুকে হাত দিয়ে, ওকে না নিয়ে কি আমায় সঙ্গে নিতিস্ !

বলি—কখনোই না। তোমায় নিলে কি আমায় স্বস্তিতে মরতে দিতে ? জার্মানের বোমা তো কোন্ ছার, সারাদিন চোখ পাকিয়ে বসে হিরণের ত্রিসীমানা থেকে মাছি তাড়াতে, আর সারাটি রাত চোখ জ্বেলে বসে থাকতে পথের ধারে নিদ্রিত হিরণের রক্ত-লোলুপ থানার ভেতরকার বনিয়াদী মশা তাড়াবার জন্যে। তার ওপর ক্ষেপে ক্ষেপে কেক তৈরী করতেই বেলা কেটে যেতো। ফলে আমাদের মাইল দশেক গিয়ে মাইল দশেক ফিরে আসতে হতো, পায়ে হেঁটে দেশ বেড়ানো হতো না।

গম্ভীর-বদন দিদি হেসে লুটিয়ে পড়েন। বলেন—তোদের দুটোকে আমি যে কী ঘেন্না করি তা জানলে আর ওকথা বলতিস্ না।—বলে পূর্বোক্তা গালেচ্‌কার গাল-দুটি আক্রোশভরে সজোরে টিপে দেন। আদুরে ছোট বোনটিও আব্দার ধরে—দিদি বলো না, তারপর কী হলো।

ঘুম পায় নি তো ?—দিদি শুধান—বাদবাকী গল্প কালকের জন্যে মজুত রইলো। একদিনে সব ফুরিয়ে গেলে কাল তোদের কী বলে খাওয়াবো বল্ তো ?

যাক্‌গে ফুরিয়ে, তুমি বলো।—কনিষ্ঠার আদেশ।

তবে শোন্।

দিদি বলতে শুরু করেন ঃ

…বাইরের অনেকের ধারণা ভার্‌শাভা ১৭ই সেপ্টেম্বর আত্মসমর্পণ করে। ও-ধারণার কারণও ছিল। ঐ তারিখেই, অর্থাৎ যেদিন রুশীরা আক্রমণ শুরু করলে, পোল সরকার, অর্থাৎ শ্মীগ্‌ল্যী বেক্‌ এণ্ড্‌ কোম্পানী, দেশত্যাগী হলো। সমস্ত পোল্‌স্কায় ভার্‌শাভা যেন একটি পৃথক্‌ স্বাধীন রাজ্য হয়ে উঠলো। পান্‌ প্রেসিদেন্ত্‌ চলে গেলেন, কিন্তু ভার্‌শাভার নিজের প্রেসিদেন্ত্‌ বর্তমান। চলে গেলেন সেনা-নায়ক মারেশাল্‌ শ্মীগ্‌ল্যী, ভার্‌শাভা পেলে তার বদলে তিন-তিনজন খাঁটি যোদ্ধা এবং নায়ক। মেয়র স্তাঝ্যীঞ্‌স্কি আর তিন জন জেনারেল। রুম্মেল্‌, কুট্‌ছেবা আর চুমা-র নাম পোল ইতিহাসে শতাব্দীর পর শতাব্দী লেখা থাকবে। তোরা থাকলে বুঝতে পারতিস্‌, ভার্‌শাভা কিসের জোরে শেষ এগারো দিন সর্বস্ব পণ করে লড়তে পেরেছিল। তখন আর শহর বলে কিছুই নেই, ভার্‌শাভা হয়ে উঠেছে একটি কেল্লা। শহরের চারিপাশে বারিকাদ্‌ বানানোর কথা তো তোরা শুনেই গিয়েছিলি। ৬ তারিখের রাত দুটোয় কর্ণেল উমিয়াস্তভ্‌স্কি যে পুরুষদের শহর ছেড়ে চলে যেতে বলে কি ক্ষতিটাই করেছিলেন, তা আর বলে কাজ নেই। অবশ্য একরকম ভালই হয়েছিল, কারণ যারা নিজের নিজের মাথা বাঁচাবার জন্যে সরে পড়েছিল তারা থাকলেও যে কিছু কাজে আসতে পারতো তা বিশ্বাস হয় না। যারা নিজের ইচ্ছেয় শহরের মাটি কামড়ে পড়ে রইলো তারাই তো লড়লে। অবশ্য ভার্‌শাভার চারিদিক থেকে হাজার হাজার সৈনিক ঐ তিনজন জেনারেলের সঙ্গে এসে হাজির হলো। তখন শহরের যে সংস্থান তাতে বাজে লোকের সেখানে জায়গা হতো না। ধরো না, আমি অবিশ্যি বিশেষ কিছু করতে পারি নি, কিন্তু

তবুও বাড়ী বসে ওঁকে সামনে কিছু না পারি ব্যাণ্ডেজ তৈরী করেছি, কয়লা-ভরা গ্যাস-মুখোস সেলাই করেছি। সবাইকেই কাজ করতে হয়েছে। যারা লড়েছে তাদের কথা ছেড়েই দাও। আশ্চর্য উঁচু মন ওদের কিন্তু। শহরে খাবার তো ক্রমেই কমে আসছিল। আর ওদের ঐ অসহ্য পরিশ্রম। সারা দিন রাত, চব্বিশটি ঘণ্টা, দিনের পর দিন প্রাণের মায়া না করে লড়ছে তো। বলে কি জানো, বলে শহরের অন্য লোকেরা যা খেতে পাবে আমরাও তাই খাবো। আমাদের খাওয়া যেন সাধারণ লোকের খাওয়া থেকে একচুল তফাৎ না হয়। আর সব দিকে ওদের চোখ। লড়ছে বটে কিন্তু শহরে কার কী অসুবিধে, অভাব অভিযোগ, সব দিকে ওদের দৃষ্টি। জল নেই, সৈন্যরা জল দেবে। কেউ হয়তো একটুকরো রুটীর জন্যে লালায়িত, যাও সৈন্যদের কাছে। সিগারেট-খোররা তো সৈন্যদের দয়াতেই বেঁচে গেছে। তারপর-শেষাশেষি এমন হলো যে শহরে আর খাবার কিছু নেই। সে-ব্যবস্থাও সৈন্যরা করে দিলে। বলে, পানিয়ে, আমরা শহরের ভেতরে ঘোড়সওয়ারী সেনা নিয়ে করবো কী? পালাতে হলে অবিশ্যি খুব সুবিধে, আর আমরা যখন পালাবো না, এইখানেই প্রাণ দেবো, তখন ঘোড়াগুলোকে মেরে খাবারের ব্যবস্থা হোক। জানিস্, এখানে ওরা দিনে সাত-শ করে ভালো ভালো, আরবী ঘোড়া মেরে শহরের মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে?

…কত আর বালবো তোদের? দিনের পর দিন শহর ভাঙচে আর পুড়ছে। তবে ঐ যা, উড়োজাহাজের কৃপায় মাথার ওপর বোমা ছড়িয়ে যায়। নীচে নেমে সম্মুখ যুদ্ধে ওরা একটি পা এগুতে পারে নি। বারিকাদ্‌ বানানো হয়েছে বটে, কিন্তু সে কি আর বারিকাদ্‌? ইট আর খোয়ার গাদা, জায়গায় জায়গায় ওল্টানো ট্রাম আর এদিকে ওদিকে খানিকটা করে খানা। ইচ্ছে করলে সেসব বারিকাদ্‌ ওরা কোন্‌ কালে

ডিঙিয়ে, ভেঙে শহরে ঢুকতে পারতো। কিন্তু পারে নি কেন? পারে নি এই জন্যে যে, যেখানে একজন পোলের হাতে বন্দুক আর সঙ্গীন, কোমরে টোটার থলী ছিল, সেখানে দলে দলে জার্মান এসেও থানার ওপারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। উড়োজাহাজে করে মেশিন-গানের গুলী ছড়িয়ে ওরা ঐ রক্তমাংসের বারিকাদ্ ভাঙতে চেষ্টা করেছে বটে, অনেক জায়গায় ভেঙেছেও, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার মানুষের বারিকাদ্ খাড়া হয়ে গেছে। ১৭ তারিখ থেকে ২৪শে, একটি হপ্তা যেন একটি যুগ। ঐ কদিনেই কম হবে তো একলাখ লোক মারা গেছে।

…তার পর এলো ২৫শে। ভারশাভার ইতিহাসে ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সাল একটি স্মরণীয় দিন। সারাদিন বোমা, তারপর, রাত্তিরে চলে আগুনে বোমার জের, আর তাই লক্ষ্য করে শহরের বাইরে থেকে আসে কামানের গোলা। আগুনের আভায় সমস্ত আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে আর পুড়ছে হাজারে হাজারে মানুষ, ছোট, বড়, বাচ্চা, বুড়ো সবাই। আহা, ঐ আগুনের ভেতরে বাচ্চাগুলোর অবস্থা একবার ভেবে দেখ্ তো। পাড়ায় পাড়ায় মানুষ যেন আগুনের বেড়াজালে আটকে পড়েছে। এক পাড়ার মানুষ অন্য পাড়ায় আবার পথ পায় না। মাথা চাপড়ে হাহাকার করতে করতে জীবন্ত পুড়ে মরে। কোলের বাচ্চাকে বাঁচাতে গিয়ে কত মা-ই যে বাচ্চাশুদ্ধ্ পুড়েছে তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই। মানলাম, যুদ্ধে মানুষ মরেই, কথায় বলে না à la guerre comme à la guerre, কিন্তু তারা আমাদের মতনই মানুষ তো! ভেবে দেখ দেখি তাদের অবস্থা। আমরা যে বেঁচে গেছি তা শুধু হিরণের পরম "নাস্তির" দয়া ছাড়া আর কী বলবো? এই আমার চোখের সামনে একটি মেয়েমানুষ ওপরের ঘর থেকে তার বেড়ালটাকে বাঁচাতে গিয়ে

আর ফিরলো না। যুদ্ধ বলো বিগ্রহ বলো, মানুষের মন বদলায় কি রে, তার মায়ার সংসারই যে তার কাছে সব। ঐ যে হাজার হাজার বাড়ীর হাজার হাজার ফ্ল্যাটে হাজার হাজার মানুষের হাজার হাজার সংসার, তাদের মাথা গোঁজবার আশ্রয়, জীবনের হিসেব-নিকেশ শেষ করে শান্তিতে মাথা রাখবার ঠাঁই, ওগুলো যখন দাউ দাউ করে জ্বলে, তখন জাতীয় সম্মান বজায় রাখবার জন্যে হার না মানা ক-টা শহরের মানুষ পারবে, তা এই যুদ্ধ শেষ হলেই জানা যাবে। আর, একটা শহরের জন্যে দু-লাখ মানুষ প্রাণ দিয়েছে এরকম দৃষ্টান্তও ক-টা পাওয়া যাবে তাও দেখবো'খন।

·· জেনারেল রুথ্যেল্‌ তাঁর ব্যক্তিগত বীরত্বে সৈন্যদের মনে যে সাহস এনে দিলেন তা দেখলে তোরা অবাক হয়ে যেতিস্। মাথায় গুরুতর চোট লেগেছে, কিন্তু নিজে গিয়ে প্রত্যেকটি সৈন্যের দেখাশোনা করা, তাদের কী করতে হবে না হবে সব বলে বুঝিয়ে দিয়ে আসা কটা লোকে পারে রে? সমস্ত ভার্‌শাভা যেন তাঁর নিজের বাড়ী। সেকেলে কর্তার মতন তাঁর ভাবভঙ্গি। আর সৈন্যরাও তাঁকে দূর থেকে দেখেই যেন চাঙ্গা হয়ে উঠতো। আর তাঁর মুখেও ঐ এক কথাঃ থাক মান যাক্‌ প্রাণ। অবশ্য জেনারেল কুট্‌ছেবা আর জেনারেল চুমাও কিছু কম যান নি: বর্ত্‌নফ্‌স্কি, লাঙ্গের এঁরা কেউ শহরে এসে পৌছতে পারেন নি। ২৫শে তারিখের আক্রমণেই শহরের তিন ভাগের এক ভাগ ধ্বংস হয়ে গেল। জেনারেলরা তাতেও ক্ষান্ত হলেন না। আর জানিস্‌, ভার্‌শাভার পতন নিশ্চয় জেনেও একটি লোকও বলেনি যে আর যুদ্ধ করে কাজ নেই। সবার মনেরই এক ভাব, যাই হোক একটা শেষ নিষ্পত্তি হয়ে যাক্‌। সবাই বলে, যেন ইতিহাসে লেখা না থকে, ভার্‌শাভা মানে মানে প্রাণ বাঁচিয়েছে। যখন সব শেষ হয়ে গেল, আর শেষ মানে কী তাতো

আজই কিছু কিছু দেখেছিস্‌ তোরা, তখন রুম্মেল্‌ আত্মসমর্পণের চুক্তি স্বস্তখত করলেন। ওঁকে ওরা বন্দী করে নিয়ে গেছে।

…আর একজনের কথা এখনো তোদের বলি নি। মেয়র স্তাঝ্যীঞস্কি। রুম্মেল্‌ যেমন সৈনিকদের মনে সাহস এনে দিতেন, রাদিওতে পান্‌ প্রসিদেন্ত্‌ স্তাঝ্যাঞস্কির গলার স্বর শুনলে সাধারণ মানুষের মনেও ঠিক সেইরকম ভাবটা হতো। আমাদের মাথার ওপরে তখনো যে একজন রয়েছেন, যিনি আমাদের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সমস্যা নিয়ে দিন-রাত্তির ব্যস্ত, একথা ভাবলেও আমরা যেন নিশ্চিন্ত হতাম। তোরা শুনলে হাসবি, ঐ নিতান্ত ভদ্র, সুজন মানুষটি শেষকালে রাদিও মার্ফৎ জার্মানদের কী গালাগালিটাই দিতেন! ওঁরও গোটা শহরটা যেন নিজের বাড়ী। তার ওপর শ্বাব্‌রা ঐরকম আক্রমণ চালিয়েছে, কাজেই ভদ্রলোকের শেষকালে আর মুখেব আকঢাক থাকতো না। তাছাড়া শহরের মানুষকে কী কী করতে হবে সব দিকে ওঁর নজর। উনি যখন যা চাইতেন, তা তৎক্ষণাৎ পালন করবার জন্যে সবাই অস্থির হয়ে উঠতো। মনে আছে, একবার রাদিও-তে তিনি আহতদের জন্যে বালিশ-বিছানা চাইলেন। যার যা ছিল তক্ষুণি সব তাঁর কাছে পৌছে দিয়ে এলো। তখন বেশ লাগতো কিন্তু, আমরা যেন একটি গোটা পরিবার। সবাই সবার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে ব্যস্ত, ছোট ছোট স্বার্থবোধ তখন আর মনেই আসে না। মাথার ওপর পান্‌ প্রেসিদেন্ত্‌ স্তাঝ্যীঞস্কি। ওঁর জেদ্‌ও বলিহারি যাই। বলেন, ভার্‌শাভায় যদি শ্বাব্‌রা ঢুকতে পায় তো সে আমাদের মড়া ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে। পুড়ুক ভার্‌শাভা, ওরা এলে যেন প্রচুর ছাই খেতে পায়। হোলও তাই। শহরের চারভাগের তিনভাগই তো গেছে। তবুও উনি একেবারে শেষ না হওয়া পর্যন্ত লড়তে রাজী ছিলেন। আমরাও।

তাহলে কি আজ তোরা ঝাবাকে এখানে দেখতে পেতিস্? যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বেচারার জেদ্ ছাড়তে হলো বৈকি, না হলে আরো বেশ দিন কতক যুদ্ধ চলতো এখানে। জেদ্ ভাঙলেন কেন জানিস্! ২৫ তারিখের পরে ওরা রাদিও-তে স্পষ্ট জানিয়ে দিলে যে তখনও শহর যদি আত্মসমর্পণ না করে তাহলে ওরা গ্যাস্ ছাড়তে বাধ্য হবে। তখন কারো বাড়ীতে একখানি জানলার শার্সী পর্যন্ত নেই। মানুষ কী দিয়ে গ্যাস্ আটকাবে বল্ তো? আর সে মরণও তো সাধারণ মরণ নয়। গুঁড়োনো বোমায় শেষ করে দিয়ে গেল, কি মানুষে আগুনে পুড়ে মলো, সে এক রকম, কিন্তু গ্যাসে দম বন্ধ হয়ে মরা একটু একটু করে, বাবা, ভাবলেও গা শিউরে ওঠে, তারপর বাচ্চাগুলো কী ভয়ানক কষ্টে মারা যেতো বল্ তো! জার্মানরা বলেই দিয়েছিল—গ্যাস্ ছাড়লে শহরে আর একটি জ্যান্ত প্রাণী থাকবে না। তাই সাত পাঁচ ভেবে ২৮শে সেপ্টেম্বর স্তাঝ্যাঞ্‌স্কিও আত্মসমর্পণের চুক্তি সই করলেন। জার্মানরা শহরে ঢোকবার পরেও তিনি আমাদের জন্যে কম করেন নি। তখন অবশ্য তাঁর একমাত্র চিন্তা, কী করে আমাদের মুখে দুটি অন্ন জোগাবেন, কী করে আমাদের মহামারীর হাত থেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু শ্বাব্‌দের তা সাইবে কেন? তারা তাঁকে দুদিন পরেই বন্দী করে নিয়ে গিয়ে দাখাও-এর কন্‌সেন্‌ট্রেশন্ ক্যাম্পে চালান করেছে। শুনছি নাকি, তাঁর ওপর ওরা অকথ্য অত্যাচার করেছে, মেরেছে কি রেখেছে ভগবানই জানেন। আর ওদের রাখা তো মারার বাড়া।···ওমা দেখেছো, গল্প শোনবার শখ আছে, কিন্তু গল্প শুনতে আরম্ভ করলে আর দু-দণ্ড চোখ খুলে রাখতে পারে না। ছেলেবেলা থেকেই ওর ঐ অভ্যেস।···হিরণ তুই ও ভাই শুতে যা। আমি ওদের তুলি। তোর ঐ বারান্দার দিকের ছোট্ট দিভান্‌টায়

শুতে কষ্ট হবে না তো? ওমা এর মধ্যেই তিনটে বেজে গেছে!…

জানলা দিয়ে হানা শহরের রাতের চেহারা। একটানা অন্ধকারের পটভূমিতে সারি সারি ধ্বংসস্তূপের বিশাল করাল ছায়ামূর্তি। সেই একটি দিনের স্মৃতি থেকে বাস্তবকে প্রাণপণে অপসারিত করবার জন্যে মাথার ওপর পর্যন্ত কম্বল টেনে দি। হঠাৎ বাইরের থমথমে নিস্তব্ধতার গায়ে পড়ে সারি সারি মেশিন-গানের ছিদ্র। পা-পা-পা-পা-পা! পা-পা-পা-পা-পা! পা-পা-পা-পা! দিদিকে জিজ্ঞেস করি, ওরা এত রাত্তিরে প্র্যাক্‌টিস্‌ করছে নাকি?

ও ঘর থেকে দিদি চুপিচুপি উত্তর দেন: প্র্যাক্‌টিস্‌ই বটে। সেইমের (পার্লামেণ্ট্‌) মাঠে বন্দীদের গুলি করছে।

দিদি বলেন—এখনো তোর সে-ঘরে যাওয়া চলবে না, ভাই।

জিজ্ঞেস করি—কেন বলো তো?

সে-বাড়ীর দারোয়ানটাকে এখনো হাত করা হয় নি। তাছাড়া এদেশে আর তোমার পাকা আ-স্রা-মা খোলা চলবে না তো। আজ এখানে কাল সেখানে করে কাটাতে হবে, যেমন আর সবাই করছে।

মামুস্তা প্রস্তাব করেন—তেমন তেমন দেখলে আমার মাটীর নীচের প্রকাণ্ড কয়লা-রাখা ঘরখানায় দিব্যি গা-ঢাকা দেওয়া চলবে।

দিদি বলেন—তার চেয়ে বরং আমার দেওয়াল-আলমারী ভালো। "তেমন তেমন"-এর কথা হচ্ছে না মামুস্থ্য, যাতে তেমন তেমন না হয় সেই ব্যবস্থাই করতে হবে আগে থেকে।

বলি— তেমন তেমন তো একদিন হবেই। এখানে যখন একবার মাথা গলিয়েছি, তখন কি আর ছাড়া পাবো?

দিদি উত্তর দেন—তেমন তেমন যখন হবে ততদিনে এদের মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে আসবে। তোকে নিয়ে তখন ওরা আর যাই করুক তোর মুণ্ডু নিয়ে ফুটবল খেলবে না বলে আমার বিশ্বাস। এখন তোকে একবার পেলে হয়! নতুন-জয়-করা দেশ, এখন কি ওরা কারুর বিচার

করছে ? ভেবে দেখ্‌ তো, আজ ভোর বেলা কতক্ষণ ধরে গুলী চললো ! তোর ঘুমিয়ে পড়বার অনেকক্ষণ পরেও ওরা "প্র্যাক্‌টিস্‌" চালিয়েছিল। এক-একটি গুলী মানে এক-একটি প্রাণ।

দিদির পূর্বানুভেব প্রবৃত্তি এই তৃতীয় বার আমায় আশ্চর্য করে দেয়। এখন ভাবি, ঠিক সেই সময়ে জার্মান সৈনিকদের হাতে ধরা পড়লে এই অধমের মর অস্তিত্ব একটি গুলীর ফুৎকারে পঞ্চভূতে লীন হতো। সেদিন দিদির বাড়ীতেই কাটাবার ব্যবস্থা করে আমি পথের জন-সমুদ্রে একটি বারি-বিন্দুর আকার ধারণ করে মাস্টার পল্লীর দিকে ধাওয়া করলাম। পথ বলে তখনো বিশেষ কিছু নেই। শুধু ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে অতি সাবধানে কোনো বিশেষ গন্তব্যস্থল লক্ষ্য করে এক-পা এক-পা করে অগ্রসর হওয়া। বৈচিত্র্য এইটুকু যে ধ্বংসস্তূপের ওপরে মাঝে মাঝে হুমড়ি খেয়ে পড়ে দুপাশের ভাঙা বাড়ী। যুদ্ধের পর নিয়তির সঙ্গে জীবন-সংগ্রাম। সমস্ত শহরে যেন আবার নতুন করে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এক-একখানা বাড়ী পড়ার শব্দ কামানের আওয়াজকেও হার মানিয়ে দেয়।

দূর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটক চোখে পড়ে। আবার নিয়তির দুর্দমনীয় টান অনুভব করি। ফিকে সবুজ উর্দী পরা জার্মান সান্ত্রীদের কাছে সটান গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়—ইউনিভার্সিটিটার কী আছে, কী গেছে হে ?—ভুলে যাই ওরা দেশটা অধিকার করেছে, আর আমার পকেটে ব্রিতানী পাস্‌পর্ত্‌। আমার পা-দুটো যখন অসংযতভাবে ফটকের দিকে এগিয়ে চলেছে তখন হঠাৎ কে যেন আমার গতিরোধ করে। দ্যেন্‌ দব্রিয় পান্ !—একটি দারোয়ান। চুপি চুপি বলে—ওদিকে যাবেন না, পানিয়ে প্রফেসঝে।—তাই তো ! অবাক হয়ে ভাবি, আমি স্বীয় কবর অভিমুখে অমন দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে

চলেছিলাম কেন কে জানে? দারোয়ানটির কর্তব্য-বোধ আমায় চমৎকৃত করে। কাছেই একটা চায়ের দোকানে সে সারা দিন চোখ পাকিয়ে বসে থাকে, পাছে কোনো অধ্যাপক বদ্ অভ্যেসের প্ররোচনায় ইউনিভার্সিটিতে না ঢুকে পড়েন। বলে—আজ বিশ বছর ওদের নে ঘর কত্তিচি, মাস্টারদের বদ্‌খেয়াল আমার জানা আচে, পানিয়ে। আস্তাবল-মুখো ঘোড়া আর ইউনিভার্সিটি-মুখো প্রফেসর, ও দুইই সমান।—ওর মুখেই শুনতে পাই, ইউনিভার্সিটির প্রায় সবটাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বড় বাড়ীটার আর চিহ্ন নেই; আছে শুধু বাঁদিককার নতুন আইন-বিভাগ আর মাঝখানের গ্রন্থাগার। ইউনিভার্সিটির ধ্বংসাবশেষ হয়েছে গোরাদের ব্যারাক। দারোয়ান যোগ করে—ঐ বাড়ী-দুটোই যা আছে, তবে জিনিষপত্তর সব ওরা লোপাট কত্তেচে, পানিয়ে, সায়েন্স্-এর সব যন্তরপাতি এসেই ওরা যা পেয়েচে নে গেচে। লাইবিরির বইগুনো অব্বিস্থি এখনো আচে, তবে কদ্দিন থাকবে বলা যায় নে। শ্বাব্‌দের মগজ উল্টো দিকে কিনা, তাই ওরা বইগুনোর পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে সেই কাজেই নাগাচ্চে।—দারোয়ানের মেঠো ইয়ার্কী মনে তখন বিকার আনে না। দূর থেকে চোখে পড়ে বিদ্যাপীঠের ভস্মস্তূপ আর বাগানের ওপর জার্মান গোরাদের কুচকাওয়াজ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছন দিকে ছিল অধ্যাপকদের থাকবার জন্যে প্রকাণ্ড ইমারৎ। উলীৎসা সেভেরাীনুফ্, এই রাস্তাতেই ছিল ইংরেজদের গির্জে এবং তৎসংলগ্ন ইংরেজী শেখবার ক্লাস যার ছাত্র-সংখ্যা ছিল, যেমন অনুমান করা চলতে পারে, অধিকাংশই শেমের বংশধরবৃন্দ। হিট্‌লার-বালকদের পক্ষে এর চেয়ে অধিক লোভনীয় আর কী হতে পারে? ঐ গির্জেটিকে উপলক্ষ করেই বোধ হয় ওরা মাস্টার বেচারীদের ভিটেমাটী ছারখার করেছে। খানিকদূর গিয়ে দেখি একজন চাষা

পিঠে প্রকাণ্ড রুক্সাক্ নিয়ে ইউনিভার্সিটির আনাচে-কানাচে ছোঁক্-ছোঁক্ করে বেড়াচ্ছে। চাষার বিদ্যানুরাগ দেখে সত্যিই চমৎকৃত হই। কাছে গিয়ে পেছন থেকে বলি, ও নিয়ে আর মনে দুঃখ করে কী হবে ভাই? তোমার পিঠে আলু নাকি হে?—লোকটি সটান আমার দিকে ফিরে বলে, হ্যাঁ, আলুই।—তার চেহারা দেখে আমি সর্পদষ্টবৎ সাত হাত পেছিয়ে গিয়ে বিস্ময়ধ্বনি করি—মাগ্‌নিফিৎসেন্সিয়!* আপনি! এই বেশে!

হ্যাঁ, কলেগ।†

আপনাদের এই বাড়ীটা একেবারে পুড়ে গেছে!

বাড়ী গেছে তাতে দুঃখ নেই, কলেগ, কিন্তু আমার সারা জীবনের সঞ্চয় বৈজ্ঞানিক লাইব্রেরিটাকে কি আর দুবার গড়া যাবে ভায়া? বাড়ীঘরদোর সব গেছে। চাষাদের কাছে কেনা এই আমার নতুন বেশ। আমার স্ত্রী আর আমি প্রাচীন পল্লীর মাস্টারদের বাড়ীতে মাটীর নীচে কয়লার ঘরে আশ্রয় নিয়েছি। মাথার ওপর একটা ছাদ আছে, এই যা, পিঠে এই দশ সের আলু, পাঁচটা বাঁধা কোপি, দু-সের গাজোর, পাঁচ সের পেঁয়াজ। ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে শহরের বাইরে থেকে কিনে এই বাড়ী ফিরছি। কিঞ্চিৎ ভারের লাঘব করলে, কলেগ, যারপরনাই আনন্দিত হবো।

প্রফেসর ডক্টর আ— ইউনিভার্সিটির রেক্টর। পরনে চাষাদের ব্রীচেস্, পায়ে হাঁটু-ঢাকা বুট, মাথায় ক্যাপ, গায়ে ভেড়ার রোমের কুর্তা! এততেও তাঁর স্বাভাবিক ভদ্রতা এবং সৌজন্যের তিলমাত্র ব্যতিক্রম

* Your magnificence—বিশ্ববিদ্যালয়ের খুদ কর্তার প্রতি প্রযোজ্য।

† কলেগা—বন্ধু বা সমকর্মী। অধ্যাপকদের মধ্যে পরস্পরকে সম্বোধন করবার রীতি।

নেই। মনে আছে, যুদ্ধের আগে বড় বড় ভোজ বা সামাজিক অনুষ্ঠানে আমায় পরিচয় করিয়ে দেবার সময়ে তাঁর মধুর অথচ সংযত কণ্ঠে বলতেন—ইনি আমাদের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। তাঁর হাস্য-রস ভোজের প্রত্যেকটি পদে এমন একটি সুরভি এবং স্বাদ যোগ করতো যার খবর অত্যভিজ্ঞ পাচকেরও অজ্ঞাত ছিল। য়েগো মাগ্‌নিফিৎ-সেন্সিয়া পান্‌ প্রফেসর ডক্টর আ— ছিলেন আমাদের ইউনিভর্সিটির একটি অদৃশ্য, সর্বব্যাপী অন্তরাত্মা।

কিছুদুর গিয়ে বাঁদিকে পড়ে "লুস্‌"। ভারশৌএর অধ্যাপকদের কাফির আড্ডা। সেখানে আজ নয়া নবাবদের ভূরি-ভোজন চলেছে। তাই ভয়ে ভয়ে পাশ কাটিয়ে যাই। তারপর সামনে যতদুর দেখা যায় সারি-সারি পোড়া বাড়ী। পথে চেনা মুখ চোখে পড়ে না। তারই মধ্যে হঠাৎ পেছন থেকে কাঁধের ওপর কার স্নেহ-স্পর্শী হাত। পান্‌ প্রফেসর ডক্টর শ— যাঁর দৌলতেই আমি ওদেশে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। ঈশ্বর যেমন তাঁকে একদিকে দিয়েছিলেন অসাধারণ বুদ্ধি এবং সংবেদন-শীলতা, হৃদয় ও মস্তিষ্কের অসচরাচর সংমিশ্রণ, তেমনি তাঁর কাছ থেকে হরণ করেছিলেন তাঁর নিতান্ত প্রাথমিক জন্মসত্ব—স্বাস্থ্য। ভারশৌএর যুদ্ধ, অবরোধ আত্মসমর্পণ কিছুই তাঁর প্রশস্ত ললাটে সামান্য বলিরেখাও রেখে যেতে পারে নি। তাঁর চোখে সেই শান্ত, দান্ত জ্ঞানীর দৃষ্টি। অধ্যয়ন-তপে তাঁর মুখে সেই সংযত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রকাশ। তবুও দেখেই মনে হলো, কোথায় যেন কী একটা মোচড় খেয়েছে। পথ্যের অভাবে তাঁর জীবনীশক্তি ক্ষীণতম। যুদ্ধের আগেই যে-মানুষকে পথে দেখা যেত না, তিনি আজ এই নিদারুণ শীতে রুটি আর আলুর খোঁজে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমায় দেখে শুধু বললেন—আপনি শহরে ফিরে আমার চিন্তার ভার দ্বিগুণ বৃদ্ধি করলেন।—এর পরে যতদিন অধিকৃত

ভরেশোঁএ বাস করতে হয়েছিল এবং যে অবস্থায়, তাতে পান্ প্রফেসর শ—র চিন্তার ভার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছিল। সহকর্মী, ছাত্র সবার সমবেদনায় তাঁর মন সর্বদা ছোট ছোট দুশ্চিন্তার আবর্তন সৃষ্টি করতো, সে কি শুধু রোগ-ক্লিষ্ট স্নায়ুর দুর্বলতা! কিছুক্ষণ পরেই আমার কাঁধ থেকে স্নেহ-স্পর্শী হাতখানি অপসারিত হলো। পান্ প্রফেসর শ— চলে যাবার পরেও বারে বারে মনে সন্দেহ জাগতে লাগলো—কিছুক্ষণ আগে যাঁকে দেখলাম সে কি সত্যিই তাঁর সশরীরী উপস্থিতি ?

ও-পাড়ার সবার সঙ্গেই দেখা হয়, এবং বারে বারে একই সন্দেহ মনে জাগে, যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো তাঁদের অস্তিত্ব বাস্তবিক কি না। বিশাল জনতার মধ্যে তাঁরা এক-একটি সম্পূর্ণ ও পৃথক্ ব্যক্তি, অথচ জীবনে তাঁদের আর যেন কোনো অবলম্বন নেই, জীবন-সংগ্রামে উৎসাহ নেই, এমন কি এক কঠোর স্বপ্ন-ভঙ্গের পর দ্বিতীয় বার স্বপ্ন-রচনার স্পৃহাও নেই। এঁদের দেখে একটি সত্যকে উপলব্ধি করেছি তা এই : বিদ্যার্থীর কাছে বিদ্যানুরাগ প্রথম প্রেম জাতীয় জিনিষ যা দৈনন্দিন অভ্যাসেও ভার্যার প্রতি কর্তব্যের আকার ধারণ করে না। এঁদের জীবনের এই যে মোহ তা কোনো মুদ্গরের সাহায্যে বিতাড়িত করা যায় না। এবং যুদ্ধ, বিগ্রহ, বিদ্রোহ প্রভৃতি সামাজিক মোহমুদ্গরে যদি সে-মোহ সত্যিই একদিন ভাঙে তো তা মুহ্যমান ব্যক্তির জীবন-নাশের কারণ হয়ে ওঠে।

প্রফেসর ডক্টর ক—র লোক-সাহিত্য ও রূপকথার বিশাল গ্রন্থ-সংগ্রহের চিহ্নমাত্র নেই। ছাপাখানায় পুড়েছে তাঁর আজীবন পরিশ্রমের ফল কয়েক খণ্ড পোল সাহিত্যের ইতিহাস। বেঁচেছে সুধু তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর দামী ফার্-কোট, যা তাঁরা সচরাচর ব্যবহারও করতেন না।

আইন-বিভাগের বাঘা প্রফেসর ডক্টর ল— বোমায় মারা গেছেন !

স্লাভ-ভাষার অধ্যাপক ডক্টর স— জেল্‌-এ।

চিকিৎসা-বিভাগের অধ্যাপক নিহত।

ছোকরা প্রফেসররা যাঁরা হাতিয়ার পাকড়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই জার্মানীতে বন্দী।

শুনি হাজার রকমের টুকরো খবর। ধ্বংস-স্তূপের ওপর দিয়ে পথ চলতে চলতে কানে আসে সহৃদয় সহকর্মীর সতর্কতা-বাণী—সাবধান, কলেগ, খুব সাবধান। ওরা রিজার্ভ্‌ অফিসারদের শেষ করেই আমাদের ওপর হাত দেবে। কারো সঙ্গে দেখা হলে বলে দেবেন, কেমন? শ্‌ শ্‌ শ্‌!

সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, গণিত, রসায়ন, কৃষিবিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস, প্রাণীতত্ত্ব, আইন, শিক্ষকতা, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, স্থাপত্য, কলা, সঙ্গীত, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, আর তার সঙ্গে আলু, রুটি, পেঁয়াজ, গাজোর, কয়লা, কাশা, ঘোড়ার মাংস, পচা ডিম, বাঁধা কোপি……কে বলে, জীবন সর্বব্যাপী নয়?

পরের দিন ভোর থেকেই আমি ফেরার। দিদির বাড়ীর দারোয়ানের গোয়েন্দা ভাইটির ফেরবার কথা। সুতরাং দিদির প্রাক্-সামরিক ওয়াফ্‌ল্, বিস্কুট, টিনের দুধ, সার্ডীন্, জরানো টক্ বাঁধা কোপি এবং সামরিক হের্‌বাতুম্ ও অশ্বমেধ মাংস, goodbye to all that! সেখান থেকে পাঁচ মিনিটের পথ আমার নতুন আস্তানা, একটি বন্ধুর ফ্ল্যাট। একটা রুক্-সাকে দরকারী সামানপত্র ভবে বেরবার সময়ে দিদি এমন একটি বিয়োগান্ত নাটিকা সৃষ্টি করলেন যা দেখে আমার নিজেরই মনে হতে লাগলো, আমি যেন কালাপানী পার হতে চলেছি। যাবার সময়ে প্রতিশ্রুতি দিতে হলো, যেন আমি গাড়ী-ঘোড়া দেখে পথ চলি, জার্মানদের সঙ্গে আড্ডা না দি, সকালে বিছানা থেকে উঠেই গরম মোজা পায়ে দি, সিগারেট না খাই, পুরোনো আ স্রা-মার ত্রিসীমানায় না যাই, রাত জেগে না পড়ি, এবং ক্ষিদে পেলেই লুকিয়ে চুরিয়ে ঝুপ্ করে এখানে চলে আসি। শোবার সময়ে শিয়রের জানালাটা বন্ধ করবার প্রতিশ্রুতিটা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই উচ্চৈঃস্বরে উর্দ্ধে নিক্ষেপ করে পথে বেরিয়ে এলাম।

পরাধীন পোলদেশে এবার আমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। পূর্ণ দুটি মাস

ধরে অহোরাত্র নিয়তির সঙ্গে লুকোচুরি। বন্ধু ভ— যুদ্ধে বন্দী হয়ে জার্মানদের অতিথি হয়েছেন। ফ্ল্যাটে থাকেন তাঁর একটি ভাই। ভ—র ফ্ল্যাটের প্রধান আকর্ষণ তাঁর অতি-আধুনিক ইংরেজী, ফরাসী আর ইতালীয় সাহিত্যের অপূর্ব গ্রন্থ-সংগ্রহ। সন্ধ্যে সাতটা থেকে বাড়ীতে বন্দী হয়ে থাকতে হলে সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া উপায় কী? নিজের লেখা একটি আঁচড় টানতে ভরসা হয় না। কারণ ধরা পড়লে আমার নিজের হাতের লেখাই আমার প্রতি অভিযোগ-তর্জনী আস্ফালন করবে নিঃসন্দেহ।

ভ—র বাড়ীতেও দিন দুইয়ের বেশী টেঁকা গেল না। একদিন রাত তিনটের সময়ে পাশের ফ্ল্যাটের দোরের ওপর গেস্তাপোর কড়া গাঁট্টার আওয়াজ কানে আসে। ওদের হাতে casse-tête বা মাথা-গুঁড়োনো গাঁট্টার অঙ্গুরীয় পরানো থাকে কি না তা কখনো চোখে দেখবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ঘটে ওঠে নি। কিন্তু সেদিন পাশের দোরে যে গাঁট্টার আওয়াজ কানে এলো তাতে এক অদ্ভুত ধাতব নিষ্ঠুরতা। দোরখানা ভেঙে পড়ে বুঝি! আচমকা ঘুম ভেঙে যাওয়াতে পুরোনো অভ্যেস মত বলতে যাই ক্বো তাম্? কে?—ভ—র ভাই ওপাশের বিছানা থেকে চুপি চুপি নিষেধ করেন—শ্ শ্ শ্! গেস্তাপো।—আমরা দুজনে অনেক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে শুয়ে থাকি। আমারই দর্শন-প্রার্থী রাতের অতিথি কিনা তাই বা কে জানে? মনে মনে দীর্ঘ প্রশ্নোত্তর খাড়া করে একটা ইজ্‌হার তৈরী করে নিই। না আমায় খুঁজতে আসে নি এরা। প্রতিবেশী বৃদ্ধার আর্ত কণ্ঠস্বর আমার ব্যক্তিগত আশঙ্কার উপশম করলেও নিতান্ত মানবিক সমবেদনায় মনটা ভারী হয়ে ওঠে। পাশের ঘর থেকে শোনা যায় উচ্চ গ্রামের জার্মান আস্ফালন আর নীম্ন গ্রামের পোল অনুনয়। হুড়মুড়িয়ে পড়ে আলমারীর দেরাজ, কাচের বাসন। শুনি, একখানা দেওয়াল-আয়না ঝন্ ঝন্ শব্দে ভেঙে

পড়লো। ঘণ্টাখানেক ধরে চলে সমস্ত ফ্ল্যাটটায় তোলপাড়, তছ্নছ্, ভাঙাচোরা, গালি-গালাজ। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে-যাওয়া জুতোর শব্দ, পায়ের কুশ-বেড়ীর ঝন্ঝনানি, বৃদ্ধার চাপা কান্না। ভ—র ভাই রিজার্ভ্ অফিসার, আমি আত্মগুপ্ত বিদেশী। ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে। ছুটে রাস্তার দিকে জানলাটায় গিয়ে দাঁড়াই। মোটা পর্দার আড়াল থেকে নীচে তাকিয়ে দেখি, ভোরের অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় কোমরে দড়ি বাঁধা দশ-পনেরোটি লোক কঠোর তুহীন হাওয়ায় ঠক্ঠকিয়ে কাঁপছে। শুভ্র, নিষ্কলুষ তুষারের ওপর তাদের জড় অস্তিত্বের ছায়া, আসন্ন মৃত্যুর প্রতিলিপি। বৃদ্ধার একমাত্র ছেলেকে ওরা কোমরে দড়ি-বেঁধে, সার গেঁথে নিয়ে গেল। নীলাভ চাঁদের আলো, চক্রবালের গায়ে ঢ'লে-পড়া শুক তারা, তুষার-ঢাকা ধ্বংস-স্তূপের ওপর দিয়ে চলে একটি দীর্ঘ সরীসৃপ রেখা…

পরের দিন রুক্‌সাক্‌-পিঠে আবার আশ্রয়ের সন্ধানে বেরতে হয়। দৈনন্দিন জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ভারও যে বড় কম নয় তা সেদিন ন্যুব্জ-পৃষ্ঠ উষ্ট্র-মুখ এই অধমের আকৃতি দেখলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হতো। পথ চলতে চলতে আবার আশ্রয় মিললো। এবার একটি বাজিয়ে বন্ধুর বোহেমীয় ফ্ল্যাটে। নীচে মাছ ও সব্জীর দোকান ওপরে আর্টের আস্তানা। আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এই দুই লোকের মাঝখানে বিলম্বিত ত্রিশঙ্কুর অবস্থা আদৌ লোভনয়ী বলে বোধ হলো না। তবুও বন্ধুর একখানি ফালতু ক্যাম্প্‌-খাট দখল করা ছাড়া গত্যন্তর দেখলাম না। এখানে ঝামেলা নেই। সারাদিন বন্ধুকে নিদ্রা দিতে হয়, কারণ তাঁর কাজ শুরু হয় রাতে। একদা যাঁর পিয়ানোফর্তের ঝঙ্কারে ও জনসাধারণের চটপটায়মান প্রশস্তি-শব্দে সঙ্গীত-ভবন প্রতিধ্বনিত হতো, তাঁকে এখন সারা রাত ধরে কান খাড়া করে জার্মান অফিসারদের খেমটা নাচের তাল ঠিক রাখতে হয়। ওঁর কাছে শুনি, জার্মানীতে জ্যাস্‌ তুলে দেওয়াতেই ওদের মনে টপ্পা-জাতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে অস্বাভাবিক ছোঁক্‌ছোঁকানি, আমেরিকার প্রহিবিশন্‌ যুগে আল্‌কহলের মত। অতি সুজন, অতি গম্ভীর এবং অতি নৈতিক বন্ধুটিকে সামান্য

জীবন-ধারণের জন্যে সারা রাত গোরাদের ক্যান্টীনে শস্তা সিগার আর কড়া বীয়ারের বিবমিষাকর গন্ধে জার্মান বালকবৃন্দ ও ইহুদী বারাঙ্গনার যুগপৎ পদবিক্ষেপের সঙ্গে খেমটা সুর বাজাতে হয়। আমি বলি, আপনি ইস্তাফা দেন না কেন এমন কাজে? শুনি, ইস্তাফা দেওয়ার অর্থ রাজদ্রোহ, ফল রাজদণ্ড।

ভদ্রলোক সারাদিন নিদ্রা দেন এবং অমি ঘুরি পথে পথে। বাড়ী ফিরে রাতটা কাটতে চায় না। পিয়ানোফর্তের ওপর বেটোফেনের কর্দম প্রতিকৃতি ম্লান বিষাদভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকে। বারে বারে মনে পড়ে, এই রাস্তাতেই যুদ্ধের সময়ে জুতো-মোজা-পরা একটি শিশুর একখানি বিচ্ছিন্ন পা চোখে পড়েছিল। জানলা খুললেই দেখি রাস্তার ওদিকে নিষ্প্রদীপ অট্টালিকা, আপাদ-মস্তক শূন্য, অথচ অন্ধকার ঘরে ঘরে যেন নরনারী, শিশুর সুষুপ্ত উপস্থিতি। সামনের বারান্দাটায় কারা এসে দাঁড়ালো না? চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যায়, একটি পুরুষ, একটি স্ত্রী। কিন্তু বারান্দাটার দুটো থাম আর চারিপাশের রেলিং ছাড়া আর যে কিছুই নেই! তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করে দিই। চোখের ভুল থেকে মনের ভুলে পৌছনো এক নিমেষের পথ। জানলা বন্ধ করে ঘরের ভেতরে অস্থির হয়ে উঠি। নীচের তলার পচা মাছ আর পচা সব্জীর অদৃশ্য গ্যাস্‌ প্রেতাত্মার মত ভেতরকার দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে যাওয়া-আসার পথ করেছে। জানলা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে একটি গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে কোথায় যেন বসে পড়ে। নিঃসঙ্গ রাত্রির একমাত্র সহচর।

অধিকৃত ভারশৌএ দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ এমন আকস্মিক যে তা দু-একদিন পরেই অসহনীয় হয়ে ওঠে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গতি ও বিরতির মাঝে পরস্পর-সংসক্ত মুহূর্তগুলি আমাদের রাত্রির শান্তি

ও দিনের সংগ্রামের পক্ষে কত প্রয়োজনীয় তা এর পূর্বে অনুভব করা যেত না। এখন সন্ধ্যা সাতটার সময়ে হঠাৎ সব বন্ধ হয়ে যায়। চারিপাশের জীবন-স্পন্দনের সহসা বিরতির সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন নিজের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়াও বন্ধ হয়ে গেল। তারপর ভোর পাঁচটায় সমস্ত শহরটার চেতনার আকস্মিক জাগরণ, স্নায়ু-পীড়িত রোগীর পক্ষে কর্কশ ঘণ্টা-ঘড়ীর মত। কোথায় সেই প্রথম-জাগা কয়েকটি মানুষের কর্মস্থলগামী পদশব্দ, রুটি-মাখন-দুধ আনবার পথে পরিচারিকাদের হালকা রস-বিনিময়, কাগজওয়ালা ছোকরাদের হাঁক, ফেরীওয়ালাদের ডাক, ইহুদী শিশি-বোতল-বিক্রীদের "হান্দেল্ হান্দেল্", তারপর বিশ্বজোড়া চেতনার সম্পূর্ণ উদ্বোধন? আর কোথায় সেই থিয়েটার, কনসার্ট্ বা বল-নাচ থেকে ফেরা তন্দ্রা-মন্থর পদশব্দ, মাঝে মাঝে চলতি ফিটনের ঘর্ঘরানি আর ঘোড়ার পায়ের পরিমিত, দ্রুত তাল, চাপা শিস্, স্বামী-স্ত্রীর কলহ, পাশের বাড়ী থেকে চুপি-চুপি কথা, তারপর ঘুমের আবেশ?

চাই শান্তি, পরিপূর্ণ শান্তি আর একাকিতা। বাজিয়ে বন্ধুর বোহেমীয় ফ্ল্যাটে ঠিক ঐ দুটি জিনিষেরই সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। সুতরাং তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধের প্রত্যুত্তরে তাঁর অতি আরামের ক্যাম্প্-খাটটি দখল করে বেশ দিন কতক কাটিয়ে দেওয়া গেল।

দিদি এসে একদিন খবর দিয়ে গেলেন—সে-বাড়ীর দারোয়ানটাকে হাত করেছি রে। এখনো সেখানে না থাকাই ভালো। তবে মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসিস্, যাতে অন্য লোকরা পরে হঠাৎ তোকে উটকো মানুষ মনে না করে।—বলে দিদি ঘরের চাবি গছিয়ে দিয়ে গেলেন। তারপর বললেন—আমি বলি কী, এই বেলা কিছু আলু-ফালু কিনে রাখ্। পরে আর পাবি নি। এখনো লুকিয়ে চুরিয়ে যা দু-দশ সের পাস্ সেখানে রেখে আসিস্, বুঝলি? শুনছি নাকি অক্যোঞ্চ্যো'র দিকে কিছু কিছু তরি-তরকারী পাওয়া যাচ্ছে। কালই যাস্, বুঝলি? কিন্তু খুব সাবধান!

দিদির আদেশ মত অতি প্রত্যুষে অক্যোঞ্চ্যো অভিমুখে ধাবিত হই।

আলু-ক্রয় পর্ব। সে যেন এক গোপনে চোলাই করা মদ বিনা শুল্কে আমদানী করার মত রোমাঞ্চক ঘটনা।

শহরের বাইরে গিয়ে বেশী দূর যেতে হয় না। এর মধ্যেই পাঁচ মাইল পথ হাঁটা হয়েছে, আরো তিন মাইল গিয়ে তবে অক্যোঞ্চ্যো। রাস্তার ওপর বোমা-খনিত একটি পুষ্করিণীর ধারে বসে ভাবি, পথ হেরি ক্ষান্ত কেন আলু কিনিবারে? আলু, আলু, আলু, আলু জীবনে অনেক

খেয়েছি, ভাজা, সেদ্ধ, চপ্‌, আলু-কাব্‌লী, আলুর দম, চিপ্‌স্‌, প্রায় সব কটা ইউরোপীয় ভাষায় আলুর প্রতিশব্দ আমার কণ্ঠস্থ, আলুর উৎপত্তি, প্রয়োজনীয়তা, অর্থনৈতিক তাৎপর্য, ইত্যাদি সম্বন্ধে রচনা, নিবন্ধ এমন কি থিসিস্‌ লিখতেও পেছপাও হতাম না, কিন্তু দৈনন্দিন আলু-সংস্থান বা আলু-সঞ্চয় বিষয়ে কখনো মাথা ঘামাতে হয় নি। সেদিন সকালে পুকুর-পাড়ে বসে আমি যখন আলুর ধ্যানে মগ্ন তখন দূরে চক্রবালরেখায় একখানি অশ্ব-শকট দৃষ্টিগোচর হলো। মরুভূমিতে জলান্বেষী ব্যক্তি যেমন নিছক প্রেরণার ওপর নির্ভর করে মরূদ্যানে গিয়ে হাজির হয় আমিও তেমনি স্রিফ্‌ প্রবৃত্তির আকর্ষণে মাইলখানেক মাঠ ভেঙে, মহাসমুদ্রে ভাসমান ভেলায় পরিত্যক্ত নাবিকের মত রুমাল উড়িয়ে, গলা ফাটিয়ে অবশেষে অশ্ব-শকটটির গতিরোধ করতে সমর্থ হলাম। বুড়ো চাষী একটুকরো খবরের কাগজে কড়া তামাক পাকিয়ে সিগারেট তৈরী করতে ব্যস্ত। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মত ক্ষীণ, কম্পমান কণ্ঠে শুধাই—গাড়ীতে আলু নাকি?—চাষী বধিরতার ভাণ করে।

হেই পানিয়ে, গাড়ীতে আলু নাকি?

সে আবার কী?

বলি, আলু নাকি?

আলু?! আলু কোতায়?

ঐ যে খড়-ঢাকা, থলে-চাপা বস্তাগুলো!—আমি অঙ্গুলিনির্দেশ করি।

ওঃ, আলু? তার হয়েচ কী?—চড়া গলায় উত্তর আসে।

হবে আবার কী? কিছু কিনবো, তাই।—প্রস্তাব করি।

কিনে হবে কী?

খাবো!—বিরক্তিভরে উত্তর দিই।

কোতায় খাবে?—সে জিজ্ঞেস করে।

কেন, বাড়ীতে।—

থাঁলেই হয়েচে। কিনবে তো কেনো। কিন্তু ও তোমায় একেনেই খেতে হবে।—সে তুহীন কণ্ঠে জবাব দেয়।

মানে ? !

মানে আর কী ? শওরে নে যাবে কে ? খাব্‌রা দেকতে পেলে ওর একটি রাকবে নাকি ভেবোচো ?

তাহলে উপায় ?—হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করি।

আমার স্বরের নৈরাশ্য লক্ষ্য করেই বোধ হয় বুড়ো চাষীর হৃদয় গলে ; বলে, উপায় আচে, কিন্তু আপনাঘোর সে ভরসা হবে কী ?

কেন হবে না ? বলোই না উপায়টা।

উপায় আর কী ? আপনাঘোর একেনে গাড়ীতে উটে বসতে হবে। আপনি সুদু নম্বা হয়ে শুয়ে পড়বে মুড়িসুড়ি দে। পতে খাব্‌রা ধল্লে বলবো, আমরা খালি গাড়ী নে শওরের ভেতর দে কী বলে তোমার সেই প্রাগা ছাইড়ে উদিক বাগে চলিচি ভার্‌শাভার জন্যে কিছু তরিতরকারী নে'সতে। তারপর শওরে ঢুকে এ-গলি সে গলি দে তোমার ওকেনে পৌচে দোবোখন।

তা, তোমার আলু কতটা আছে হে ?—জিজ্ঞেস করি।

চাট্টিখেনি, আধ কঝেৎস্‌-টাক* হবে।

দিতে হবে কত ?

এক শ-খানি জ্‌লতীরা† একটি গ্রশ্‌ ছাড়তে পারবো নি বাবু। শওরের দোকান হলে তিন শ-খানির কম হতো কী ? তাও পেলে পারে হয়।

* কঝেৎস্‌—১০০ কিলো—২।০ মণ। চাষাদের হিসেব।

† জ্‌লতী—।০

আর কী আছে হে ?

প্যাজ, কিলো বারো।

চাষীর ব্যবসা-বুদ্ধি তখনো পাকে নি। সুতরাং দরদস্তুর না করেই তার ইশারা মত গাড়ীতে উঠে খড় আর খালি বস্তা-ঢাকা আলু আর পেঁয়াজের থলে তিনটের ওপর সটান হয়ে শুয়ে পড়লাম। ভীও, ভীও, হেৎতা !—বলে চাষী গাড়ী হাঁকিয়ে দিলে। খানিক পরে আমার দিকে তাকিয়ে বলে—তোমার মুকখেনা বাপু মোটেই সুবিদের নয়। তুমি বাপু ঐ চটখেনা মুড়ো-পাশতলা মুড়ি দে শোও। তোমায় আমাদেরই একজন চাষাভূষো বলে চালাতে বেগ পেতে হবে দেকতে পাচ্চি। আলু কিনতে এয়োচো তা আবার দাড্‌টে কামিয়ে, ফিট্‌ফাট্‌ হয়ে আসা কেন্‌রে বাপু! – ঐ অসহ্য শীতে জমে-যাওয়া ভিজে চট মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকার অভিজ্ঞতা কখনো ভুলবো না। বাইবেব হাওয়া পর্যন্ত যেন জমে উঠে অভ্রের মত মচ্‌মচ্‌ করছে। কিছুক্ষণ পরে ভেতরে আমারই উত্তাপে চটের গায়ে লেগে-থাকা বরফ গলে আমাব ওভার-কোট এবং পোষাক ভেদ করে সর্বাঙ্গে ঝরণা ঝরতে শুরু করলে। তবুও যে দেড় মণ আলু আর বারো সের পেঁয়াজ-রূপ মুল-ধনের ওপর শায়িত হয়ে চলেছি তার আনন্দ যাঁদের টাকার গদির ওপর শোয়া অভ্যেস তাঁরাও কল্পনা করতে পারবেন না। বড় বড় লালচে রঙের হৃষ্টপুষ্ট বস্তিবাটীর আলু, তার এক-একটির ওপর এক-একটি সনেট লেখা চলে।

খানিকদুর গিয়ে চাষী বলে—পানিয়ে সামনেই ভাঁটি, শিকি বোতল-টাক না খাওয়ালে শ্বাব্‌দের তাপ্পি মারবো কী ভরসা নে ?

তথাস্তু।

এবং শিকি বোতলের পরিবর্তে সেদিন সত্যিই আমি আমার জীবন ফিরে পেলাম। শহরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই চটের তলা থেকে শুনি—

এই, ভ্রোইীন, কোথায় চলেছো ?—মেশিন-গানের গুলীর মত রুষ্ট কণ্ঠস্বর।

চাষী বলে—যাবো আর কোতা ? ছেলেবেলা থেকে স্বপন দেথতুম তোমাদের দেশটো একবার গে দেকে আসবো। তা আর হলো কৈ ? বলে নাকি তোমাদেঘরের যেমন বীয়ার তেমনটি নাকি কোতাও পাওয়া যায় না। ভাবতুম, একবার গে তোমাদেঘরের ঐ বীয়ার একটু চেকে আসবো, তা পানিয়ে সে আর হলো কৈ ? একোন, এই তোমার গে একটু-আদটু ব্যাবসাটা-বাণিজ্যিটা করে বেড়াই আর কী! তার তোমার গে জিনিষপত্তরের যেরকম দাম হয়েচে, তা মান্‌ষে কিনবে কী ? তবুও ছেলেটারে নে বেইরেছিনু বলি, উদিক বাগের ঐ গ্রহুফ্‌-ট্রহুফ্‌ অঞ্চল থেকে এই আলুটো-মূলোটো নে'সে যদি শওরে বেচতে পারি। তা, মা মারীয়ার ইচ্ছে অন্যরকম। এই দেকো না পতে আসতে আসতে ওটার হলো টাইফয়েড্‌···

ভাস্‌! তিফুস্‌?!

য়া, য়া, তিফুস্‌। ঐ দেকো না মুড়ি দে পড়ে আচে, ওর আর জ্ঞান-গম্যি নেই।

তিফুস্‌!!!

য়া, য়া, তিফুস্‌, একোন তাড়াতাড়ি শওরের ভিদ্‌রে দে উদ্দিশ্বাসে গাড়ী হাঁকিয়ে ওপারে গে পড়লে বাঁচি। যে ছোঁয়াচে রোগ, তাই ভয় হয় আর কার আবার না হয়।

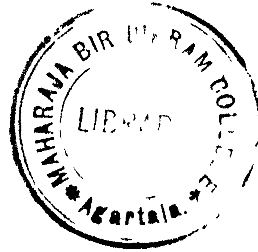
জার্মান সাস্ত্রী সসম্মানে পশ্চাদপসরণ করে, বলে—তিফুস্‌! আবের গেহেন জী শ্নেল্‌, তাড়াতাড়ি যাও, সটান ঐ রাস্তা ধরে, শহরের ভেতরে ঢুকো না কিন্তু।

চাষী জিভ কেটে বলে—সে আর বলতে হবে না পানিয়ে, ছোঁয়াচে রোগ, কার কখন কী হয় কে বলতে পারে ?

কুলুটুব্‌কাম্‌প্ক্‌

চাবুকের ঘায়ে চাষীর ঘোড়া পক্ষিরাজের আকার ধারণ করে।

তারপর পাঁচতলার ওপর ছোট্ট ঘরখানিব সামনে দালানে দিদিব রাখা কাঠের সিন্দুকে জমে যুদ্ধোত্তর যুগের অভিনব bancor, দেড় মণ বড় বড় লালচে রঙের বস্তিবাটীব আলু আর বারো সের পেঁয়াজ, বসন্ত উৎকলীরা যাব নাম দিয়েছে বসকলা।



আবার যৌবন ফিরে পেলাম নাকি ? কিংবা হয়তো বাজিয়ে বন্ধুর বোহেমীয় হাওয়া গায়ে লেগে এলো la deuxième jeunesse ! ভিড়ের মাঝে ঐ অপূর্ব সুন্দর কুমারী মুখ দেহে কামনা জাগায় আর মনে তস্কা*। অনুসরণ-প্রবৃত্তি এখনো চাঙ্গা, তবে তা এখন কেমন যেন উদ্দেশ্যহীন। তবু হয়তো শুধু সৌন্দর্যের আকর্ষণে সে কাছে টানে। বয়েস উনিশ-কুড়ীর বেশী হবে না। রূপকথার সাগর-কন্যার মত সোনালী চুল আর মাটীর আমেজ-লাগা সমুদ্রের জলের মত ফিকে নীল চোখ। শৈবালের রহস্যময় ছায়া-ভরা তার দৃষ্টি। অধরোষ্ঠে প্রথম যৌবনের গোপন আত্মসমর্পণশীল আমন্ত্রণ। তার সঙ্গ বা সান্নিধ্য কিছুই চাই না, অথচ তার অনুসরণ করি। সকালে রুটি-শিকারে বেরিয়ে হরিণীর সাক্ষাৎ ! বয়েসের অঙ্ক ভুলে গেছি।

ভিড়ের মধ্যে ছোট ছোট আবর্তন, কেউ কেনে একপাতা সেফ্‌টী-পিন্, কেউ জুতোর ফিতে, কেউ ছাতার রিং। পথে ঐ-জাতীয় পণ্য-দ্রব্যের প্রাচুর্য দেখে মনে হয় যেন ওগুলো এদের জীবন-ধারণের পক্ষে অপরিহার্য। মানুষ তার জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় আহার্যের সংস্থান

* রুশ-ভাষায় অবর্ণনীয় বিরহ-বিষাদ।

করতে না পারলে যে ছোট ছোট টুকি-টাকি জিনিষ দিয়ে নিজেকে ভোলাতে চেষ্টা করে তা লক্ষ্য করবার মত। মেয়েটি কিন্তু একবারও থামে না। দুপাশে ফেরীওয়ালাদের গলায় ঝোলানো বাক্সে অতি লোভনীয় ব্রূচ, ভ্যানিটি-কেস, রঙিন চিঠির কাগজ, ল্যাভেণ্ডার, কন্‌ভালিয়া, নাং‍সীস্‌, কোনো দিকে তার দৃষ্টি নেই। সে যেন কী এক অদৃশ্য আদর্শকে লক্ষ্য করে রাস্তার পর রাস্তা অতিক্রম করে চলে।

অসীম জনতার মধ্যে সে হারিয়েও যায় না। হাজার হাজার মানুষের মাঝে সে একক। সদ্য-ইস্কুল-ছাড়া মেয়েদের মত তার মুখে বিস্ময় আর কৌতুক, তার অধো হাসিটি হাল্‌কা ব্যঙ্গের ছোঁয়াচে কেমন যেন নৈর্ব্যক্তিক অথচ দুষ্টামি-ভরা। তার চলার ভঙ্গিটি ভারী চপল, মনে হয় তার পা-দুটি যেন প্রিমা বালেরীনার মত ক্ষণে ক্ষণে শুধু মাটী ছুঁয়ে চলেছে। আর তারই তালে তালে তার কাঁধ-দুটির দ্রুত, লীলায়িত উত্থান-পতন। ঐ একটি নারীদেহে যেন পুরুষের সকল কল্পনা রূপ গ্রহণ করেছে। তার মুখের টঙ্কিত একাগ্রতা দেখে সন্দেহ হয়, তার মন স্বাভাবিক আছে তো? কী এক অবিরাম, অবিশ্রান্ত গতির নেশা তাকে যেন পেয়ে বসেছে। যেন একটি গোপন স্ফুরণের চেতনায় মাতাল ঐ মেয়েটি নৃত্যের তালে দেহ দুলিয়ে পথ চলে ক্রোশের পর ক্রোশ, কোন্ গতি-বাহনী আৎলান্তা!

হঠাৎ সে ফিরে দাঁড়ালো, রাস্তা পার হয়ে ওদিকে যাবে। বিধাতার এ কী নিষ্ঠুর পরিহাস! তার যে একটি পা নেই। কাঁধের নীচে খঞ্জের যষ্টি, একখানি পা, একপাটি জুতো আর তার ঐ অপূর্ব সুন্দর কুমারী মুখ!

জীবনে যা নিতান্ত সাধারণ জিনিষ ছিল তাই হারিয়ে যেন ওর মনে সত্যিই পথ চলার নেশা লেগেছে।

ও-জিনিষ শীতের দেশে একটু-আধটু সবাই খায়।

তবে সেদিন তার মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল। বাইরে কঠোর শীত আর কুশ্রী নগ্নতা, ভেতরে মানুষের দেহের সঞ্চিত উত্তাপ আর উষ্ণ, তরল আগুনের মত ভূদ্‌কা; বাইরে পরাজয়ের ব্যর্থতা, ভেতরে হৃদয়-জয়ের মাদকতা। এ অবস্থায় ভাঁটি ছেড়ে বাড়ী যেতে হলে যে-পরিমাণ চরিত্রের বল দরকার তা হয়তো তার ছিল না। কিংবা হয়তো সেইটাই তার সবলতা। অন্যান্য যুদ্ধ-ফের্তা অফিসারদের মত সে মন-মরা হয়ে পালিয়ে বেড়ায় নি। আপাদমস্তক নিখুঁত সামরিক উর্দি এঁটে ভাঁটিতে ঢুকেছিল। তারপর সে পরাজয়ী মনোবৃত্তিকে জয় করতে চেয়েছে পাত্রের পর পাত্র ভূদ্‌কা দিয়ে। তার স্ত্রী খবর পেয়ে যখন তাকে বাড়ী নিয়ে যেতে এলো তখন আর তার চেতনার রেশমাত্র নেই। কাঠের গুঁড়ো ছড়ানো, গলা বরফের জলে ভেজা মেঝের ওপর নির্বিকার চিত্তে সটান হয়ে শুয়ে পড়েছে।

ঐ অবস্থাতেই তার স্ত্রী তাকে বাড়ী নিয়ে চলেছে। আল্‌কহলের প্রক্রিয়ায় শিথিল মাংস-পেশী-স্নায়ুর দুর্নিয়ন্ত্রনীয় তারল্যকে একত্র করে স্বামীরূপী অস্তিত্বটিকে গুছিয়ে সামলে বাড়ী নিয়ে যেতে যেতে মেয়েটি

হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল। একটা কাঁধের ওপর তার সমস্ত ভার গ্রহণ করে জমাট তুষারের ওপর দিয়ে কোনোমতে টেনে নিয়ে চলে। বেহুঁস অবস্থাতেও স্বামী বাড়ী যেতে রাজী নয়। বিজেতার ওপর আক্রোশ, দৈনন্দিন অত্যাচারের প্রতিশোধ-স্পৃহা, আগামী কালের অন্নচিন্তা, ভবিষ্যতের নৈরাশ্য সব এক হয়ে বেচারী স্ত্রীর ওপর অভিমানের আকার ধারণ করে কী উপায়ে, আশ্চর্য! সে বাড়ী যাবে না, যাবে না যাবে না, অমন বাড়ীতে আগুন লেগে যাক্‌, অমন স্ত্রীর সে মুখ দেখতে চায় না, যে-বাড়ীতে এক ফোঁটা মদ নেই সে-বাড়ীতে ঘুঘু চরুক্‌, যে-স্ত্রী তার স্বামীর মদের বোতল ভেঙে দেয়, সে-স্ত্রীর সঙ্গে পথের বেশ্যার তফাৎ কোন্‌খানে শুনি, সে যাবে না, যাবে না, যাবে না···বাঁ হাত দিয়ে সে শূন্যে চক্কর কাটে, তারপর আবার বেহুঁস হয়ে পথ-চলার গতি-স্রোতে গা ঢেলে দেয়। পথের লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিপন্নী কাটে, হাসে, উপহাস করে, কঠোর শীতে মেয়েটির চোখের জল তার গালের ওপর দুটি শাদা পুঁতির মত জমাট বেঁধে যায়।···সে সব খবর রাখে, অমন স্ত্রীর মুখে আগুন, না খেয়ে না মরে পয়সা চাইতে লজ্জা করে না? বেহায়া, বেশ্যা, আবার বলা হয়, ছেলেবেলাকার বন্ধু! জানি, জানি ও-সব ছেলেবেলাকার স্যাঙাতদের, হলেরা *, ছেলেবেলাকার বন্ধু, তা তাকেই বাপু বিয়ে করলি না কেন, তাকে ছেড়ে আমায় বিয়ে করা হলো, আর তলে তলে তার সঙ্গে, হলেরা, তুই খেতে না পাস্‌, তোর নিষ্কর্মা ভাতারের মদের পয়সা না জোটে তো তুই তাই বলে ওর কাছে গিয়ে হাত পাতবি? মুখে আগুন, মুখে আগুন, আর তাকে যদি আজ পেতাম হাতের কাছে, তো দেখিয়ে দিতাম, কেমন সড় করে মদের পয়সা জোটানো, আমি, পোলী ফৌজের ক্যাপ্টেন, আমার আত্মসম্মান নেই! হলেরা! ছেড়ে

* কলেরা—কটু-উক্তি।

দে আমায়, বেহায়া, বেশ্যা !···মেয়েটি ঠোঁট কামড়ে চোখের জল চাপতে পারে না। আর দু-পা, ঐটুকু পথ পার হলেই তো তাদের বাড়ী, বাড়ীতে মারুক, ধরুক, খুন করে ফেলুক, কিন্তু পথের মাঝে, হায় ভগবান, এ কী শাস্তি ! তার স্বামী আবার অবশ বাঁ হাত দিয়ে শূন্যে চক্কর কাটে। হাতটা আবার কার গায়ে লাগলো, হ্যাঁ লাগলোই তো !

সকালে প্রচুর আহারের পর প্রচুর বায়ু সেবন করবার জন্যে, তুহীন-নির্মল আবহকে প্রচুর সিগারের ধোঁয়ায় কলুষিত করে শফরে বেরিয়েছে প্রচুর আয়তনের জার্মান সৈনিক। মাতালের আল্‌কহল্‌-বিবশ, শূন্যে-চক্কর-কাটা হাতখানা তার দৈহিক প্রাচুর্যের সীমান্ত অতিক্রম করেছে! ব্যক্তিগত অপমান, অবমাননা সমগ্র জর্মান ফৌজ, নাৎসী দল এবং স্বয়ং ফ্যুরেরের ! শ্বাইনের-হুন্ট্ !—রুক্ষ, রুষ্ট কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শুনি পিস্তলের খেঁকী আওয়াজ। মাংস-পেশী-স্নায়ুর একটি তরল স্তূপ পথের ময়লা বরফের ওপর ছড়িয়ে পড়ে। মনে আছে মেয়েটির সেই ভীতি-বিহ্বল চাহনি, নির্বাক্ প্রতিবাদের বহ্নিতে ওজস্মান, অধীর আত্মগ্লানিতে ক্লেদাক্ত !

ওদিকটায় এখনো যাওয়া হয় নি।

রাস্তার নাম নভ্যী শ্বাং, নয়া দুনিয়া। এই রাস্তাতেই ছিল ইংরেজ রাষ্ট্রদূতের আবাস ও দফ্তর-খানা। আলেয়ে য়েরজলীম্স্কিয়ে-র মোড় থেকে সোজা মাইলখানেক জুড়ে যেন একটি সমগ্র বিশ্ব। বাণিজ্য ও বসতির সমাবেশ, বড় বড় ইমারৎগুলোর ভেতর দিয়ে রাস্তা-ঘাট, অলি-গলি, দোকান-পসার। আধুনিক পোলদেশের সংস্কৃতির কেন্দ্র বলতে এই নভ্যী শ্বাং। এর দু-পাশে ভারশোএর নামজাদা প্রকাশকদের আফিস, বইয়ের দোকান। আঁকিয়েদের সালঁ, বাজিয়েদের আখড়া, গাইয়েদের বাসা, নট-নটীদেব দিবানিদ্রার আস্তানা, লিখিয়েদের মেত্রেস্-পরিচালিত গৃহাশ্রম, পটুয়াদের হুরী-পরী-পরিবেষ্টিত স্বর্গপুরী; লোক-শিল্পের কাঠের খেলনা, কারুকার্য-করা বাক্স, ট্রে, প্রতিমূর্তি, গালচে, সতরঞ্চি, রঙদার কম্বল, হাজার রকমের মনোহারী টুকিটাকি; নক্সা-কাটা কাচের বাসন, সেকরা এবং কাঁসারীদের হাতের তৈবী হাজার রকমের অলঙ্কার এবং শখের জিনিষ, উৎকৃষ্ট দর্জিদের ওস্তাগরখানা, নাচের ইস্কুল, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই রাস্তাতেই ছিল মস্কৌ আর্ট থিয়েটার দলের একটি ছোট্ট রুশী থিয়েটার, যেখানে মূল রুশ ভাষায় গোগোল,

চোহফ্‌, অস্ত্রফ্‌স্কি প্রভৃতির নাটক দেখবার জন্যে দেশ-দেশান্তর থেকে লোক আসতো। কাছেই ছিল সার্কাস এবং সিনেমা-গৃহের অন্ত ছিল না। এমনকি মার্কিনী catch-as-catch-can নামক কুস্তীর আড্ডাটিও ছিল এই পাড়াতেই। "নয়া দুনিয়া" সড়ক ছিল ভোজন-বিলাসীদের একটি বাস্তব ভূস্বর্গ। ব্লিকুলে-র মিষ্টান্ন-ভাণ্ডার আর হির্শ্‌ফেল্ডের delikatessen-বিপণির ঠিকানাও উলীংসা নভ্যী শ্বাং। ভল্‌গা-র কাভিয়ার, নিস্‌-এর শামুক, বুলঞ্‌-এর গল্‌দা চিংড়ী, ত্রিয়েস্তের সামুদ্রিক উপ-জন্তু, চিল্কা-জাতীয় কাঁকড়া এবং ও-দেশী সর্বোৎকৃষ্ট "রাকি" বা cray-fish পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে আস্বাদন করবার শখ যদি কারো হতো তো তাকে পান্‌ হির্শ্‌ফেল্ডের দ্বারস্থ হতে হতো। তাছাড়া থিয়েটার থেকে বাড়ী ফেরবার আগে পরস্পর-বাহুবদ্ধ অবস্থায় পাদচারণ, কাফি-পান বা ম্যুদ্* বা মধু-আহরণ-প্রয়াসী যুবক-যুবতীকে এ-পাড়ায় আসতেই হতো। তৃণ-বিপত্নীক এবং তৃণ-বিধবাদের আহার-বিহারও যে এই সড়কটিতেই সম্পন্ন হতো তা বলাই বাহুল্য। এক কথায়, দিনের ও রাতের ভারশৌএর আসল চেহারা ছিল এই নভ্যী শ্বাং।

নভ্যী শ্বাতের ধ্বংস-লীলা কাঁচা হাতের কাজ। যে রাষ্ট্র-দূতাবাসটিকে ভাঙবার জন্যে অতগুলো বোমা খরচ করা হয়েছে, ঠিক সেটি ছাড়া আর প্রায় সব বাড়ীগুলোই দস্তুরমত চোট খেয়েছে। অবশ্য এও হতে পারে যে, ইংরেজদের সঙ্গে একটা মিটমাট হয়ে যাবার আশাতেই হয়তো অতি সযত্নে এই বাড়ীটিকে বাঁচানো হয়েছে। কারণ এখান থেকে মাইলখানেক দূরে অবস্থিত ফরাসী দূতাবাস ও কঁসুল-খানা দুটি নিখুঁত ভস্মস্তূপে পরিণত হয়েছে। টিপ করে বোমা ফেলে যে

* মধু থেকে তৈরী মদ।

বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যস্থলকে ভাঙা যায় তার পরিচয় শহরে অনেক পাওয়া গেছে। তাছাড়া লক্ষণীয় বিষয় এই যে ভারশৌএর জার্মান দূতাবাস, মার্কিনী দূতাবাস, ইতালীয় দূতাবাস এবং অন্যান্য সমস্ত কন্‌সুল-থানা রেহাই পেয়েছে।

নভ্যী শ্বাতের যুদ্ধোত্তর রূপ সে এক উন্মাদের পবিকল্পনা।

জায়গায় জায়গায় পথের মাঝখানে চারতলার সমান ধ্বংসস্তূপ। দু-পাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ীগুলো পথের ওপর একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। ইট, কাঠ, কড়ি, বরগা, চূণ, সুরকি, টেবিল, চেয়ার, আলমারীর ভগ্নাংশ, কাচের বাসন, ছবি, জামা, কাপড়, জুতো, কমোড সাফ করবার বুরুশ, বাহাবে লেডীস্ আম্ব্রেলা, পাউডার-কেস, ফুলের টব, দেওয়াল-আয়না, মরা বেড়াল, নর নারীর বিচ্ছিন্ন দেহাংশ, মাথার খুলী···সে এক অভিনব "বৃহৎ অট্টালিকা চূর্ণ।" তার উপাদানের তালিকা প্রস্তুত করা স্বয়ং চরকেরও অসাধ্য। অবিরত জনপ্রবাহে তার ওপর দিয়ে স্বাভাবিক পায়ে-চলার পথ তৈরী হয়েছে। ট্রামের লাইনগুলো জায়গায় জায়গায় সমান শূন্যে উঠে গেছে। প্রকাণ্ড বাড়ীর তিনতলায় প্রকাণ্ড গাড়ীবারান্দার থামগুলো ভেঙে পড়েছে; শূন্যে-ঝোলা বারান্দা পথ চলা মানুষের মাথার ওপর যেন বাবিলনিয়ার বিলম্বিত উদ্যান। সারি সারি বে-আব্রু আধো-ভাঙা ইমারৎ; ত্রি-প্রাচীর রঙ্গমঞ্চের মত এক-একটা ফ্ল্যাটে অভিনিত হচ্ছে পারিবারিক নাটক-নাটিকা। দেখতে মন্দ লাগে না। চোখে পড়ে ওদের চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, কলহ-কূজন, বুড়ী ঠাকুরমা মোজা বোনেন, ঠাকুর্দা পড়েন সংবাদপত্র, গৃহিনী পাকশালায় স্থপের লাবণ্য পরীক্ষা করবার জন্যে সস্-প্যান্ থেকে এক চামচ গালে ফেললেন, আহারের সংস্থান করতে না পেরে একটি লোক স-বুট এবং স স্যুট সটান বিছানায় শুয়ে

পড়লো, "রান্দেভূ"-কামী একটি ছোকরা অপরিসীম ধৈর্যে কামায় দাড়ী, ভাঙা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটি ছোট ছেলে পথের জনতাকে লক্ষ্য করে ভেংচি কাটে……

নভ্যী শ্বাৎ চূর্ণ হয়েছে। কিন্তু ঐ ভাঙা দুনিয়ার ওপর কেমন করে আবার জীবন গজিয়ে উঠেছে, আশ্চর্য! পথের ইট-পাট্কেল সরিয়ে আধো-ভাঙা ঘরে খোলা হয়েছে রেস্তোরাঁ, কাফিখানা, ধূমাচ্ছন্ন অন্ধকারে অশ্ব মাংস-সুবাসিত পাঁচ আনার সুপের থালা বা ভাজা যব গুঁড়নো দু-আনার কাফি অথবা হের্বাতুমের পেয়ালার সামনে বসে শত শত মানুষ আবার আড্ডা জমিয়েছে। খোশ গল্প, হাসি-ঠাট্টায় নিকটতমের সদ্য বিয়োগের শোকও যে কোথায় ধোঁয়া হয়ে উড়ে যায় তার ঠিক-ঠিকানা নেই। দাবার সর্বহারা মনোযোগ, দমিনোর মার প্যাঁচ আর ব্রিজের অনুমান-প্রয়াসে কী যে মাদকতা আছে, জানি না, তবে দেখি ওরা পরম পরিতৃপ্তির সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আহার-নিদ্রা ভুলে ঐ নিয়ে মেতে আছে, এবং খেলা সাঙ্গ হলে তারই আলোচনা করত করতে যে-যার বাড়ী চলেছে। তাশের দাম অসম্ভব রকম কমে গেছে।

বড় বড় খাবাবের দোকান-কটাব প্রায় সবগুলোই বেঁচে গেছে! প্রেক্ষণ-বাতায়নের ভাঙা জায়গাগুলো কাঠ দিয়ে ঢাকা থাকলেও বাইরে থেকে কাচের ওপর নাক ঠেকিয়ে ভেতরকার প্রায় সবটুকুই দেখা যায়। চোখে পড়ে সারি সারি থালায় সাজানো কাভিয়ার, গল্দা চিংড়ী, আর গলায় কাগজের ঝালর-দেওয়া শোরের মাথা; জেলির ভেতর খচিত শ্‌চ্পাক্-মাছ, অম্লরসে অনুষিক্ত মিনগি-মাছ আর ভিনিগারে জরানো কুণ্ডলীকৃত রল্মপ্স্তী *। টেবিলের ওপর বাষ্পায়মান খাদ্য-সম্ভার, "অর্ দ্যভ্র্-এর সমারোহ, বড় বড় জগ ভরা হাবের্বুশ্ ও শীলে-র

* হেরিঙ্-মাছের দাগা।

অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্ণাভ বীয়ার, রাশিকৃত ফলাহার্য এই যুদ্ধোত্তর যুগে হঠাৎ কোনো দক্ষ শিল্পীর আঁকা "সুপ্ত প্রকৃতির" ছবি বলে ভ্রম হয়। ভুল ভাঙে যখন দেখি বিশাল-বপু অধিকারিবৃন্দ ছুরী আর কাঁটার সাহায্যে আলেখ্যগুলির খণ্ডিত অংশ আপন আপন ব্যাদিত মুখবিবরে সশব্দে চালান করে অধরৌষ্ঠের বীয়ারের ফেণা জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে তৃপ্তিসূচক ধ্বনি উদ্‌গার করছে। দিনে-দুপুরে জ্যাসের খেমটা। কোন্ হাওয়াই-সুন্দরীর মেঘবরণ চুল আর ভ্রমরকৃষ্ণ আঁখিতারার বিবরণ-বহুল গানের তালে তালে যুগপৎ পদবিক্ষেপ, আসন্ন সম্ভাবনায় কণ্টকিত পরস্পর-বিলম্বিত ডয়েচ্‌ ও ফল্‌ক্‌-ডয়েচের * বপুযুগল, ছ-গিরে পরিমাণ সিগারের গাঢ় ধোঁয়া, কোণে কোণে ভালো-মানুষ চেহারার গেস্তাপোর ফিস্‌ফিসিনি, অফিৎসের ও উণ্টের্‌-অফিৎসেরের গাড়োয়ানী ইয়ার্কি, অসংযত উল্লাস, মেঝের ওপর মুখামৃত ত্যাগ করে ভোঁতা বুট দিয়ে লেপে দেওয়া, পথের ক্ষুধিত জনতার প্রতি লক্ষ্য করে শস্তা মস্করা অশনগৃহগুলিকে এক অপূর্ব নয়া বন্দোবস্তের বেহেস্তে পরিণত করেছে।

নাৎসীদের ছড়া-কাটা গানঃ বিজিত দেশের তালিকা, তারপর und morgen die ganze Welt. কাল যে সমগ্র সসাগরা ধরাখানা একখানি সরার মত তাদের বুটের তলায় গুঁড়িয়ে যাবে তারই বার্তা দক্ষিণে, বামে, উর্দ্ধে এবং অধোদেশে ঘোষণা করতে করতে ওরা রাস্তা-জোড়া ঐ প্রকাণ্ড ভগ্নস্তূপটার ওপর এসে পড়েছে। তাদের গতিরোধ করে একখানি হাত। ইটের গাদা, রাবিশ্‌ আর ভাঙা আস্‌বাব্‌, তার ওপর তুষারের প্রচ্ছাদন। যেন তুষারের ভেতর থেকে ঐ হাতখানি ফুঁড়ে বেরিয়েছে। আপন নির্জীবতায় কঠোর, বিবর্ণ, কিন্তু তার আঙুলের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে কী এক অশুভ সঙ্কেত, তার ঐ নিশ্চল উত্তোলনে কী এক

* জর্মান উৎপত্তির পোল বা বা অন্য জাতি।

কুলটুব্‌কাম্‌প্‌ফ্‌ -

মূক অভিশাপ। রবত-মানুষদের পা টলে, তাদের যান্ত্রিক মুখোসের ওপর দেখি আতঙ্কের ছায়া, ভেতরে ভেতরে ওদের যেন সঙ্কল্প-চ্যুতি ঘটেছে।

ঘুরতে ঘুরতে উলীৎসা শ্পিতাল্নায় এসে পড়েছি। দোকানটার বড় কাচখানা ফেটে গেছে, এ-ছাড়া তার আর কোনো ক্ষতি হয় নি, এমনকি চারি পাশের আগুনের আঁচ আর ধোঁয়ার কালিমাও ভেতরের ছোট ছোট এক্সতিক্ গাছগুলোকে স্পর্শ করতে পারে নি। আধুনিক ফ্ল্যাট সাজাবার জন্যে রং-করা ছোট ছোট কাঠের টবে পঞ্চাশ রকমের দূরবীক্ষণী কাক্তুস্ এ-জায়গাটাকে একটি অপূর্ব বামনদের রাজ্যে পরিণত করেছিল। তাছাড়া নিদারুণ শীতের দিনেও টাট্কা সাসান্কা,* মিমজ়া, লিলি বা প্রথম প্রেমের মত টকটকে লাল গোলাপের অন্বেষণে শহরের মানুষকে এইখানেই আসতে হতো। আশ্চর্য, যুদ্ধোত্তর যুগেও সেখানে পূর্বের মত ফুলের সমারোহ। অত বড় প্রলয়ের পরেও এরা আগের মতই জঠরের বুভুক্ষাকে উপেক্ষা করে মনের খোরাক নিয়ে মাথা ঘামায়। খুব কাছেই পাকুল্স্কির মুদীর দোকানে কণামাত্র আহার্য না পেয়ে দেখি এরা ফুলের দোকানে এসে মনের ক্ষুধা মেটায়। যাদের সংস্থান নেই তারা বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাজানো ফুলের শোভা দেখে, কোন্টা কিনলে কোন্খানে রাখা চলতে পারতো তাই নিয়ে আলোচনা করে,

* Anemones ফুল।

মতদ্বৈধ ঘটলে পরস্পরের ওপর অভিমান করে, অবশেষে কলহ-বস্তুটিকে খরিদ করে হয় মানভঞ্জন।

ওরা দুটিতে অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়েছিল। বুভুক্ষাশীর্ণ মুখ মেয়েটির, ছেলেটির যুদ্ধে একটি হাত গেছে। যুদ্ধের ঠিক আগেই হয়তো এদের বিবাহ হয়েছিল, এদের ভাবভঙ্গিতে এমন একটি অভিব্যক্তি যা লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, এরা পরস্পরের সান্নিধ্য লাভ করেছে অথচ বিবাহিত জীবন দৈনন্দিন জীবনে পরিণত হয় নি। জানলার কাচের ওপর আঙুল ঠেকিয়ে ওরা এক-একটি ফুলের প্রতি পরস্পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছেলেটি বলে—একটু দাঁড়াও তো, আমি এক্ষুনি আসছি।—মেয়েটি তার জামার আস্তিন টেনে ধরে কৃত্রিম কোপের সহিত শাসায়—খবর্দার নয়, ওসব কিনে পয়সা নষ্ট করো না বলছি।

ঐ ছোট্ট ভায়লেটের গোছাটিও নয়?—ছেলেটি মিনতি করে।

ফিয়ল্‌কি! * কী হবে?—মেয়েটি একটি ছোট্ট moue সহ মেকি ঔদাসিন্য প্রকাশ করে।

যদি নিজের হাতে পরিয়ে দিই?

হাত! ওর যে একটিমাত্র হাত। মেয়েটি আর আপত্তি করতে সাহস পায় না। বলে—দুষ্টু, ঐ মতলব করে এদিকে আসা হয়েছিল বুঝি?

ওরা দুটিতে দোকানে ঢোকে। যখন বেরিয়ে এলো, তখন দেখি মেয়েটির কালো টুপীর একপাশে ছোট্ট ফিয়ল্‌কির গুচ্ছটি পিন্‌ দিয়ে আঁটা। তার মুখের চেহারা একেবারে বদলে গেছে। শীর্ণ গালে হাসির টোল পড়েছে, কালি-পড়া চোখে উচ্ছল খুশী, চলনে বালিকা-সুলভ চাঞ্চল্য, বলনে প্রগল্‌ভতা, মুখটি ওপর দিকে তুলে ধরার মধ্যে একটি অসংযত

* ভায়লেট।

মন-ভাঙানো কোকেৎরী। ওরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে পরস্পরের চোখের দিকে তাকায়। এত আনন্দ ওরা রাখবে কোথায়?

পথ দিয়ে হল্লা করতে করতে চলেছে হিট্‌লারী দুলালের দল। কাঁধে বিদ্যুৎ আঁকা, হাতে ছপ্‌টি, বয়েস সতেরো, আঠারো, উনিশ, যে-বয়েসে মানুষ কবিতা লেখে, প্রেমে পড়ে এবং নারীর সম্মান রক্ষা করবার জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করে না। ঐ বয়েসেরই একটি ছোকরা মেয়েটির কাছ দিয়ে যাবার সময়ে হাতের ছপ্‌টি দিয়ে তার মাথার টুপীটাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেল। সঙ্গীরা চীৎকার করে হাসে, টিপ্পনী কাটে, উচ্চৈঃস্বরে সম্ভোগের সম্ভাবনার হিসেব করে। পথের জনস্রোতে অস্ফুট মর্মরধ্বনি, প্রতিবাদের সাহস নেই কারো, অনাহারে স্নায়ু দুর্বল। ছেলেটির বাঁ হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়, মেয়েটি মৃদু স্পর্শে নিষেধ জানায়। তারপর ওরা দুজনে মুখে অপ্রতিভ হাসি টেনে এনে ফুলের দোকানের জানলাটার কাছে গিয়ে ভেতরকার এক্সতিক্‌ কাক্‌তুস্‌গুলো নিয়ে আলোচনা করে। যেন কিছুই হয় নি, অথচ ওদের চোখে জল।

কাদা-মাখা টুপী আর ফিয়ল্‌কির গুচ্ছটিকে একখানা জার্মান মিলিটারী লরী ময়লা তুষারের সঙ্গে চেপটে দিয়ে গেল।

যেন "লুনা পার্কে" * শনিবারের বাজার। পথের মানুষ যখন ত্রস্ত, ত্বরিত পদে সন্ধ্যা সাতটা বাজবার আতঙ্কে দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে আপন আপন রাত্রের আস্তানার দিকে ছুটে চলে তখনই এদের স্ফূর্তির মরসুম পড়ে যায়। কিছু দিন আগেই এরা সাপ্তাহিক পরীক্ষার দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুমতে পারতো না, পাঠ মুখস্থ না হলে হয়তো এদের বেঞ্চীর ওপর দাঁড়াতে হতো। এখন ইউনিভার্সিটি খুলতে অনেক, অনেক দেরী, হয়তো একেবারেই খুলবে না। পরীক্ষার ভাবনা নেই, নৈতিক দায়িত্ব নেই, প্রফেসরদের কড়া নজর নেই। আছে প্রচুর স্বাধীনতা, অবসর, সেন্টিমেন্ট্-চট্‌চটে বাড়ীর চিঠি, ভালো-মন্দ খাবারের পার্সেল, সহজ-লব্ধ অর্থ এবং নবোন্মেষিত কাম। হিট্‌লারী দুলালরা † কয়েক মাস কুচ্‌কাওয়াজ করে এদেশে ছুটি কাটাতে এসেছে। সারাদিন কাটে ক্যান্টীনে, পান অশন, নাচন-কোঁদন, তাশ-পাশায়। সন্ধ্যার দিকে গা ধুয়ে, পাউডার ঘষে, আতর মেখে যখন এরা বাইরে বেরয় তখন ক্যান্টীনের দোরের কাছে চাঁদের

* ইউরোপের বহু শহরে শস্তা স্ফূর্তির মেলা।

† হিট্‌লার-যুগেন্দ্ অর্থাৎ হিট্‌লারী নবযুবক।

হাট বসে গেছে। সপ্তমী, অষ্টমীর চাঁদ থেকে আরম্ভ করে পূর্ণচন্দ্র পর্যন্ত, যার যে-রকম পছন্দ, স্লিম্, পুরন্ত, ভরন্ত, টোল-কপোলিনী, চটুলাক্ষী, ব্লন্দ্, ব্রুনেৎ, চেস্ট্‌নাট্-চিকুরিণী, ক্যালেণ্ডারের ছবি, সিগারেট-কেসের ছবি, সাবানের বাক্সের ছবি, পথে বেরিয়ে শুধু বেছে নিয়ে দরদস্তর ঠিক করে ফেলা। তারপর যুক্ত হয় দুটি হাত, দুটি কাঁধ, দুটি বাহুপুট, এবং চারটি পায়ের হাল্‌কা যুগপৎ উত্থান-পতনে পোড়া, হানা বাড়ীর শূন্য কন্দরে কন্দরে কী এক গোপন, অশুভ প্রতিধ্বনি জেগে ওঠে।

আবছা অন্ধকারে ছোকরাদের লালা-সিক্ত প্রেমনিবেদন এবং ইহুদী বারাঙ্গনাদের প্রত্যঙ্গ-আবেদন সন্ধ্যায় পথ-চলা নিতান্ত অপ্রিয় করে তুলেছে। তবু দিনের চৌদ্দ ঘণ্টা স্বাধীনতার একটি লহমাও অপচয় করতে ইচ্ছে করে না। সাতটা বাজবার শেষ অনুপল পর্যন্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকি।

মনে পড়ে কঠোর, নির্মম শীতের সন্ধ্যার একটি দৃশ্য :

সে যে রূপসী সে কথা তার দামী ফার্-কোটের মূল্যের ওপর নির্ভর করতো না। তার আপন অস্তিত্বের মতই তা স্বতঃসিদ্ধ। তার সৌন্দর্য ঠিক সেই ধরণের যাকে আভরণ সমৃদ্ধ করতে পারে না, আভরণের তাৎপর্য যেখানে শুধু সমন্বয় সৃষ্টি করা। বহু দূর থেকে চোখে পড়ে তার অভিজ্ঞাত পদক্ষেপ, অনুপম মুখশ্রী আর তার ঐ কৃষ্ণ-মসৃণ কারাকুলের ফার্‌কোট, যেন মানে অঙ্কিত একটি নিখুঁত প্রতিকৃতি। তার কটিদেশের বক্র রেখা, পেছনদিকে ঈষৎ হেলিয়ে-দেওয়া দেহ-ভার যেন কোনো প্রতিপক্ষের অবলম্বন প্রতীক্ষা করে, অথচ তার সমগ্র আকৃতি এক অদ্ভুত উপায়ে মনে সম্ভ্রম জাগায়। অতিবড় যৌন-সমস্যা-প্রপীড়িত ব্যক্তিও তার চোখের দিকে তাকাতে সাহস পায় না। পুরুষের দুরাশা ও সম্ভ্রম,

লালসা ও সংযমের সে এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। ওদের মনে যে এই নিতান্ত সাধারণ মানুষিক অনুভূতিরও উদয় হয় না, সেইটুকুই আশ্চর্য! ছোকরাটি যদি সটান তার কাছে গিয়ে সবাসরি অশ্লীল প্রস্তাব করতো, তাহলেও হয়তো তা অতটা কুৎসিত হতো না।

কিন্তু অত্যধিক কাম-চর্চায় ওদের কাছে আদিরসও কটু হয়ে উঠেছে। কামনার পাত্রী ওদের মনে আর রোমান্স্ জাগায় না। কামই একমাত্র কাম্য-বস্তু হয়ে ওঠার অভিশাপ সেই প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম। বারাঙ্গনা-বাহুপাশাবদ্ধ দুলালটির বয়েস উনিশ-কুড়ির বেশী হবে না। মুখে রঙ-করা কৃত্রিম আমোদ, দৃষ্টিতে তিক্ত মোহ-মোচন, অভিব্যক্তিতে নির্লজ্জ আড়ম্বর। নারী-নির্বাচনে তার যৎসামান্য রসবোধও নেই। রুক্ষ্-মুখী, গবাক্ষী, মার্জার-প্রকৃতি তার সঙ্গিনীর মধুর ন্যাকামী কানে আসে—তুমি কি ভেবেছো মেয়েমানুষের মন গাছের ফল, পেড়ে নিলেই পাওয়া যায়?

মেয়েমানুষের মন, চিরন্তনী নারী, সত্যিই তো, ছলনাময়ী, গোপনচারিণী, শিলার্-এর কোন্ একটা কবিতায় পড়েছে না? ছোকরাটির কর্তব্য তার সঙ্গিনীর মন জয় করা, নারী-বিজয় সম্পর্কেই তো তার দাদার থুৎনীর নীচে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের তলোয়ারের দাগ! আর তার বাহুপুট-চারিণী এই নারীর মন জয় করতে পারবে না সে? অবশ্য, অবশ্যই সে জয় করবে, না হলে দেশে গিয়ে ইয়ারদের কাছে কিসের গল্প করবে সে? বলে—সারা পোলদেশটা জয় করলাম আমরা আর সামান্য মেয়েমানুষের মন জয় কবতে পারবো না আমি? হে হে হে।

ছোকরাটির হাতের মাস্‌ল্-এ একটি চিমটি কেটে তার কুহকিনী বলে—তা তুমি সব পারো, ক-জনের মন ভাঙিয়েছো গা, বলো না, আমি একটুও জেলাস্ হবো না, মাইরী বলছি।

ছোকরাটি বাহাদুরী করে—ইস্কুল থেকেই, হে হে হে।

সত্যি! তাদের ফটো আছে? দেখাবে? সত্যি, আমি একটুও জেলাস্ হবো না।

ফটো-টটোর ধার ধারিনি কখনো। এমনকি অনেকের মুখ পর্যন্ত মনে নেই।

দুষ্টু। দন্ হুয়ান্! আমার সঙ্গেও তোমার সেই মৎলব বুঝি?

কী মৎলব?

আ-হা, ন্যাকা! যেন কিছু বুঝতে পারছেন না! আমি তাহলে বাড়ী চললুম।

ইস্! তোমায় ছাড়ছে কে?

না, সত্যি, মা ভারী বকবে। তুমি কি আমায় ঐসব মেয়েমানুষ ঠাউরেছো?

সে-সব মেয়েমানুষের সঙ্গে আমার কারবার নেই। (দু-বার গোঁফের রেখা চুমরে) এমন চেহারা পেলে তারা এক পয়সাও নেয় না, দুদিনে ফেল মারবে বেচারীরা।

না, সত্যি, আমি যাই, দেরী হলে মা ভাববে যে!

আ-হা কচি খুকীটি! আমি নিজে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসবো'খন।

কিন্তু আমার যে ভীষণ শীত করছে, ব্র্-র্-র্-র্! আমি বরং বাড়ী গিয়ে আমার ফার্-কোটটা নিয়ে আসি গে।

ফার্-কোটে কী হবে? (সঙ্গিনীর কর্ণ-বিবরে) আমি প্রেমের আগুন জ্বেলে দেবো, কী বলো?

না, সত্যি আজ নয়, আমি আবার কাল আসবো, কেমন! উঃ, আমার যা শীত করছে!

শীত করছে? তা বলো না শীত ভাঙবে কিসে?

বলছি তো! আমি বাড়ী গিয়ে আমার ফার্‌-কোটটা গায়ে দিয়ে নি। তুমি কত রাত পর্যন্ত আটকে রাখবে তা ভগবানই জানেন।

(সঙ্গিনীর কর্ণ-বিবরে) সারা রাত। তোমার শীত করছে? ফার্‌-কোট চাই? ক-টা চাই বলো না, আলাদিনের দৈত্যের মত আমি এক্ষুনি তা হাজির করে দিচ্ছি, বলো না ক-টা চাই।

ক-টা আবার? একটা, একটাই দাও না দেখি।

জো হুকুম!—নাটকী কায়দায় আভূমি অভিবাদন করে যেন কী একটা বাজি দেখাবার ভান করে। তারপর শুনি কর্পোরালের খেঁকী গলার আওয়াজ—হাল্ট্‌!—সে পথ-চলা ঐ মেয়েটির গতিরোধ করেছে।

তার গভীর, গভীর দৃষ্টিতে ক্রুদ্ধ ফণিণীর চোখের বহ্নিশিক্ষা আস্তে আস্তে নিবে আসে। অধিকৃত দেশে ধ্বংস-লিখা, ভয়াল চক্রবাল-বেষ্টনীর মধ্যে সে যে কত অসহায় তা যেন সে সহসা উপলব্ধি করে। থমকে দাঁড়িয়ে সহজ গলায় জিজ্ঞেস করে—কী চাই আপনার!

কী চাই? চাই আপনার ফার্‌-কোটটি। এ-রকম দামী জিনিষ আপনি পেলেন কোথায়, সে-কথা প্রশ্ন করে আপনাকে লজ্জা দিতে চাই না। আপনার বোধ হয় জানা আছে, এদেশের যাবতীয় মূল্যবান্‌ সামগ্রী সরকারের কাছে গচ্ছিত রাখা আইন। তাছাড়া আপনি যদি পশ্চিম অঞ্চলের লোক হন্‌, যা আপনার জার্মান-ভাষার জ্ঞানে স্পষ্ট ধরা পড়ে, তাহলে ঐ ফার্‌-কোটটিকে সঙ্গে নিয়ে এসে আপনি সরকারকে বঞ্চিত করেছেন। সুতরাং বিনা দ্বিধায় আপনি যদি ঐটিকে পরিহার না করেন তো আমি আইনতঃ অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হবো।

মেয়েটি একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। তুষার-পিচ্ছিল পথ

দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে আতঙ্কিত জনতা, সাতটা বাজতে মাত্র কয়েক মিনিট বাকী। অনাহারে শীর্ণ-দেহ, নির্যাতনে জীর্ণ-স্নায়ু, ছেঁড়া জামা আর ছেঁড়া জুতোর ম্যানিকিন্‌গুলো বহু কষ্টে আহৃত খাদ্য ও ইন্ধনের ভারে নুয়ে পড়ে যে-যার বাড়ী ফিরছে। নারীর সম্মানের জন্যে এক কথায় প্রাণ দিতে পারে এমন সাড়ে ছ ফুট চেহারার পুরুষ-গুলো গেল কোথায়?

কর্পোরাল ছোকরার অসহিষ্ণু প্রশ্ন—চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন যে!

মেয়েটি একটু ইতস্ততঃ করে, কী যেন বলতে চায়। তারপর ফার্‌-কোটটা খুলে ফেলে দিয়ে অবসাদ-ভারাক্রান্ত পা-দুখানা টানতে টানতে পথ চলে। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায় ঐ অবমানিত সাম্রাজ্ঞীর মত বিষাদ-ভরা ছায়ামূর্তি। প্রায়-নগ্ন দেহের আঁকা-বাঁকা রেখা-সমন্বয় ধারণ করেছে মাত্র একটি রেশমের অন্তর্বাস ···

সাতটা বেজে গেল।

মনে বিকার জাগবার আগেই আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়ি।

ভাঙা শহরের হুম্‌ড়ি-খেয়ে-পড়া দেওয়ালে দেওয়ালে রঙের বাহার, সে এক বিচিত্র দৃশ্য। যেখানে যতটুকু জায়গা পাওয়া গেছে সেইখানেই রঙিন কাগজে সরকারী প্রাচীর-বিজ্ঞপ্তি, তার আশে-পাশে ছোট-ছোট কাগজের টুকরোয় হাতে-লেখা হাজার হাজার বিজ্ঞাপন। সরকারী বিজ্ঞপ্তির কয়েকখানার সারমর্ম দেওয়া গেল ঃ

এতদ্বারা সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে যে,—স্কি নামধারী জনৈক ৭৯-বর্ষীয় বৃদ্ধ আইনসঙ্গতরূপে প্রতিষ্ঠিত জর্মান সরকার ও নূতন ব্যবস্থার (die neue Ordnung) বিরোধিতা করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। নির্বোধ বৃদ্ধ "অস্ত্র-পরিহার বিজ্ঞপ্তি" ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও অধিকারীদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তথা জর্মান সৈনিকদিগকে গুপ্তভাবে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই আপন তরবারী প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিল।

যতদূর জানা যায়, বৃদ্ধ পোল স্বাধীনতার প্রারম্ভে স্বীয় বীরত্বের পুরস্কার রূপে লব্ধ শখের তলোয়ারখানি পাছে জার্মানরা কেড়ে নেয় এই

ভয়ে তাড়াতাড়ি পুঁতে ফেলেছিলেন। সেটিকে মরচের হাত থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে ধরা পড়েন।

এতদ্বারা ইত্যাদি যে,—স্কা নামে একটি ইউনিভার্সিটীর ছাত্রী পথে জর্মান সৈনিককে অপমান করার অপরাধে গুলীর আঘাতে প্রাণ দিতে বাধ্য হইয়াছে। পথ চলিতে চলিতে সে একটি জার্মান সৈনিককে "কুকুরের রক্ত" বলিয়া গালি দিয়াছিল।

পোল ভাষায় Psia Krew (প্‌শ্যা ক্রেফ্‌) বা "কুকুরের রক্ত" নিতান্ত মামুলি কটুবাক্য, ইংরেজীর damn-জাতীয় উক্তি।

মৃত্যুদণ্ড! মৃত্যুদণ্ড! মৃত্যুদণ্ড!

এতদ্বারা ইত্যাদি যে, নূতন ব্যবস্থার সুষ্ঠু প্রতিষ্ঠাকল্পে দেশের অর্থ ও আহার্য সুচারু ও ন্যায়সঙ্গতরূপে রক্ষিত ও বিভাজিত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং পুনঃ পুনঃ সাধারণী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত হওয়া সত্বেও যে-সকল ব্যক্তি বৈদেশিক অর্থ বা স্বর্ণমুদ্রা অথবা স্বর্ণখণ্ড লুক্কায়িত রাখিয়াছে, ধৃত হইলে তাহাদিগের প্রাণদণ্ড সুনিশ্চিত। এতদ্ব্যতীত সরকারী মূল্যের অধিক দামে রুটি ক্রয় ও বিক্রয় উভয় কার্যই মৃত্যুদণ্ডার্হ বলিয়া বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে।

অধিকৃত দেশে সোণা এবং দানা উভয়েরই সুব্যবস্থার উদাহরণ চমৎকারক সন্দেহ নেই। তখনই একমাত্র ডল'র, য়েন্‌, গুল্ডেন্‌ প্রভৃতি এবং সোণার বিনিময়েই জার্মানী বিদেশে সামরিক উপকরণ কিনতে সমর্থ হচ্ছিল। আহার্যের মূল্য নিরূপণ করে দিয়ে যে তার সরবরাহেরও

ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, সে-কথা নূতন ব্যবস্থার কেতাবে লেখে না। খাদ্য-সমস্যাকে অতিশয় জটিল করে তুলে দেশের বিদ্রোহ-আন্দোলনকে বিনাশ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। এ-ছাড়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে গেলে কী কী করা প্রয়োজন তার তালিকা একটি সমগ্র গ্রন্থের আকার ধারণ করবে। আত্মহত্যা-কামী ব্যক্তিদের মরসুম পড়ে গেছে।

– নেরুভ্‌না নাম্নী একটি যুবতী জনৈক সুকোমল-মতি জার্মান যুবক অফিসারকে নৈতিকরূপে পথভ্রষ্ট করার অপরাধে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

বলা বাহুল্য উক্তা নাম্নীটি একটি পথচারিণী। সম্ভবতঃ উক্ত যুবককে কাম-রোগে সংস্পৃষ্ট করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। পথচারিণীদের প্রতি আপন আপন স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবার আদেশ বিজ্ঞপ্তিটিতে সুস্পষ্ট।

—স্কি নামক এক ব্যক্তিকে সরকারী আইন অমান্য করিয়া রাদিও-যন্ত্র সরকারের হাতে সমর্পণ না করার অপরাধে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। শত্রুপক্ষের মিথ্যা ও অলীক প্রোপাগান্দা শ্রবণ করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল।

সকল ক্ষেত্রে তা সত্য নয়। অধিকাংশস্থলে খুব দামী সেট্‌-এর প্রতি মমতাবশতঃই অনেকে রাদিও "জমা" দেয় নি।

—স্কা নামধারিণী একটি ৬৬-বর্ষীয়া বৃদ্ধা আপন ব্যাগে গুপ্ত সংবাদপত্র সমেত ধৃত হওয়ায় প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। বুদ্ধিহীনা মিথ্যা সংবাদপূর্ণ গুপ্ত পত্রিকা জন-

সাধারণকে পাঠ করাইয়া অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জন করিতেছিল।

এও একটি নিতান্ত মানুষিক দুর্বলতা। অধিকৃত দেশে মাত্র একখানি পত্রিকা থাকায় এবং তা আদ্যোপান্ত "মিত্র"-পক্ষীয় প্রোপাগান্দায় পরিপূর্ণ বলেই সাধারণ মানুষের ঐ গুপ্ত পত্রিকাগুলি সম্বন্ধে অস্বাভাবিক ঔৎসুক্য। ছোট ছোট বুলেটিন্ জাতীয় কয়েকখানি পত্রিকা চালু আছে, তবে তাদের উৎপত্তি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত। একখানি হাতে এসে পড়লে তাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করবার মত চরিত্রবল আছে এমন মানুষ আছে কি না সন্দেহ।

—চ্যিক্ নামক জনৈক কৃষক মদ-মত্ত অবস্থায় দেওয়াল্ লক্ষ্য করিয়া ছুরিকা ক্ষেপণ ও তৎসহ মহামহিম ফ্যুরেরের নাম উচ্চারণ করার অপরাধে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

এতদ্বারা ইত্যাদি যে ইহুদীগণের প্রত্যেক পরিবারের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ২০০০ জ্‌লত্যির (১০০০৲) অধিক হইতে পারিবে না। অস্থাবর অর্থে সংসারযাত্রা নির্বাহার্থে যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী। বর্তমান আইন অমান্য করা কঠোররূপে শাস্তি-বিধেয়। এতদ্বিষয়ে কোনো প্রকার সাহায্য বা প্ররোচনা-দান না ইহুদী যে-কোনো জাতির পক্ষেও সমভাবে শাস্তি-বিধেয়।

কড়া-পাকের জার্মান এবং তার পোল তর্জমার শাস্তির কথাটাই চাপা পড়ে যায়। শোনা গেছে প্রথম শাস্তি হচ্ছে লুটপাট। অর্থাৎ পথি ভ্রাম্যমান অধিকারিবৃন্দের যদি সহসা অনুমান হয় যে কোনো

বিশেষ আবাসগৃহ ইহুদীদের তো তন্মুহূর্তেই হুড়মুড় শব্দে প্রবেশ করে সোনা-রূপো, গাল্চে-ফর্'স, এবং শখের এটা ওটা সেটা সাপ্টে, জাপ্টে দু'হাতে বুক ও বিয়ার ভুঁড়ীর ওপর চেপে ধরে হাঁস-ফাঁস করতে করতে বেরিয়ে আসা। দ্বিতীয় শাস্তি সহস্রোর্দ্ধ মুদ্রার সম্পত্তির বাজেয়াপ্তীকরণ। তৃতীয় শাস্তি অবশ্য অধিকাংশ স্থলে ইহুদীতর জাতির পক্ষে প্রযোজ্য—বিনা কড়িতে খেয়া পার।

—স্কা নাম্নী জনৈকা বৃদ্ধা স্বীয় গৃহে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সঞ্চিত রাখার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতা হইয়াছে। দেশের এই নিদারুণ খাদ্য-সঙ্কটে পুনঃ পুনঃ ঘোষিত সরকারী বিজ্ঞপ্তি অমান্য করা গর্হিত তো বটেই, উপরন্তু তাহা সমাজ-বিরোধী ও কঠোর-রূপে শাস্তি-বিধেয়।—স্কার মৃত্যু ইহার উদাহরণ।

দু-দশ মণ চাল, ডাল, আটা বা চিনি ঘরে মজুত রেখেছে এমন গৃহস্থ বিধ্বস্ত ভারশৌএ একটিও ছিল কিনা সন্দেহ। যুদ্ধের আগে যারা পুঁজী করেছিল তাদের অধিকাংশ পুঁজীই অগ্নি-লেহনে বিলুপ্ত হয়েছে। বুড়ীর পুঁজী দু-এক মণের বেশী ছিল বলে মনে হয় না, যা তার সংসারের পরিমাণে পনেরো দিনেরও খোরাক নয়। শোনা যায়, বুড়ী তার নাতীর জন্যে যুদ্ধের আগে তৈরী-করে রাখা এক থলে কড়কড়ে টোস্ট্, যা সৈনিকরা তার ঘরে ঢুকে জার্মান-গ্রাসে গলাধঃকরণ করেছিল, তার শোক মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত্ত পর্যন্ত ভুলতে পারে নি।

ইত্যাদি ইত্যাদি এবং অলমতিবিস্তরেণ, কারণ উপরি-উক্ত প্রকারের বিজ্ঞপ্তি অহরহ এবং সর্বত্র এত চোখে পড়ে যে, কোন্ বৃদ্ধ বা কোন্ বৃদ্ধা কী উপায়ে জার্মানদের সাহায্যে ভবতরী পার হলো তার হিসেব রাখা একমাত্র চিত্রগুপ্ত ব্যতীত আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

হাজার হাজার বেসরকারী বিজ্ঞাপনের মধ্যে কয়েকটা মনে পড়ে। তুষারে ভেজা, কালী-ধেবড়ানো শিক্ষিত ও অশিক্ষিত হাতের লেখা আবেদন :

আমার দেড় বছরের ছেলে। শুধু "বাবা", "মা", "বেড়াতে যাবো" আর "মিয়াও" বলতে পারে। ২৩শে সেপ্টেম্বর উল্‌গীংসা ত্রাৎস্কায় আগুন লাগবার সময়ে একটি অচেনা ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে ঘুমন্ত মেয়েটাকে আনবার জন্যে ছুটে ওপরে গিয়েছিলাম। এসে আর লোকটিকে দেখতে পাই নি। যদি বেঁচে থাকে তো দয়া করে এই ঠিকানায় খবর দেবেন। অভাগিনী মা।

আমার বৃদ্ধ পিতা, বয়ঃক্রম ৭৫, প্রায় অন্ধ, নাম—স্কি। ৭ই সেপ্টেম্বর একসঙ্গে পায়ে হেঁটে শহর ছেড়ে বার হই। মিন্‌স্ক্‌-এর কাছে বোমাবর্ষণের পরে আমরা দল ছাড়া হয়ে পড়ি। যদি কেউ খবর রাখেন তো দয়া করে নীচের ঠিকানায় জানাবেন।

একটি ১।২৷৷০ বছরের মেয়ে লুব্‌লিন্‌-এর কাছে মাঠের ওপর মেশিন-গানের গুলীতে হত মায়ের মৃতদেহের ওপর পড়ে কাঁদছিল। নাম বোধ হয় ক্রিস্ত্যা কিংবা ৎসেস্ত্যা। নীচের ঠিকানায় তার খোঁজ পাওয়া যাবে। যদি মেয়েটির বাবা সম্মত হন তো তাকে পোষ্যকন্যারূপে গ্রহণ করতে রাজী আছি।

২০শে সেপ্টেম্বর আমার বাইশ বছরের ছেলে প্লাৎস্‌ নাপলেঅনার কাছে বোমার চোটে মারা যায়। নাম য়ান্‌—স্কি। বহু অন্যান্য পথচারীদের সঙ্গে রাস্তার এক ধার খুঁড়ে নাকি তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। উক্ত ঘটনা যাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন বা যাঁরা কবর খুঁড়তে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের কেউ যদি দয়া করে জানান, কোন্‌ রাস্তার কোন্‌খানে সেই লোকগুলিকে কবর দেওয়া হয়েছিল তাহলে চিরন্তরে বাধিত হবো। বলা বাহুল্য, মৃত পুত্রের যথারীতি সৎকার না করতে পারলে তার পিতার পক্ষে কর্তব্যচ্যুতি হবে।

ছোট্ট, কালো রঙের স্কচ্‌ টেরিয়ার, নাম নিকি, ভারী স্ফূর্তিবাজ। যুদ্ধে দৃষ্টিহীন তিন বছরের ছেলের একমাত্র সহচর। কয়েক দিন আগে খাবার খুঁজতে বেরিয়েছিল, ফেরে নি। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তো দয়া করে নীচের ঠিকানায় খবর দেবেন।

সেদিন এক টুকরো রুটি পাওয়া গেছে। কালো হোক্‌, কাঁচা হোক্‌, ধুলো, বালি, খড়ে ভরা হোক্‌, তবুও তা রুটি। একটু একটু করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে দিলে অনেকক্ষণ ধরে চিবনো চলে। ওভারকোটের ভেতরে পুরে আসন্ন ভোজনের কল্পনায় মশ্‌গুল হয়ে পথ চলি। দিদির বন্ধুর ছোট্ট ঘরখানায় রাখা আলু আর পেঁয়াজ, দু-চারটে না আনলেই নয়। যেতে আসতে ছ মাইল। কিন্তু আলু সেদ্ধ, কাঁচা পেঁয়াজ তার ওপর সেই ঘরের কোণে লুকিয়ে-রাখা তেলের বোতলটা থেকে পলাখানেক সর্ষের তেল ঘুরিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া, গোটা কয়েক ছাতা-পড়া গোল মরিচও কি পাওয়া যাবে না? আর এই রুটি। বুকের কাছটা টিপি হয়ে রয়েছে। তা হোক্‌। আর এক টুকরো ছিঁড়ে মুখে পুরি।

পেছন থেকে কে ডাকলো—প্রশেঁ পানা।

ফিরে তাকাবার সময় নেই। তাছাড়া লক্ষ্য করেছে আর কী! রুটি, রুটি, রুটি, অমনি দিতে হবে খানিকটা, খ্রীষ্টের দোহাই। তুমিও যেমন, বলে চাচা আপন পরাণ বাঁচা! ওটুকু থেকে দিলে থাকবে কী?

প্রশেঁ পানা—

আচ্ছা জ্বালাতন তো! রুটির গন্ধ পেয়েছে কী অমনি ভাগ দিতে

হবে, কমুনিজ্‌ম্‌ আর কী। তা না হলে ব্যস্‌, চললো সঙ্গে সঙ্গে, পেছু পেছু, যতদূর যাও পেছনে সমানে পায়ের শব্দ, আর মাঝে মাঝে—"প্রশেঁ পানা"! অত সহজে গলবার পাত্র এ বান্দা নয়। আলু সেদ্ধ, কাঁচা পেঁয়াজ, মরিচ গুঁড়ো, সর্ষের তেল আর এই রুটি। ইয়াকি নাকি?

প্রশেঁ পানা, বিদিশী মানুষ আমি—

তা আর জানি নে? বাদবাকী বুলীটুকু আমার মুখস্থ আছে—আজ পাঁচ দিন দাঁতে কুটোটি দিই নি বাবা, খ্রীষ্টের দোহাই, দাও বাবা এক টুকরো রুটি, ভগবান তোমায় দশগুণ দেবেন বাবা তোমার মঙ্গল হবে বাবা……অত সহজে নয় বাছা, আমি সব জানি, তোর পেটের জ্বালা তো আমার কী? আমি কি দু-বেলা কেক বিস্কুট মুখে ঠুসছি, যে আমার ওপর জুলুম!

প্রশেঁ পানা, পানিয়ে শান্‌ভ্‌স্ত্রী, একটা কথা শোনো গো বাছা—

বুড়ী রুটিখানার খানিকটা না নিয়ে ছাড়বে না দেখছি। বলবো নাকি, মাফ্‌ করো বাছা, রুটি ফুটি আমার কাছে নেই। কেন মিছিমিছি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছো? দু চারটে প্রশ্‌ন চাও দিতে পারি। রুটি পাবো কোথায়?

প্রশেঁ পানা, একটি মিনিট দাঁড়াও না বাছা, আমি বিদিশী মানুষ—

ভালো গেল তো! সত্যিই থামতে হলো। পেছন ফিরে বিরক্তি ভরে বলি—রুটি নেই, নেই, নেই। বুকের কাছে টিপি হয়ে থাকলেই রুটি হতে হবে নাকি?—আপন জিহ্বাগ্রে অশ্লীল উপমাত্মক কটু উক্তি অনুভব করি। তারপর সংযত হয়ে বলি—রুটি চাও তো যাও না উলীৎসা ঝেলাজ্‌না নম্বর—

চাষী বুড়ী, মাথায় কালো কাপড় ঢাকা একটু বিব্রতভাবে আমার দিকে তাকায়। তারপর নিতান্ত সহজভাবে শুধায়—প্রশেঁ পানা,

আমি বিদিশী মানুষ, শহরের কোথায় শস্তা কফিন্ পাওয়া যায় বলো না বাছা।

আমায় নিরুত্তর দেখে যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে বলে—পৃশেপ্রাশাম্ পানা *। ভেবেছিলাম, হয়তো আপনি ঠিকানা জানেন।—তারপর আপন মনে কী বলতে বলতে আর এক নূতন পথ ধরে চলতে সুরু করে। দু-একটা কথা কানে আসে—চার-চারটে কফিন্, তিনটে বেটা, আর উনি, মাটি খুঁড়ে বের করলুম, এখন গোর দি কী করে বলো তো! আজগেরই গতি না কত্তে পারলে শ্বাব্-বেটারা কোন্ গো-ভাগাড়ে চালান করে দেবে তার ঠিক নেই। হায় খ্রীস্তস্!······

চুলোয় যাক্ গে! আজ যে ফার্স্ট্ ক্লাস্ ভোজটি হবে! একটু পা চালিয়ে চলা যাক্।

* মাফ করবেন।

শীতের অপরাহ্নে সমস্ত পার্কের মাঠটায় আমরা দুজন, তাও একই বেঞ্চের দুই সীমান্তভাগে। সুতরাং পাঁচ মিনিটেই আলাপ জমে গেল। কথার টানে ধরা যায়, হয় পশ্চিমী না হয় পূর্ব প্রুশিয়ার অঞ্চলের লোক। —কেমন খট্‌খটে কাঠ-খোট্টা উচ্চারণ, কখনো কখনো মনে নয় যেন ভদ্রলোক সটান জার্মান থেকে মুখে মুখে তর্জমা করে যাচ্ছেন। গ্‌দান্‌স্ক্‌ (দান্‌ৎসিক্‌)-এর নগর-সমবায়ের পোলীয় সদস্য। উক্ত নগর সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় তিনি স্বীয় আত্মচরিত থেকে যে ঘটনা বিবৃত করলেন তা এই ঃ

পানিয়ে, গ্‌দান্‌স্ক্‌ ওদের না আমাদের এ নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু আমরা, পোলরা, যে সমস্ত শহরটাকে হাতাতে চেষ্টা করেছি এ কথা সর্বৈব মিথ্যা। সমস্ত সমবায়ে আমরা যে-কজন সদস্য ছিলাম, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সংখ্যা-লঘু পোলদের ওপর যাতে অবিচার বা অত্যাচার না হয় শুধু সেই দিকে দৃষ্টি রাখা। যুদ্ধের ঠিক আগে সেখানে পোলদের ওপর যে ভীষণ ও অকথ্য অত্যাচার অনুষ্ঠিত হতে লাগলো তার প্রতিকারও করতে পারি নি আমরা, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবাদও না। আমাদের মনোমালিন্য যাতে যুদ্ধে পরিণত না হয় সেইজন্যে বহু

মর্মন্তুদ ও বীভৎস ঘটনা আমরা গোপন রাখতে বাধ্য হয়েছি। যুদ্ধের পর সে-সব ঘটনা যখন লেখা হবে তখন দেখতে পাবেন, ওরা কতদূর নির্বিবেক ও নিষ্ঠুর হতে পারে। যাই হোক, যুদ্ধ তো বেধে গেল। এক ভেস্তারপ্লাত্তে* ছাড়া ও-অঞ্চলে আমাদের সৈন্য-সামন্ত বেশী ছিল না, তাই একদিনেই গ্‌দান্‌স্ক্‌ রাইখ্‌-ভুক্ত হলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে সমবায়ের সমস্ত পোল সদস্য ও অন্যান্য উচ্চ কর্মচারিদের ওরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। আমরা যারা নাৎসী উৎপীড়নের কিছু কিছু ভেতরকার খবর রাখতাম, মনে মনে পরপারে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলাম। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে যা ঘটলো তার তুলনায় প্রাণদণ্ডও হয়তো ভালো ছিল। প্রতিপক্ষের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে হলে ব্যঙ্গ ও তাচ্ছল্যের তুল্য মহাস্ত্র যে বিরল তা আগে আমরা কল্পনাও করি নি।···

······নগর-সমবায়ের সদস্য আমরা পাঁচজন আর অন্যান্য কর্মচারী আরো জন পঞ্চাশ। গ্রেপ্তার করার পর ওরা আমাদের এক জায়গায় বন্দী করে রাখলে। তারপর হঠাৎ শুনি নাম ডাক হচ্ছে। একে একে আমরা সারি দিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর হুকুম হলো—মার্চ্‌!—মার্চ্‌ তো মার্চ্‌, জানি এবার সারি সারি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড় করিয়ে মেশিনগানের টোটা-ফিতে চালাবে। আমরা মাথা নিচু করে চুপচাপ্‌ চলেছি, জীবনের আর কটা মুহূর্তই বা বাকী!···

···চারিদিকে সান্ত্রী আর মাঝখানে আমরা, পেছন দিকে হাত বাঁধা, সবাই পায়ের তলার মাটির দিকে তাকিয়ে চলেছি, পরস্পরের মুখের দিকে তাকাবার ভরসা পাই না, পাছে কারো মুখে আতঙ্কের ছাপ দেখে আমাদের মন হঠাৎ দুর্বল হয়ে পড়ে। চলতে চলতে দেখি পায়ের তলায় রাস্তার খোয়া নেই, আমাদের একটা প্রকাণ্ড মাঠে এনে হাজির করেছে

* "মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়" দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ১৩৫-৩৬।

ওরা। মাঠের মাঝামাঝি এসে শুনি—হাল্‌ট্‌!—তারপর আমাদের সারি দিয়ে দাঁড় করিয়ে হাতের দড়ি খুলে দিয়ে খেঁকী গলায় জিজ্ঞেস করলে, আমরা জীবনে কখনো খেলা-ধূলো করেছি কিনা। ভয়ে ভয়ে কে যেন উত্তর দিলে, টেনিস খেলতে পারে। টেনিস্‌! বুর্জোয়ার বাচ্ছা বুর্জোয়া! —কাপ্‌রালের খেঁকী গলার আওয়াজ।—টেনিস্‌, ক্রিকেট, বেস্‌বল্‌ ঐ সব "এংলিশ্‌" স্পর্ট্‌ নিয়ে মেতেছিলে বাছাধনরা, গায়ে জোর হবে কোত্থেকে? এইবার আমাদের ফ্যুরেরের দৌলতে তোমরা সত্যিকার মানুষ হতে শিখবে। আমার ওপর হুকুম তোমাদের স্পর্ট্‌ শিখিয়ে "পোল" থেকে মানুষ করা। সুতরাং সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর স্পর্ট্‌ থেকে শুরু করা যাক্‌।...

...পাঁচ মিনিট আগে যারা মরবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল, তাদের পক্ষে হঠাৎ এই খবর বরদাস্ত্‌ করার জন্যে যে পরিমাণ হৃদ্‌যন্ত্রের শক্তির দরকার তা সবার ছিল না। তাছাড়া আমাদের বেশীর ভাগই পঞ্চাশের ওপর, কারো কারো বয়েস ষাট পৈঁষট্টিও পার হয়ে গেছে। অপ্রত্যাশিত-ভাবে মৃত্যুদণ্ড রদ হয়েছে এ-কথা শুনলে মানুষে যে-শক্‌ পায় তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। রুশী লেখক দাস্তয়েভ্‌স্কি তো মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। যাই হোক্‌ আমরা প্রাণপণে যে-যার হৃদ্‌যন্ত্রের অস্বাভাবিক ক্ষিপ্র গতিকে রোধ করতে চেষ্টা করছি এমন সময়ে কাপ্‌রালের খেঁকী গলার আওয়াজ—Achtung! (attention)—তারপর প্রায় পাঁচ শ গজ দূরে একটা গাছের দিকে আঙুল দেখিয়ে হুকুম দিলে—রেস্‌! এক, দুই, তিন!—আমরা দৌড়তে লাগলাম, আর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্রীরা, অকথ্য ভাষায় গাল দিতে দিতে। যারা পেছিয়ে পড়তে লাগলো বা যারা কিছু দূরে গিয়ে আর দৌড়তে পারলে না, তাদের ওরা লাথী মেরে চালাতে চেষ্টা করতে লাগলো। আর আমরা

যারা দৌড়তে লাগলাম তাদের চারিদিকে ওরা চিৎকার করে উৎসাহ দিতে লাগলো, কেউ কেউ বাজী ধরলে কে ফার্স্ট্‌ হবে, এবং আপন আপন নির্বাচিত ফেবারিট্‌দের পেছু পেছু ধাওয়া করে খেদিয়ে নিয়ে চললো। কেউ কেউ টিটকারী দিয়ে বললে—বেড়ে গাধার রেস্‌! তাছাড়া অশ্ব ব্যতীত যাবতীয় গৃহপালিত পশুর সঙ্গে আমাদের উপমা দেওয়া চলতে লাগলো। গরু, শূয়র, মোরগ, পেরু কিছুই বাদ গেল না।···

···দৌড় শেষ হলে আমাদের এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম করতে দেওয়া হলো না। সুরু হলো কাঙ্গারু-রেস্‌, তারপর হার্ডল্‌-রেস্‌, তারপর পেছন ফিরে দৌড়নো, নাকের ওপর লাঠি নিয়ে দৌড়নো, মাথার ওপর এক কাপ করে ফুটন্ত গরম জল নিয়ে দৌড়নো, বেঙের মত লাফাতে লাফাতে দৌড়নো, ডিগবাজী খেতে খেতে দৌড়নো প্রভৃতি যত রকমের রেস্‌ ওদের মাথায় এলো, সবগুলিতেই যখন আমরা পাশ করলাম তখন কিছুক্ষণের জন্যে আমাদের রেহাই দিয়ে ওরা ভাবতে লাগলো, আর কী কী স্পর্ট্‌ আমাদের শেখানো চলতে পারে। অবশ্য আমরা যে সবাই পাশ করলাম তা নয়। যারা পাশ করতে পারলে না, তাদের জীবনে আর কোনো পরীক্ষারই বালাই রইলো না।······

···খানিক্ষণ সলা-পরামর্শের পর ওরা ঠিক করলে আমাদের নাচতে শেখাবে। বললে—ইহুদীরা তোমাদের যত রাজ্যের নিগ্রো ঢঙের জ্যাস্‌ শিখিয়ে তোমাদের মাথাটি চিবিয়ে খেয়েছে। তোমাদের শহরে শহরে নাচের আড্ডায় যত ফক্স্‌ট্রট্‌, রুম্বা আর তাঙ্গো নেচেছো, তা যদি তোমাদের জন্মের মত ভোলাতে হয় তাহলে প্রথমে তোমাদের এক পায়ে লাফাতে শেখাতে হবে। আচ্ছা, এইবার শুরু করা যাক্‌।—শুরু হলো এক পায়ে লাফানো, স্কচ্‌ gig-এর মত মাথার ওপর দুই বাহু তুলে,

ঘূরে ঘুরে। আর ওরা শিষ দিয়ে একটা সুর ভাঁজতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে হাততালির তাল। এবারও আমরা অনেকেই পাশ করলাম ...

...তারপর আবার চলে সলা-পরামর্শ। এইবার ঠিক হলো, আমাদের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধনের জন্যে আমাদের গাইতে শেখানো হবে, কারণ ইহুদীরা নাকি আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রেও নিগ্রো রং ধরিয়েছে। এক ছোকরা তার বন্দুকের সঙ্গীন খুলে নিয়ে অর্কেস্ট্রা-কণ্ডাক্টারের মত ঘুরিয়ে কী একটা ছড়া শেখাতে লাগলো যার সারমর্ম এই যে, আমরা গাড়লের দল, শ্মীগ্‌ল্যী * ও বেক্‌-এর † পাল্লায় পড়ে ইংরেজের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে ঠকেছি। এইবার আমাদের আক্কেল হয়েছে, সোণার হিট্‌লার আমাদের মানুষ করেছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু ছোকরা Wir-এর (আমরা) জায়গায় Ihre (তোমরা) ব্যবহার করলে, এবং আমরা যেন Ihre-এর জায়গায় Wir ব্যবহার করি সে-বিষয়ে আপন বন্দুকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক সতর্কতা অবলম্বন করতে বললে। সব চেয়ে কঠোর পরীক্ষা এই। কঠোর এই জন্যে যে আমরা যে ঐ গান গাইবার আগে আপন আপন মাথার খুলী লক্ষ্য করে পিস্তলের ঘোড়া টিপবো সে অধিকার থেকেও ওরা আমাদের বঞ্চিত করেছিল। আমরা সত্যিই এক পাল গাড়লের মত হেঁড়ে গলায় গান গেয়ে চললাম। ওরা হেসে লুটিয়ে পড়তে লাগলো। আমাদের চোখে জল দেখে পাছে ওরা হঠাৎ মানুষের মত ব্যবহার করতে শুরু করে এই ভয়ে আমরা চোখের জল চেপে রাখলাম।......

* পোল সেনাধ্যক্ষ, † পোলীয় পররাষ্ট্র-সচিব।

তিনটি খণ্ড-চিত্র। কোনো স্মরণীয় ঘটনার সঙ্গে যুক্ত না হলেও আজও স্পষ্ট মনে পড়ে।

যুদ্ধের পর তখন সবে ট্রাম চলতে সুরু করেছে। সাতটা বাজতে মাত্র কয়েক মিনিট দেরী। ট্রামে যে-কজন বাকী রয়েছে তাদের সকলেরই মনে একই প্রশ্ন: সাতটার আগে বাড়ী পৌঁছনো যাবে কিনা। চারিদিকের উদ্বেগ ও অস্থিরতার মাঝে হঠাৎ চোখে পড়লো একটি প্রশান্ত, অক্ষুব্ধ মুখ। ট্রামের ভাঙা জানলা দিয়ে বৃদ্ধ বাইরের অবিরত তুষারের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন। পরণে নিখুঁত সামরিক পোষাক, মাথার চাপ্‌কার * চারপাশে গাঢ় লাল রঙের ফিতের বেড়। সামরিক চিকিৎসক। বড় বড় শাদা গোঁফ, চোখে-মুখে সৌজন্যের আধো-হাসি, অথচ ভেতরটা হীরের মত কঠিন, অনমনীয়।

জার্মানরা শহরে ঢোকবার কিছুদিন পরেই পোলীয় উর্দির ব্যবহার অবিধেয় ও দণ্ডার্হ বলে ঘোষণা করেছে। তবুও এই অশীতিপর বৃদ্ধ সমস্ত বিপদকে অগ্রাহ্য করে আপন পদ-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাঁর দিকে তাকাতেও অস্বস্তি বোধ করি। বাড়ী ফেরার পথে জার্মান

* পোলীয় সামরিক শিরস্ত্রাণ।

সান্ত্রীরা ওঁকে রেহাই দেবে কী! বারে বারে মনে পড়ে, শাদা তুষারের ওপর বৃদ্ধের নির্জীব দেহ, অতীতকালের নাইটের মত আপন স্থৈর্য ও মহিমায় তেজস্মান্। ট্রাম যখন গন্তব্যস্থলে এসে পৌছলো এবং যাত্রীর দল উর্দ্ধশ্বাসে যে-যার বাড়ীমুখো ধাওয়া করলে, তখনো বৃদ্ধের গতি-বিধিতে সামান্য মাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল না। দস্তানার অভাবে ঠাণ্ডা হাওয়ায় জমে-যাওয়া হাত দুখানা গ্রেট-কোটের পকেটে পুরে দীর্ঘাকার ছায়ামূর্তির মত ভাঙা বাড়ীর অন্ধকারে হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেলেন।

... ...

বন্ধ ফটকের লোহার জাফ্‌রীর ভেতর দিয়ে জনহীন পথের দিকে চেয়ে থাকায় এক রকম মুক্তি আছে যা সাধারণতঃ আমরা স্বাধীন অবস্থায় অনুভব করি না। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকার পর মনে হয় যেন সমস্ত পথটা এক বিরাট সরীসৃপের মত আস্তে আস্তে চলতে শুরু করেছে। বহু দূর ধীরে ধীরে নিকট হয়ে আবার দূরে চলে যায়। সেদিন সন্ধ্যায় যখন সমস্ত ভারশো শহর নিস্তব্ধ, নিঝুম হয়ে পড়েছে তখন বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। আমাদের বাড়ীর সামনের ঐ পথটা যেন কাকে টেনে নিয়ে চলেছে। এলো-মেলো পায়ের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসে, তারপর গলার স্বর। কিছুক্ষণ পরে স্পষ্ট শুনতে পাই পোল কবি মিৎস্‌ক্যেভিচের কাব্য-নাট্য "জাদী"-র (পিতৃ-তর্পণ) আবৃত্তি। হানা শহরের ওপর এক দৃষ্টিতে চেয়ে-থাকা ঐ পৈশাচিক রাত্রির ভ্রূকুটি-কুটিল গাম্ভীর্য হঠাৎ যেন আকাশ-জোড়া এক অশুভ সঙ্কেতে থম্ থম্ করে। এলো-মেলো পায়ের শব্দ আর উন্মাদের আবৃত্তি, একশো বছর আগে কবির ভবিষ্যদ্বাণী, পোলদের যথার্থ ত্রাণকর্তার

আবির্ভাব-বার্তা :

প্রাচীন বীরের রক্তে রক্ত তার
নাম তার চারের পিঠে চার।···

পথের দুধারের জানলার আলো নিবে যায়, সর্বনাশ, পাগলটা কি ঠিক এই রাস্তা দিয়েই যেতে হয়! সমস্ত পাড়াটা যেন আতঙ্কে পঙ্গু হয়ে পড়ে। অথচ ঐ পাগলের আবৃত্তিতে যে মাদকতা তার সম্মোহনের বশে ঘরের মানুষ বাইরে তাকায়, জানলায় জানলায় দেখি অস্পষ্ট মূর্তিরেখা, শুনি হাজার মানুষের অস্ফুট চুপিচুপি কথা। ছেঁড়া উর্দি-পরা পাগলটাকে পথ যেন টানতে টানতে বহুদূরে নিয়ে গেল। আর তার স্বরের ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও কানে ধরা যায় না। শুধু দূরে বহু দূরে একটি মাত্র টোটার আওয়াজ, অতল স্তব্ধতায় যেন একটি শব্দের বুদ্বুদ।

···　　　　···　　　　···

ক্রাকভ্‌স্কিয়ে প্‌শেদ্‌ম্যেশ্চ্যের একটানা ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে ভেন্দের ডাক্তারখানাটাকে সন্ধ্যার সময়ে পথ চলতে চলতে হঠাৎ ভূতের আড্ডা বলে ভুল হয়। জানলার ধারে রাখা রঙিন জলের কুপোগুলোর ভেতর দিয়ে লাল, নীল ও সবুজ আলো তুষার-ভেজা অন্ধকার পথের ওপর কী এক অদ্ভুত রাসায়নিক আগুনের মত জ্বলজ্বল করে। ফাটা, কাগজের তালি-দেওয়া কাচের জানলা দিয়ে চোখে পড়ে লম্বা কন্তোয়ারের ওপর হেলান দিয়ে সারি সারি মানুষ যেন কী একটা অপ্রত্যাশিত ঘটবার অপেক্ষা করছে। তাদের মুখে আর কোনো প্রকাশের ছায়া মাত্র নেই, মরণ-মুখোসের মত তাদের মুখ ফ্যাকাসে, সুখ-দুঃখ, আকাঙ্খা-উদ্বেগের লেশমাত্র নেই, শুধু এক অবশ্যম্ভাবী অনাগতের প্রতীক্ষা তাদের আকৃতিতে সামান্য মানুষিক রূপ দিয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যায় ভেন্দের ডাক্তারখানায় ঢুকে চমকে উঠলাম। শুনি

কার অট্টহাসি। মেয়েলী-গলায় অসম্বৃত হাসি, বে-আব্রু, কুৎসিত। সে-হাসি নিখাদে শুরু হয় তারপর পর্দায় পর্দায় উঠে চলে। বহু উচ্চ স্তরে খানিকক্ষণ ধরে রন্‌রন্‌ করতে থাকে তারপর সহসা নেমে আসে, পরে কার কণ্ঠনালীর ভেতর অনেকক্ষণ চলে যেন এক অদ্ভুত হাসির কুলকুচো, তারপর আবার নিখাদে গিয়ে হাজির হয়। সেই কান্নাহীন হাসি রাত্রির নিস্তব্ধতায় বহুদূর পর্যন্ত পোড়া বাড়ীর অতি গোপন ও বিস্মৃত কন্দরে কন্দরে অসংখ্য হাসি জাগিয়ে তোলে।

সেই হাসির উৎপত্তি আবিষ্কার করে অবাক হয়ে যাই। চোখে-মুখে সামান্য হাসির কুঞ্চন পর্যন্ত নেই। পরণে সন্থ-বিধবার রুক্ষ বাস, হাতে কয়েকটা খালি ওষুধের শিশি, এক অদ্ভুত মুখ-ভঙ্গি করে শিশি-কটা কন্তোয়ারের ওপর রেখে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে, তারপর একটি একটি করে হিসেব করে নেয়, যেন এইমাত্র কম্পাউণ্ডার ওষুধ তৈরী করে তার হাতে দিলে, খানিকক্ষণ পরে আবার বোতলগুলি সারি সারি সাজিয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে চলে সেই বিকট, বে-আব্রু অট্টহাসি।

যুদ্ধের সময়ে একদিন সন্ধ্যায় রুগ্ন স্বামীর জন্যে ওষুধ নিতে এসে তার আর বাড়ী ফেরা হয় নি। শহরের বাইরে মোতায়েন জার্মানী কামানের গোলা বাড়ীর আধা-আধি উড়িয়ে নিয়ে গেছে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসের সঙ্গে সুর মেলানো এই হাসি সেইদিন থেকে ভূতের মত তাকে পেয়ে বসেছে।

২রা নভেম্বর পোলদের ভূত-চতুর্দশী। ওরা প্রাক্-খ্রীস্তান্ যুগের আচার আজও পরিত্যাগ করে নি। প্রতি বৎসর ২রা নভেম্বর আপন আপন নিকটতম ও আত্মীয়-স্বজনের উদ্দেশে কবরস্থলে প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে আসা পোলদের রীতি। সন্ধ্যার আগেই বাতী জ্বেলে যে-যার বাড়ী ফেরবার জন্যে দুপুর থেকেই ভারশৌএর প্রধান কবরভূমি পওঁস্কি লক্ষ্য করে হাজারে হাজারে লোক চলতে সুরু করলে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও সেদিন কয়েক ক্রোশ পথ হেঁটে পওঁস্কিতে গিয়ে হাজির হলাম।

যুদ্ধোত্তর পওঁস্কির চেহারা জীবন্ত দুঃস্বপ্ন। ভাস্কর্যের পরাকাষ্ঠা শত শত মূর্ত্তি, প্রতিমূর্ত্তি, মর্মর-কারুকার্য চূর্ণ হয়েছে। যেন প্রতিমূর্ত্তির যুদ্ধ-ক্ষেত্র। ভাঙা পাথরের সঙ্গে সঙ্গে মাটীর নীচের কঙ্কালও আপন আপন কফন্ ভেঙে বাইরে এসে হাজির হয়েছে। কেউ পথের ধারে শুয়ে পড়েছে, কেউ একটা পাথরের বেঞ্চের ওপর হেলান দিয়ে বসে রয়েছে; বেশীর-ভাগ কঙ্কালেরই হাড়-গোড় ছিন্ন ভিন্ন, অতি সাবধানে পথ চলতে হয়, এখানে ওখানে হাত, পা, নরমুণ্ড। এদেরই একজন বোমার আশ্চর্য প্রতিক্রিয়ায় আপন কফন্ ছেড়ে একটা গাছের ওপর

হাজির হয়েছে ; ডালের দু-পাশ দিয়ে তার ঝোলানো দু-খানা পা আর শূন্য মুখের অস্থিময় নীরব হাস্য জীবনে ভুলবো না।

২রা নভেম্বর যারা বাতী দিতে এসেছিল তাদের অনেকেই আপন আপন আত্মীয়-স্বজনের হদিশ পর্যন্ত পেলে না। যারা বহু কষ্টে আপন পারিবারিক কবরস্থল খুঁজে বের করলে তাদের অনেকেরই সমস্যা হলো, কোন্ কঙ্কাল কার পিতৃ-পুরুষের। যদিওবা অনুমান-রীতিতে তা কারো কারো পক্ষে স্থির করা সম্ভব হলো, কিন্তু কোন্ হাত বা কোন্ পা কোন্ কঙ্কালের সে-সমস্যার সমাধান সৃষ্টি-কর্তার ওপর অর্পিত করে কোনো রকমে জোড়া-তাড়া দিয়ে কঙ্কালদের কফিনে পুরে পুনরায় ভূগর্ভে ন্যস্ত করা হলো।

বেলা থাকতে থাকতেই যে-যার বাতী জেলে দিয়ে হাজারে হাজারে মানুষ আবার বাড়ীমুখো ধাওয়া করলে। পর্ভ স্কির কাছেই একটা চা-খানায় হেরবাতুম্ খেতে গিয়ে একটি বছর ষোল বয়েসের মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হলো। সে তার ভায়ের কবরের ওপর বাতী দিতে এসেছিল। সঙ্গে কেউ নেই এবং এই কঠোর কর্তব্য পালন করে একা বাড়ী ফেরবার মত তার সামর্থ্যও নেই। কথায় কথায় পরিচয় হয়ে যাওয়াতে এক সঙ্গে শহরে ফিরি। পথে তার কাছে তার ভায়ের মৃত্যুর কথা শুনি :

আমার বয়েস ষোল আর য়ানেকের বয়েস আঠারো। বাড়ীতে মা আর আমরা দু-জন, বাবাকে আমাদের মনেও পড়ে না। এই পর্ভ স্কিতেই যখন তাঁকে শুইয়ে যায়, তখন আমাদের জ্ঞান হয় নি। য়ানেক্ ভয়ানক ভালো ছেলে ছিল, ইস্কুলে বরাবর ফার্স্ট্ হয়ে গেছে। এই যুদ্ধ বাধবার কিছুদিন আগেই ম্যাট্রিক দিয়েছিল। ইউনিভার্সিটিতে যাবার সব ঠিকঠাক। এমন সময়ে যুদ্ধ বাধলো। য়ানেক্ সৈনিক হবার জন্যে ঝুলো-ঝুলি। মা কিছুতে মত দেবে না, য়ানেক্ও যে-রকম

গোঁয়ার-গোবিন্দ আর একগুঁয়ে, একদিন কয়েকজন বন্ধুতে মিলে ফেরার। অবশ্য এতে আমারও মত ছিল। শ্বাব্‌রা শহরের একেবারে দোরগোড়ায় এসে পড়েছে। তখন আর বয়েসের বাছবিচার করবার সময় নেই। য়ানেক্‌ বেচারীর ভারী দুঃখু সে খাঁটি সৈনিকের মত উর্দি পরে যুদ্ধে যেতে পেলে না। যাই হোক, ওরা দল বেঁধে শ্বাব্‌দের সঙ্গে লড়াই করতে গেল। মাকে অবশ্য মিথ্যে কথা বলে ভুলিয়ে রাখলাম, বললাম য়ানেক্‌ ফ্রান্সে পালিয়েছে। শ্বাব্‌রা শহর দখল করলে য়ানেক্‌দের মত বয়েসের ছেলেদের আর রাখবে কী? মা বলে, গেছে ভালোই হয়েছে, কিন্তু হতচ্ছাড়া ছেলে যাবার আগে একবার বলেও গেল না!—মাকে বোঝাই, বলে গেলে তুমি যেতে দিতে কিনা! বিদেশে ওরা দেশের জন্যে কত কাজ করতে পারবে বলো তো! যখন ফিরবে তখন তোমার য়ানেকের দেমাকে তোমার আর মাটীতে পা পড়বে না।—সেই ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করে মার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। য়ানেক্‌ মার ভারী আদুরে ছিল কিনা। অত বড় ছেলে, মার কাছে না হলে শোবে না।···

···যুদ্ধ শেষ হলো, যে-যার বাড়ী ফিরে এলো, য়ানেক্‌ কিন্তু ফিরলো না। মা ভারী খুশী, বলে, ভাগ্যিস্‌ য়ানেক্‌টা ফ্রান্সে পালিয়েছে, বাবা, আমার হাড় জুড়িয়েছে। শ্বাবরা তখন দলে দলে গ্রেপ্তার করছে কিনা। তাছাড়া য়ানেক্‌ ফ্রান্সে গেছে, দেশের জন্যে কাজ করতে, মা পাড়া-পড়শীদের কাছে গল্প করে আর ফুরতে পারে না, য়ানেক্‌ কী রকম বুদ্ধিমান্‌, চতুর, শ্বাব্‌দের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে, এই সব কথা। আমার মনটা কিন্তু একেবারেই মানতে চায় না, কে যেন কানে কানে বলে, য়ানেক্‌ নেই। একদিন য়ানেকের বন্ধুর সঙ্গে পথে দেখা। বলেক্‌, সেও খুব ভালো ছেলে ছিল, য়ানেকের গলায় গলায় বন্ধু। বলেক্‌

বললে, মাকে বলিস্ নি ভাই, য়ানেক্…। আমার মন ঐ খবর শোনবার জন্যে আগে থেকেই তৈরী হয়েছিল। খবরটা শুনে আমার যেন কিছুই হলো না, যেন য়ানেক্ আমার নিতান্ত পর। আমরা পিঠো-পিঠি ছিলাম কিনা। হয়তো ভেতরে ভেতরে য়ানেক্‌কে আমি ভারী হিংসে করতাম। বলেক্ খবরটা আমাকে দিতে গিয়ে কেঁদে ফেললে। আমার কিন্তু যেন কিছুই হলো না। একেবারে সহজভাবে জিজ্ঞেস করলাম, তাকে কোথায় রাখলি রে? বলেক্ বললে—ভ্যেঝ্‌ব্‌নোয়, আমরা কি শহরের বাইরে যেতে পারলাম? ভ্যেঝ্‌ব্‌নো দিয়ে যেতে গিয়ে যুদ্ধে আটক পড়লাম। ঠিক যেখানে শহর শেষ হয়ে পাড়া-গাঁ পাড়া-গাঁ ভাবটা চোখে পড়ে সেইখানেই তখন ফ্রন্ট্। আমরা প্রথমে খানা খোঁড়বার কাজ পেলাম, স্যাপার-গিরি আর কী? য়ানেক্ তাতে খুশী নয়। শেষকালে সেখানকার মেজরকে বলে আমরা হাতিয়ার পেলাম। সৈনিকদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেব মত স্বেচ্ছাসেবক হাজারে হাজারে লড়তে এসেছে। জানিস্ তো য়ানেক্ কী রকম গোঁয়াব-গোবিন্দ ছিল। একদিন একেবারে ফ্রন্ট্ ছাড়িয়ে শ্বাব্‌দের মাঝে গিয়ে হাজির হবার জন্যে ধাওয়া করলে। তার হাতের টিপ্‌ও ছিল অদ্ভুত, গোটা দুইকে ঘাল করেছিল। কিন্তু তাকে বেশী দূর যেতে দিলে না, মাঠের মাঝখানে সে হঠাৎ শুয়ে পড়লো। চারিদিক থেকে গুলী ছুটেছে। আমরা সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করে সেইখানেই তাকে মাটী খুঁড়ে শুইয়ে দিয়েছি…

…তারপর বলেক্ বললে, মাকে বলিস্ নি যেন, আমি বলি কি, চল্, কাল-পরশু সন্ধ্যে নাগাদ সেখানে গিয়ে তাকে তুলে নিয়ে আসি। রাতারাতি শহরের বাইরে দিয়ে পর্ভস্কিতে হাজির করবো, কী বল্? ও-রকম অবস্থায় ফেলে রাখা কিছু নয়। আমরা কি তাকে একটা কফিন্ পর্যন্ত দিতে পেরেছি!…

…তার পরের দিনই, প্রশে পানা, মাকে কিছু না বলে, মাসীর বাড়ী যাবার ছুতো করে বলেক্‌ আর আমি ভ্যেব্‌ব্‌নোতে গিয়ে হাজির হলাম। য়ানেক্‌কে একেবারে চেনা যায় না। শুধু তার শখের ইস্কুলের ইউনিফর্ম ছিল তাই, আর পকেটে তার কাগজপত্র এককাঁড়ি, যুদ্ধের ডায়েরী, কবিতা এই সব। যাই হোক, আগে থেকেই কফিন্‌, মানে কেরোসিন কাঠের বাক্স দিয়ে তৈরী আর কি, কফিন্‌ই বলুন আর যাই বলুন, জোগাড় করা ছিল। সেই কফিনে করে বলেক্‌ আর আমি কখনো কাঁধে করে কখনো মাঠের ওপর দিয়ে টানতে টানতে পভ‌ঁস্কিতে নিয়ে গেলাম। সারা-রাত পথে কাটলো। গাঁয়ের দিকেও শ্বাব্‌রা আছে কিনা, তাই মাঠ দিয়ে মাঠ দিয়ে চলতে হলো। বাবা, সে কী অন্ধকার! পরের দিন পভ‌ঁস্কিতে বাবার কবরের কাছে তাকে শুইয়ে দিলাম। আজ এক মাস হয়ে গেল। মার আজও বিশ্বাস, য়ানেক্‌ ফ্রান্সে গেছে, দেশের কাজ করতে। সত্যি, জানেন, আমার মনে হয়, ঐ খবর শোনবার আগে মা যদি মারা যায় তো আমার একটুও দুঃখু হবে না। যদি ঘুণাক্ষরে টের পায় যে য়ানেক্‌ নেই, তো মাকে কী করে সামলাবো বলুন তো? আজ আমার যা ভয় করছে, কেবলই মনে হচ্ছে, বাড়ী গিয়ে হয়তো কেঁদে ফেলবো।…

মেয়েটির গল্প শুনতে শুনতে একেবারে শহরের মাঝখানে এসে পড়েছি। ভাঙা শহরে সেদিন এক অদ্ভুত দেওয়ালী। পথের দু-ধারে যেখানে যতটুকু খালি জায়গা পড়ে আছে সেইখানেই সারি সারি বাতী জ্বলছে। ভারশৌ-এর সম্মান রাখবার জন্যে যারা স্বেচ্ছায় প্রাণ দিয়েছে দেশের লোক তাদের ভোলে নি। যেখানে যেখানে কবরের সামান্য নিশানা পেয়েছে সেইখানেই ওরা বাতী জ্বেলে দিয়েছে। লাখে লাখে বাতী, শহরের ভগ্নস্তূপ আর ভস্মস্তূপ আলোয় ঝলমল করে। কারো

মুখে কথা নেই, তাড়াতাড়ি বাতী জেলে দিয়ে ওরা সাতটার আগে বাড়ী ফেরবার জন্যে হন্‌হন্‌ করে পথ চলে। প্লাৎস্‌ ট্রেছেথ্‌ কৃশ্চীঝ্যী-র ছোট্ট পার্কটা আলোয় জ্বলজ্বল করছে। এক জায়গায় লক্ষ্য করলাম, সারি-দেওয়া আটটি বাতীর কাছে একটুরো কাঠের ওপর আটটি নাম লেখা। কয়েক গজ মাটীর নীচে সমগ্র একটি পরিবার চিরবিশ্রাম লাভ করেছে। বাড়ী ফিরে ঘুমোতে পারি না। জানলা দিয়ে সারা রাত পথে জেলে-দেওয়া হাজার হাজার বাতীর আলো আসে।

বিরাট নক্ষত্র-মণ্ডলীর মাঝে পৃথিবী-গ্রহের পৃষ্ঠে পোলদেশের রাজধানী ভারশৌ শহরের এই আলোর S. O. S. সেদিন বিধাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল কিনা জানিনা।

নভেম্বরের গোড়াতেই পোলদেশে নয়া বন্দোবস্ত কায়েম হলো। ভারশৌ জঙ্গীদের হস্ত থেকে গেস্তাপোর দস্তে ন্যস্ত হলো, যদিচ বহুদিন ধরে চললো লোফালুফি। শাসন করতে কোনো তরফেরই আপত্তি নেই, তবে জিম্মাদারীতে দু-পক্ষেরই অমত। ফলে শুরু হলো দায়িত্বজ্ঞানকে স্থগিত রেখে শাসনকার্যে প্রতিযোগিতা। ভারশৌএর পথ-ঘাট লোকে লোকারণ্য, জঙ্গীরা উর্দি পরে আর গেস্তাপোর অনুচরবৃন্দ আটপৌরে পরিচ্ছদে শহরে সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে প্রবৃত্ত হলো। সেই প্রথম নজরে পড়লো জার্মানদের উর্দির বৈচিত্র্য। ইউরোপের যত দেশে যত উর্দি পরিকল্পিত হয়েছে তার সব কটিরই নকল পাওয়া যাবে হিট্‌লারী ফৌজে। নিখুঁত ফরাসী, নিখুঁত ইংরেজী, নিখুঁত বেলজিয়ান্, নিখুঁত ওলন্দাজ উর্দি ভার্শৌএর সর্বত্র এত চোখে পড়ে যে মনে হয় শহরে এক আন্তর্জাতিক সামরিক বোঝাপাড়া শুরু হয়েছে। বিভিন্ন দেশের উর্দি পরিয়ে সেই দেশের ভাষায় রপ্ত করিয়ে দলে দলে পারাশ্যুৎ ফৌজ নামিয়ে দিলে যে তারা পঞ্চম খাম্বা রূপে গোয়েন্দাগিরি ও সাবতাঝ্ করতে সমর্থ হবে এ-আশঙ্কা সব দেশেই ছিল। কিন্তু নিখুঁত উর্দি পরা পঞ্চম বাহিনীর আসল চেহারা চোখে পড়েছিল ভারশৌএ। যতদূর

মনে হয়, জার্মানী থেকে সরিয়ে এনে ভারশৌএরই কাছে কোথাও ঐ নকল ফরাসী, ইংরেজ, বেল্‌জ্‌, ওলন্দাজ, দিনেমারদের আপন আপন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি শিক্ষা দেওয়া চলছিল।

খাস্‌ জার্মান উর্দিরও অপ্রতুলতা নেই, বেশীর ভাগই হুনীয় কঠোর মুখাকৃতিকে কঠোরতর করে তোলবার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার লালিত্য বর্জিত। এদেরই মধ্যে এক দলের কাজ হলো পোলদের পথ চলতে শেখানো। পথ চলা সম্বন্ধে পোলরা বরাবরই সচেতন। যুদ্ধের আগে রাস্তা পার হবার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করার অপরাধে দু জ্‌লতীব জরিমানা দেয় নি এমন পোলের সংখ্যা অল্পই ছিল। জার্মানরা পোলদের এই অভিমান খর্ব করবার জন্যেই বোধ হয় তাদের পৌর-শিক্ষা-দানে ব্যাপৃত হলো। মোড়ে মোড়ে মোতায়েন হলো মোটা কেঠো চেহারার জার্মান সামরিক পুলিস। হাতে ফ্রাইংপ্যানের মত দণ্ড নিয়ে হাঁস ফাঁস করতে করতে কখনো চোখের ইশারায়, কখনো শিরঃসঞ্চালনে পথের গাড়ী, ঘোড়া, মানুষ, কুকুর, বেড়ালের গতি নির্দ্ধারিত করতে লাগলো। পৌলীয় পুলিসের কাজ হলো এদের শিক্ষানবিশী করা।

গেস্তাপোদের হঠাৎ ধরা যায় না। পথের ভিড়ের মধ্যে নিতান্ত ভালোমানুষ ও নিতান্ত উজ্‌বুক্‌ চেহারার কাউকে লক্ষ্য করলে যে তাকে এড়িয়ে যাওয়া আবশ্যক, এটুকু শহরের মানুষ অল্পদিনেই শিখে ফেলেছে। যখন গ্রেপ্তার করে তখনো ঠিক ধরা যায় না, ওরা কাউকে গ্রেপ্তার করলে কিংবা কোনো নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার জন্যে কাউকে নিভৃতে সরিয়ে নিয়ে গেল। অনেক সময়ে মনে হয় যেন এক ইয়ার অপর ইয়ারকে কী একটা নোংরা ও রসালো গল্প শোনাবার জন্যে একপাশে টেনে নিয়ে গেল। শিকারের কাঁধে হাত রাখার ভঙ্গীটি পর্যন্ত লক্ষ্য করবার মত।

গেস্তাপোর স্পর্শ লাভ করবার সৌভাগ্য যাদের ঘটেছে তাদের

অধিকাংশই পরপারে। "আলেয়া স্থখা" রাস্তায় পোলদের সামরিক বিভাগের প্রকাণ্ড বাড়ীখানা গেস্তাপো আফিস। বাইরে থেকে শুধু চোখে পড়ে জানলায় জানলায় ভাঙা শার্শীর জায়গায় নানা পোলীয় নায়কদের ছবি উল্টো করে এঁটে দেওয়া। ওদের ভেতরকার কার্যকলাপ, সলা-কলাব সঙ্গে কারো চাক্ষুস পরিচয় নেই। একবার গেস্তাপোর চৌকাঠ মাড়িয়ে যারা ফিরেছে তারা জীবন্মৃত অথবা উন্মত্ত। যারা ফিরেছিল তাদের মধ্যে একজনের কথা মনে পড়ে।

পোলীয় নাট্যকলায় ভেঙ্গ্‌ঝ্যীনের নাম দেশজোড়া। যুদ্ধের আগে ভারশৌএ বার্নার্ড্‌ শ'র "নায়ক" নাটক হঠাৎ অত্যন্ত লোকপ্রিয় হয়ে ওঠে। এবং সেই নাটকে হিট্‌লারের অভিনয় করেন ভেঙ্গ্‌ঝ্যীন্‌। সভ্য জগতে কোনো নটকে অভিনয়ের জন্যে দায়ী করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। পোলদেশ অধিকৃত হবার সঙ্গে সঙ্গেই লিস্টি মিলিয়ে গেস্তাপো যাদেব গ্রেপ্তার করলে ভেঙ্গ্‌ঝ্যীন্‌ তাদের মধ্যে একজন। তাঁর ওপর যে অকথ্য অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয় সে-কথা স্বয়ং ভেঙ্গ্‌ঝ্যীনও পরে স্বীকার করতে ভয় পেতেন। অত্যাচারের মাত্রা ও প্রকার-ভেদ যে ভয়াবহ তার পরিচয় এই যে, গেস্তাপো তাঁর আংশিক মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটাতে সমর্থ হয়েছিল। যাই হোক কয়েক মাস নির্যাতনের পরে যে-ভেঙ্গ্‌ঝ্যীন্‌কে ওরা মুক্তি দিলে তার সঙ্গে দেশ-বিশ্রুত ভেঙ্গ্‌ঝ্যীনের কোনো সম্পর্কই নেই। কিন্তু গেস্তাপোর পাকা হাতের কারিগরী ভাঙা মানুষকে জিইয়ে রাখা এ-ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলো। একদিন পথের মাঝখানে এক হৈটলার আপন আরাধ্য মহাপুরুষের অবমাননার প্রতিশোধ নিলে। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে ভেঙ্গ্‌ঝ্যীনের মেরুদণ্ড ভেঙে দিলে। কিছুদিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করার পর ভেঙ্গ্‌ঝ্যীন্‌ বিনা পাস্‌পর্তে কোন্‌ এক অজানা দেশে যাত্রা করলেন।

সারা নভেম্বর মাস ধরে ধর-পাকড় চলতে লাগলো। যে-সমস্ত যুদ্ধ-ফের্তা অফিসার ও রিজার্ভ অফিসারদের তালিকা প্রস্তুত হচ্ছিল তাদের নাম-ধাম শুদ্ধ কয়েকখানা মোটা মোটা বই লোপাট হলো। সুতরাং জার্মানরা ঘোষণা করলে অমুক দিনে যেন সমস্ত অফিসাররা মাত্র একটি ছোট্ট অ্যাট্যাচি-কেসে আপন আপন সামান-পত্র নিয়ে অমুক স্টেশনে হাজির হয়। মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্করকে এড়াবার জন্যে অনেকেই কর্তৃপক্ষের আহ্বানে সাড়া দিলে। তবে সরকার যে-পরিমাণে মাল-গাড়ী মজুত রেখেছিল তার ভগ্নাংশও পূর্ণ হলো না। সুতরাং পথে-ঘাটে যাকে-তাকে গ্রেপ্তার করে সেই অভাব পূর্ণ করা চলতে লাগলো। নভেম্বরের ১০ই একটি স্মরণীয় দিন। ১১ই নভেম্বর পোলদের স্বাধীনতা দিবস। পাছে ঐ দিনে পোলরা গোলমাল শুরু করে এই আশঙ্কায় ১০ই হাজারে হাজারে পুরুষকে গ্রেপ্তার করা হলো। এক-একটা রাস্তার দু-দিক বন্ধ করে দিয়ে মাঝখান থেকে ছেঁকে নিয়ে গাড়ী ভর্তি করা। গ্রেপ্তার করার এর চেয়ে সরল ও নির্ঝঞ্ঝাট উপায় কারো মাথা থেকে বেরিয়েছে কিনা সন্দেহ।

১১ই নভেম্বর পথ-ঘাট ফাঁকা। স্বাধীনতা-দিবসে পোলরা হড়তাল করেছে।

প্রতি বৎসর ১২ই নভেম্বর মার্চিন্ ঠাকুর শাদা ঘোড়ায় চড়ে আকাশ বেয়ে সটান পোলদেশে নেমে আসতেন, আর তাঁর পেছু পেছু আসতো একটি একটি তুষারের পাপড়ি, হাওয়ায় ভর করে অনেকক্ষণ ঘুরে ফিরে ছাদের আলসে বা গাছের পাতায় পড়ে আস্তে আস্তে গলে যেতো। তারপর শুরু হতো তুষারের ঝড়। পথ-ঘাট শাদা হয়ে যায়, দরজা-জানলা নাড়া দিয়ে, ঘরের চিম্‌নীর ভেতর হল্লা করে, খানা-ডোবা জমিয়ে, হু-হু শব্দে পাতা ঝরিয়ে নবাগত শীতের ক্ষেপামি সে এক পরম উপভোগ্য দৃশ্য। দুনো কাচের জানলা আটে-কাটে বন্ধ করে ঘরের ভেতর বীট-পালমের লাল সূপ, গরম কচুরীর মত পূর দেওয়া ছোট ছোট বাহারে পেস্ট্রী, রোস্ট্-করা হাঁস, পের্লীচ্‌কা * ঈন্দ্যীক্ † বহিঃ-প্রকৃতির রিক্ততাকে নিবিড়তর করে তুলতো।

সে-বছর এলো শীত, কঠোর, নির্মম, দুর্দ্ধর্ষ, পুঞ্জীভূত দেবতার অভিশাপের মত। শহরের অর্দ্ধেক মাঠ হয়ে গেছে, শীতকে প্রতিরোধ করবার জন্যে নেই ঘন-সন্নিবিষ্ট গৃহের আতাপ, নেই নাগরিক জীবনের পারস্পর সান্নিধ্য, নেই দরজা, জানলা, দেওয়াল, নেই আহার্য, নেই ইন্ধন।

* গিনী-ফাউল। † পেরু।

মানুষের জীবন ধারণের জন্যে আহার্যের চেয়ে ইন্ধনের প্রাধান্য যে কতখানি তা অনুভব করলাম অধিকৃত ভারশৌএ। বুভুক্ষার আঁচড়ে জ্বালা আছে বটে, কিন্তু তা অনেক সময়ে মানুষকে চাঙ্গা করে তোলে, কর্মে প্রবৃত্ত করে, শিকার বা ভিক্ষার অন্বেষণে বাইরে টেনে আনে। শৈত্যের প্রতিক্রিয়া অন্য রকমের। তা মানুষকে আস্তে আস্তে অবশ করে ফেলে। সর্পদংশনের ঘোর লাগার মত মানুষ চেতনা থেকে আ-চেতনা তারপর অচৈতন্যের অন্ধকার অতলে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে নেমে চলে। ভারশৌ যখন জনপদ থেকে জনতায় পরিণত হয়েছে তখন জীবন-ধারণের প্রথম সমস্যা হলো দেহের উত্তাপকে কোনো প্রকারে বজায় রাখা। দু-এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই শহরের মানুষ আবিষ্কার করলে ভারশৌএ একটুকরো কয়লা নেই।

যারা এতদিন পোড়া দোর-জানলার কাঠ-কয়লায় উত্তাপ সঞ্চয় করছিল তারা আপন আপন অবশিষ্ট আসবাব জ্বালাতে শুরু করলে। এবং পুরাকালে প্রথম অগ্নি-আবিষ্কারের যুগের মত একের আগুনে দশে এসে ভাগ বসালে। এমত সময়ে জনরব শোনা গেল, মহামহিম জর্মান সরকার পোলদের জীবন-রক্ষার উদ্দেশ্যে আপন পিতৃদেশের খনিজ অঙ্গার শহরে এনে হাজির করেছেন। খবর শুনে কয়লা-ওয়ালারা কাতাবে কাতারে খালি বস্তা ঠেলা-গাড়ীতে চাপিয়ে স্টেশনের ধারে গিয়ে তথা-কথিত কৃষ্ণ-হীরকের অপেক্ষা করতে লাগলো। আর তাদের বন্ধ দোকানের সামনে সারি দিয়ে দাঁড়ালো হাজারে হাজারে মানুষ।

দিনের পর দিন ঐ অসহ্য শীতে বন্ধ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে অনেকেই শূন্য-পাত্র নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। যারা টিকে রইলো তারা এক-আধ সের যে পেলে না তা নয়। অথচ শহরের জায়গায় জায়গায় শাদা তুষারের ওপর অঙ্গারের গতি-চিহ্ন পরবর্তী তুষার-পাত

পর্যন্ত তার অস্তিত্বের কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে লাগলো। শহরে কয়লা এসেছে সে-কথা আর গোপন করা চললো না। জার্মানরা পোলীয় পুঁজীকরদের ওপর দোষারোপ করলে। তাদের হৃদয়হীনতা, স্বার্থপরতা ও দেশাত্মবোধের অভাব সম্বন্ধে নানা সংবাদ সরকারী অখবারে প্রকাশ পেলে। কিন্তু শীতার্ত জনতার দৈহিক উত্তাপ সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থাই করা হলো না। পরবর্তী আমদানীর সময়ে যাতে অঙ্গার-বণ্টনে সুব্যবস্থা হয় তা নিয়ে নানা তর্ক ও বিচার চলতে লাগলো, এমন কি কার কত টন্ কয়লা দরকার তার সুদীর্ঘ তালিকাও প্রস্তুত হলো।

শহরে কয়লা নেই। জার্মানরা নিজের নিজের ময়লা কলারের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করে জানিয়ে দেয়, তাদেরও কয়লা নেই, দেখছো তো, এমন কি ময়লা কাপড় ফুটিয়ে সাফ করবারও তাদের সংস্থান নেই! অথচ শহরের তুহীন-পরিচ্ছন্ন আকাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে ধোঁয়া, ধূমের অস্তিত্বে অগ্নির অস্তিত্ব স্বতঃ প্রতীয়মান হয়, পথের মানুষ অবাক হয়ে ধূম-কুণ্ডলীর সৌন্দর্য উপভোগ করে, কল্পনায় লাল, নীল, গৈরিক অগ্নি-শিখার ওপর জমে-হাওয়া অসাড় হাত সেঁকে।

এমনি করে দিন যায়। তারপর যখন দু-এক জায়গায় সরকারী কয়লা-বিতরণ ও তার ফটো ও ফিল্‌ম্ তৈরী হয়ে জার্মানদের করুণার বার্তা বহন করে প্রোপাগান্দা-সাহিত্য বিদেশে যাত্রা করেছে তখন প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা হলো—শহরে কয়লা আছে, তবে তা শুধু জার্মান, ফল্‌ক্‌স্‌-ডয়েচ্ ও তাদের পুষ্যি-পুত্তুর উক্রাইনীদের জন্যে। পোলদের যদি এতই কয়লার দরকার তো তারা যুদ্ধের আগে জার্মানীর সঙ্গে কয়লার বাজারে প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিল কোন্ মুখে, এবং কয়লার জন্যে যদি তাদের জার্মানীর ওপর নির্ভরই করতে হয় তো তারা তাদের সঙ্গে লড়তেই বা গিয়েছিল কোন্ ভরসায়?

এই বান্দার কয়লার ব্যবস্থা আগেই করা ছিল। বোমার পশলা অগ্রাহ্য করে দিদি তুলেছিলেন মামুস্ত্যার বাড়ীর মাটীর নীচের ঘরে। মামুস্ত্যার বাড়ী বোমার চোটে গুঁড়ো হলেও সেই সুড়ঙ্গস্থ অঙ্গারের একটুকরোও নষ্ট হয় নি। সুতরাং উক্ত খনিজকে এই অভিনব খনি থেকে উদ্ধার করবার কোনো তথ্‌লিফ্‌ই নেই। শুধু তাকে স্থানান্তরিত করা এই যা। সমস্যা হলো, কী উপায়ে তাকে মামুস্ত্যার সুড়ঙ্গ থেকে মদীয় আস্তানায় স্থানান্তরিত করা যায়? প্রথমতঃ, গাড়ী, ঘোড়া, স্লেজ্‌ ইত্যাদি মর মানুষের ব্যবহারের জন্যে শহরে পাবার উপায় নেই। দ্বিতীয়তঃ গাড়ী পেলেও উক্ত অঙ্গারকে জনসাধারণের চোখের সামনে ব্যক্ত করলে লুট-তরাজ, গেস্তাপো কর্তৃক গেরেফ্‌তার এবং তার চেয়ে শোচনীয় অবস্থা, জনসাধারণ কর্তৃক জার্মানী গোয়েন্দা বা উক্রাইনী রূপে গণ্য হবার সম্ভাবনা।

সুতরাং মুস্কিল-আসানী বুদ্ধির জন্যে দিদির কাছে দরবার করতে হয়। দিদি বলেন—হ্যাঁরে, তোর সংসারী বুদ্ধি কবে হবে বল্‌ তো! এই নে আমার রুক্‌-সাক্‌, সন্ধ্যের কিছু আগে গা-ঢাকা মতন হয়ে এলেই, ব্যস্‌ দু-পাঁচ সের যা পারিস রুক্‌-সাকে ভরে নিজের আস্তানায় নিয়ে গিয়ে তুলবি। বল্‌ তো, আর একটা রুক্‌-সাক্‌ নিয়ে আমিও খানিকটা বয়ে দিয়ে আসতে পারি।

বলি—রক্ষে করো দিদি। তোমার ঐ লম্বা লম্বা পা ফেলে দুম্‌ দুম্‌ করে হাঁটবে, তোমার সঙ্গে ঐ বোঝা নিয়ে কদম মেলাতে গিয়ে আমি মারা যাই আর কী!

দিদির রুক্‌-সাকে দু-পাঁচ সের করে কয়লা প্রয়োজন মত নিজের আস্তানায় নিয়ে গিয়ে হাজির করি।

একদিন সন্ধ্যায় কয়লা বইবার সময়ে একটি মর্মন্তুদ ঘটনার কথা মনে পড়ে।

মামুস্তার সুড়ঙ্গ থেকে সের দশেক কয়লা রুক্-সাকে ভরে পিঠে চাপিয়ে পথে বেরতেই ঝুপ্-ঝুপ্ করে তুষার নামলো। হাতে ঘণ্টাখানেক সময়, সুমুখে মাইল চারেক তুষার-পিচ্ছিল পথ, পায়ে জুতোর ওপর রবারের গলশ্। নুনের পাথরের মত শক্ত চক্‌চকে বরফের ওপর রবারের প্রতিক্রিয়ায় এক পায়ে তিন পা পথ অতিক্রম করা যত সহজ তার চেয়ে এক গোড়ালি থেকে অপর গোড়ালি পর্যন্ত সাত পা ব্যবধান সৃষ্টি করে শূন্যে দু-হাত দিয়ে হাঁকু-পাঁকু করতে করতে ঐ বরফের ওপর চিৎপতিত হওয়া আরো সহজ। তাই মাথা নীচু করে পিঠের বোঝা, পেটের ক্ষিদে এবং পায়ের গতির সামঞ্জস্য রক্ষা করে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির সঙ্গে আপন শীর্ষক অস্তিত্বকে কোনোরূপে খাপ খাইয়ে পথ চলি।

হটাৎ দুটি ছোট ছোট ঠাণ্ডা হাত আমার একটা হাত চেপে ধরলে। সমস্ত মুখখানি ওপর দিকে তুলে একটি বছর পাঁচেকের মেয়ে জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ গা, তুমি কয়লা পেলে কোথায় গো?

অবাক হয়ে শুধাই—আমার পিঠে কয়লা তুমি জানলে কী করে খুকী?

পাকা গিন্নীর মত মুখ গম্ভীর করে উত্তর দেয়—হ্যাঁ, আমি বুঝি কচি খুকী! ঐ যে থলেটা এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো হয়ে রয়েছে ও আলুও নয়, কোপিও নয়, মাংসও নয়, অর্থাৎ কিনা কয়লা। তাছাড়া জানলা থেকে দেখতে পেয়ে মা আমায় জিজ্ঞেস করতে পাঠালে, তুমি কয়লা কিনলে কোথায়? তাই তো এক দৌড়ে তোমার কাছে এসেছি। বাপ্‌স্, তুমি যে-রকম্ হন্ হন্ করে হাঁটো, তোমায় ধরে কার সাধ্যি?

তোমাদের বাড়ীতে কয়লা নেই বুঝি ?

ঠোঁটের ওপর একটি আঙ্গুল রেখে দুশ্চিন্তার ভাণ করে বলে—একটি টুকরো নেই। এই দেখ না আমার হাত কী রকম ঠাণ্ডা !—তারপর কী মনে করে হেসে লুঠিয়ে পড়ে। বলে—সে ভারী মজা। কয়লা নেই তো কয়লা নেই, ওমা, বাবা করলে কী, কুড়ুল নিয়ে চেয়ার, টেবিল, কাঠ-কাটরা যা ছিল সব টুকরো টুকরো করে কেটে আগুন জ্বাললে। শুধু খাটগুলো বাকী। মা কিছুতেই খাটগুলোকে কাটতে দেবে না। তাছাড়া ঠাক্মার অসুখ কিনা, খাটগুলো গেলে আমরা বসবো কোথায়, শোবইবো বা কোথায়. মেঝেয় কী ভয়ানক ঠাণ্ডা !

তোমাদের রান্না হয় কিসে খুকী ?—জিজ্ঞেস করি।

প্রশ্ন শুনে মেয়েটির মুখখানি ভারী হয়ে ওঠে। বলে—কাউকে বলো না যেন, বলতে বারণ। রান্না-ফান্না কি হচ্ছে ? আমি আর বাপ্প কাঁচা ময়দা গোলা গিলতে পারি না। খানিকটা কয়লা ফয়লা পেলে এমন তোফা স্যুপ তৈরী করে ফেলবো যে তা কেউ কখনো খায় নি, গরম গরম স্যুপ, ধোঁয়া উঠবে, আর হাপুস্ হুপুস্ ! আমি রাঁধতে শিখেছি কিনা।

ইস্ ! তা চলো এক কাজ করি। আমার পিঠের কয়লা তোমাদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি, কী বলো ?

মেয়েটি অবাক্ হয়ে আমার দিকে তাকায়। তারপর আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে বলে—উঁহুঁ, তা কি হয় ? তোমারও তো কয়লার দরকার '

আমার কয়লা ঢের আছে মশাই, তুমি ভেবো না তার জন্যে. চলো যাই।

মেয়েটি তার হাত ছাড়িয়ে নেয়, বলে, উঁহুঁ, তা হয় না, আমি ভেবেছিলাম, তুমি কোথাও বুঝি কয়লার দোকান খুঁজে পেয়েছো, তাই।

জ্যেস্কুয়ে, দ ভিদ্‌জেনিয়া! *—বলে সে তুষারের ওপর ছোট ছোট পা ফেলে হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল। কোন্‌ ভাঙা বাড়ীর কোন্‌ কন্দরে ঐ ছোট্ট মেয়েটি গরম স্যুপের স্বপ্ন দেখে তা বলে দেবে কে?

* ধন্যবাদ, বিদায়।

আমার ছাত্রীদের মধ্যে পান্না * আরিয়াদ্‌না —স্কার এমন একটি সরল অথচ শক্তিমান মোহ ছিল যার আকর্ষণে আমার ক্লাস প্রায়ই ফাঁকা থাকতো না। চশমার আড়াল থেকে বহুবার লক্ষ্য করেছি—অন্য ক্লাসের ছেলেরা এসে অভিনিবেশ সহকারে আমার বক্তৃতা শোনবার ভাণ করছে। পান্না আরিয়াদ্‌নার স্বভাবে, অভিব্যক্তি ও আকৃতিতে একটি বিশেষত্ব ছিল যা সচারচর আজকাল মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় না এবং যাকে বব্-ছাঁটা চুল, জানুর উর্দ্ধাঙ্গের অর্দ্ধ-নগ্নতা, সিগারেট ও আল্‌কহলে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। তার চরিত্রে ভারী নরম একটি দরদ ছিল, অপরের অনুভূতিকে আপন করে নেবার ক্ষমতা। তাই ছেলেদের মহলে তার প্রতিপত্তি ছিল অসীম, এবং একদিকে সে ছিল যেমন শান্ত ও সংযত অপরদিকে ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক হাতাহাতীর সময়ে তাকে সবার আগে যোগ দিতে দেখা যেত।

কুড়ি একুশ বছরের মেয়েটি রূপে স্বাস্থ্যে ও সখ্যে সকলকেই সমভাবে আকৃষ্ট করতে। অথচ আপন সত্তাকে পৃথক্ রেখে নিজেকে সর্বদা বিকশিত করবার তার স্বাভাবিক আকুতিকে সে কোনমতে খর্ব করতে দিত না।

* মাদ্‌মোয়াজেল্।

সেই পান্না আরিয়াদ্‌নার রূপ আছে বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য নেই। দৃষ্টিতে সেই উজ্জ্বল জীবনের দীপ-শিখা স্থির ও চিন্তা-মন্থর হয়ে উঠেছে। পথে চোখো-চোখি হতেই থমকে দাঁড়িয়ে পুরানো কালের মত উৎসাহে ও উল্লাসে আমায় অভিবাদন জানায়—পানিয়ে প্রফেসঝে! আমি ভেবেছিলুম আপনি কোন্‌কালে দেশে ফিরে গেছেন! ওমা, দেখেছো একেই বলে ভাগ্য!

বলি—কী মূর্তিই হয়েছে আপনার! প্রেমে-টেমে পড়েছেন নাকি?

হেসে উত্তর দেয়—পানিয়ে প্রেফেসঝে, আপনি কী ভয়ঙ্কর সেকেলে! ভিক্টোরিয়ানিয়ানা আপনার এখনো গেল না দেখছি। ব্লিৎস্‌-যুদ্ধেব পবে ও-সব প্রাক্‌-সামবিক অনুভূতি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নাকি?

অর্থাৎ?

অর্থাৎ আপনাব কথা শুনলে মনে হয় আপনার পেটে রুটি আব ঘবে কয়লা আছে।

আপনার নেই বুঝি!

উঁহুঁ।—তারপর হটাৎ যেন বহুদিন ঢেকে-রাখা অপরাধ স্বীকাব কবে ফেলাব মত ভারী অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতড়ি বিষয় পরিবর্তন করে।—চুপ্ চুপ্, ঘবে রুটি আর কয়লা আছে শুনলে হাজারটা মেয়ে আপনাকে এক্ষুণি বিয়ে করতে চাইবে। বলেন তো দু-পাঁচজনের কাছে কথাটা পাড়তেও পারি।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ঐ ধীর ও সংযত মেয়েটি ভারী বাচাল হয়ে উঠেছে। ওব সহসা-বিকশিত নারীত্বের সামনে আমার সকল প্রকার শিক্ষক-সুলভ বৃদ্ধ-খুল্লতাত-পনা একেবাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে। তবুও সাহস

করে জিজ্ঞেস করি—পান্নো আরিয়াদ্‌নো, আপনারা কি সেই আগের বাড়ীতেই আছেন ?

আমার অভিপ্রায় আমার কণ্ঠস্বরে ধরা পড়ে কিনা জানি না। তৎক্ষণাৎ উত্তর আসে—কেন বাড়ী বয়ে কয়লা দিয়ে আসবেন বুঝি ? হায় হায়, শেষকালটায় আমাকেই পছন্দ হলো ?

না ঠাট্টা নয়, সত্যি বলুন না।

পান্না আরিয়াদ্‌নার চোখের কোণে জল। মুখে হাসি টেনে এনে হাত নেড়ে, বাহাদুরীর ভঙ্গি করে বলে—সকলেরই কি একটা করে ঠিকানা থাকতে হবে নাকি ?

মানে ?

মানে শহরের যেখানে যে-ঠিকানা ছিল তা মনে করে রাখাতে আপনার অসংশোধনীয় প্রাক্‌সামরিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ সংক্ষেপে, যে-ঠিকানা ছিল তা অন্যান্য হাজার হাজার ঠিকানার মতই অবলুপ্ত এবং······যাক্‌ সে কথা।

এর বেশী প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। পান্না আরিয়াদ্‌নার বাবা, মা, ভাই, বোন, সমগ্র পরিবারের চিহ্নমাত্র নেই। আবার হেসে বলে—জানেন, পানিয়ে প্রফেসঝে আমি একটা খাশা চাকরী পেয়েছি।

তাই নাকি ?

হুঁ মশাই। আমার আফিসে একদিন সাপার খেতে আসুন না।

আফিসে সাপার মানে ?

আফিস মানে আমার কর্মস্থল, একটি অতি আধুনিক, অতি আর্তিস্তিক্‌ রেস্তোরাঁ। সুন্দর চেহারা আর ডিগ্রী না থাকলে সেখানে ওয়েট্রেস্‌ হওয়া যায় না, বুঝলেন ? আমাদের ইউনিভার্সিটির বহু ছাত্রী সেখানে ওয়েট্রেস্‌ হয়েছে। মাইনে এমন কিছু নয় তবে দু-বেলা গরম সুপ আর

কথনো কথনো মাছটা মাংসটাও পাওয়া যায়। আমার ফিয়াঁসে টিঁয়াসে কেউ নেই কিনা, তাই সন্ধ্যের সময়ে বাড়ী ফেরবার পথে ভারী মুস্কিল হয়। ছোটলোকগুলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শোরের মত গেলে, তারপর আধো মাতাল অবস্থায় রাস্তার মোড়ে ওৎ পেতে থাকে, কখন আমি বাড়ী ফিরবো। আপনি যদি রোজ সাপার খেতে আসতেন তো ভারী মজা হতো, আমার ফিয়াঁসে সেজে আমায় বাড়ী পৌছে দিয়ে আসতেন।

একদিন সত্যই পান্না আরিয়াদ্‌নার "আফিসে" সাপার খেতে গেলাম। এবং সন্ধ্যের সময়ে তার ফিয়াঁসে সেজে অনেক দূর এগিয়ে দিয়ে এলাম।

সেই প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগের রেস্তোরাঁ-বাসী "হাই লাইফের" প্রত্যক্ষ্য পরিচয় লাভ করা গেল।

যুদ্ধ, বিগ্রহ, বিদ্রোহে সমাজের আমূল পরিবর্তন হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। ইতিহাসে দেখা গেছে, সামাজিক বিপর্যয়ের ফলে ধনী নির্ধন হয়েছে এবং নির্ধন ধনশালী হয়েছে। কিন্তু এই আকস্মিক পরির্তনের মধ্যেও একটি বহুকাল-ব্যাপী, ক্রমবিকাশমান এবং অনিবার্য সামাজিক বিধির পরিচয় পাওয়া যায়, যার ওপর নির্ভর করে ইতিহাস বিদ্রোহের সমর্থন করে। ব্লিৎস্‌-যুদ্ধের পরে পোলদেশে যে সামাজিক ব্যবস্থা বা অব্যবস্থা সৃষ্ট হলো তাকে সম্যক্‌রূপে বোধগম্য করা অতিবড় সমাজ-বৈজ্ঞানিকের পক্ষেও সম্ভব নয়। যুদ্ধের সময়ে লাখে লাখে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি বা তথাকথিত "ইন্তেলিগেন্‌ৎসিয়া" বিদেশে মিত্র-শক্তির ফৌজে যোগদান করে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ চালাবার উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করলে। অবশিষ্ট শিক্ষিতদের অধিকাংশ, যেহেতু তারা যুদ্ধে যোগদান করেছিল বা রিজার্ভ অফিসার হিসেবে জিয়োনো ছিল,

সেই অজুহাতে তাদের ব্যাপক আদম-সুমারির সাহায্যে গেরেফ্‌তার করে জার্মানীতে নানা কেন্দ্রীকরণ-শিবিরে চালান দেওয়া হলো। তারপর চললো নানা অছিলায় নানা ছুতোয় শিক্ষিত বুর্জোয়ার ধ্বংসীকরণ। মাস্টার ও পাদ্‌রীরা সেই নির্যাতনের অধিক অংশ গ্রহণ করলে। সমাজের ঊর্দ্ধতন শ্রেণীর বিনাশে যে চাষা-ভুষো, বা যাকে পোলভাষায় বলা হয় "হ্‌লপ্‌স্ত্‌ভো", তারা এসে সিংহাসনে চড়াও হলো তাও নয়। যুদ্ধের সময়ে গ্রামে গ্রামে ঘোরবার সময়ে কখনো কখনো চাষাদের মধ্যে নাৎসি প্রোপাগান্দার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যেত। এবং অধিকারের সময়েও জার্মানরা পারতপক্ষে চাষাদের তোয়াজ করে চলতো। দুটো ডিম বেচে দু-মার্ক্‌ পেয়েছে বা এক ঘটি দুধের বদলে পেয়েছে পাঁচ সের নুন এ-ধরণের দর্পোক্তি বহুবার শুনেছি। এবং সেই প্রোপাগান্দার ফলে যুদ্ধের সময়ে কোনো কোনো চাষার মধ্যে যে আশার সঞ্চার হয়েছিল যে যুদ্ধের পরে কমুনিজ্‌ম্‌ না এলেও তার চেয়েও মুনাফাদার হিট্‌লারী রাজত্ব প্রবর্তিত হবে, চাষাদের সে আশায় ছাই পড়লো। "নব-বিধান" Die neue Ordnung প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই হিট্‌লারী বাহিনীর নজর পড়লো চাষাদেরই শস্যাগার ও জন্তুশালার ওপর। লরী বোঝাই করে তাদেরই যব, গম, কাশা, গরু, শোর, মুর্গী, পেরু হু-হু শব্দে জার্মনী মুখো ধাওয়া করলে। শহরে চড়া দামে আলু বা মাংস বেচে বড়মানুষ হবার আশায় যারা শহরে যাবার পথ ধরে গাড়ী হাঁকালে তাদের মাঝ পথে রুখে জার্মান সৈনিকরা তাদের ঐশ্বর্যের ভার লাঘব করলে।

যুদ্ধোত্তর পোলদেশে বুর্জোয়া বা হ্‌লপ্‌স্ত্‌ভো কেউই লাভবান হতে পারলে না। পয়সা করলে এক শ্রেণীর মানুষ যাকে ওদেশের ভাষায় বলা হয় "হাম্‌স্ত্‌ভো", নীচ বৃত্তির মানুষ, আত্মসম্মান যাদের কাছে হাস্যকর, যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ভালো খাওয়া, ভালো পরা এবং

ড়-পয়সা করা। এরা বিনা মূলধনে এবং বিনা আয়াসে শুধু মুখের তোড়, বারফট্টাই ও দ্বিধামুক্ত মনের দৌলতে প্রচুর ধন-দৌলত সঞ্চয় করলে। এদের প্রধান ব্যবসায় হলো বিদেশী অর্থ, যা জার্মানদের প্রসাদে অনর্থের মূল বলে গণ্য হলো, দশগুণ মূল্যে কিনে শতগুণ মূল্যে বিক্রয় করা। তা কেনবার জন্যে মূলধনের প্রয়োজন নেই। ক্রেতার কাছে টাকা আগাম নিয়ে বিক্রেতার প্রাপ্য মিটিয়ে আপন পকেট ভর্তি করা। বিদেশী অর্থের সঙ্গে যুক্ত হলো সোণা, হীরে, জহরৎ। তারপর এলো ঘুষের দালালি। উৎকোচের সাহায্যে জার্মানদের আফিসে স্ত্রীকে পুরুষ করা যায় কিনা জানি না, তবে ইহুদীকে যে আর্য করা যায় তা অচিরেই জানা গেল। এই দালালদের মধ্যস্থতায় বহু ইহুদী পরম আর্য বলে গণ্য হলো। এবং এই সূত্রে হাম্‌স্ত্‌ভোর সঙ্গে যোগ দিলে "শ্বাব্‌স্ত্‌ভো", জার্মান কর্মচারীর দল। দামী ফারকোটে অষ্টাঙ্গ আচ্ছাদিত করে বরফ-ঢাকা পথে স্লেজ্‌ হাঁকিয়ে এই ব্রাৎস্ত্‌ভো * হাজির হয় বড় বড় রেস্তোরাঁয়। এদেরই প্রসাদে অশন-গৃহের প্রেক্ষণ-বাতায়নে হাজাব বকমের চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আপন আপন উপাদান ঘোষণা করে ক্ষুধিত পথিককে পথভ্রষ্ট করে।

পান্না আরিয়াদ্‌না যে-রেস্তোরাঁয় কাজ নিয়েছে সে এই জাতীয় একটি "নয়া আমীর" ও জর্মান অধিকারীদের খাবার জায়গা। তাকে আফিস বললে ভুল হয় হয় না, কারণ তা সমরোত্তর ভারশৌএর একটি প্রধান বিজ্‌নেস্‌-কেন্দ্র। নানা রঙিন, নক্সাদার গালচে পোলীয় কায়দায় দেওয়ালে টাঙানো, নামজাদা ছবির নকল, লেখকদের ফটো, কোণে প্রকাণ্ড পিয়ানোফর্ত্‌, একটা লম্বা বুক্‌-কেসে নানা ভাষায় অতি-আধুনিক লেখকদের বই, চারিদিকে মূর্তি, প্রতিমূর্তি, নানান্‌ রকমের কিউরিয়ো,

* ভ্রাতৃত্ব বা সম্প্রদায়। সাধারণতঃ অসাধু সম্প্রদায়।

এবং তারই মাঝে মাঝে এমনভাবে টেবিল চেয়ার সাজানো হয়েছে যে, হঠাৎ জায়গাটাকে রেস্তোরাঁ বলে ধরা যায় না। প্রকাণ্ড ঘরখানাকে কোনো শৌখীন কাউন্টের সালঁ বলে ভুল হয়।

এই কাল্পনিক দরবারে বসে ব্রাৎস্ত্‌ভোর আত্মবিস্মৃতি অত্যন্ত স্বাভাবিক। হামস্ত্‌ভো ও শ্বাব্‌স্ত্‌ভোর টেবিলে টেবিলে যে আমারই ইউনিভার্সিটির জন কতক ছাত্রী মুখে কোকেৎরী-মাখানো হাসি ভরে চা, কাফী, মাংস, সূপ, মদ পরিবেশন করে যাচ্ছে, এবং ব্রাৎস্ত্‌ভো সুবিধা পেলেই কারো কারো হাতে পয়সা দেবার সময়ে কুৎসিত ইঙ্গিতে আপন আপন কামবাসনার আবেদন জানাচ্ছে, এ দৃশ্য কোনো অধ্যাপকের পক্ষেই উপভোগ্য নয়। অথচ সকল অসম্মান ও অমর্যাদাকে তাচ্ছিল্য করে মাত্র জীবন ধারণের এই যে কঠোর পরীক্ষায় এই ক'টি পোল মেয়ে প্রতিদিন উত্তীর্ণ হচ্ছে তাতে এদের চরিত্রের দৃঢ়তায় চমৎকৃত না হয়ে পারি না।

পান্না আরিয়াদ্‌নার কাছে আরো দুটি রেস্তোরাঁর কথা শুনতে পাই। একটি লেখকদের, অপরটি নট ও নটীদের।

জগতে পোল সাহিত্যের স্থান নিরূপণ করতে হলে শুধু এই বললেই যথেষ্ট হয় না যে দু-জন পোল সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। সাহিত্য যদি কোনো জাতির গঠনে সাহায্য করে থাকে, যদি তা তার সমগ্র আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতীক বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে তো তা পোল সাহিত্য। আদর্শকে জীবনে বাস্তব করবার আকুতি, অনাগতের বিরহ এবং যে অবর্ণনীয় বিষাদ সকল শিল্প-সৃষ্টির প্রাণস্বরূপ তা পোল সাহিত্যের বিশেষত্ব। তাই ওদেশে হীরে-জহরতের প্রাচুর্য না থাকলেও ছিল সাহিত্যের ঐশ্বর্য। সাহিত্য-সভা, সাহিত্য-সমিতি, সাহিত্য-সমাজ সাহিত্যিক-জলসা ওদেশে পাড়ায় পাড়ায়; মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিকের অন্ত ছিল না। ওদেশের সাহিত্যিক ও কবি স্বপ্ন দেখতে

জানতো, স্বপ্ন দেখাতে জানতো, অথচ স্বপ্নাতুর ছিল না। যে প্রাণ-শক্তি তাদের জীবনকে আহুতির মত ক্ষয় করে চলতো তাদের সৃষ্টিতে থাকতো তারই প্রতিফলন। তাদের ব্যক্তিগত জীবন যেমন বাবরী-চাদর-লপেটায় আলুলায়িত ছিল না তেমনি সঙ্কল্পের দৃঢ়ত্বে তারা ছিল সমাজের নায়ক-স্থানীয়, পুরোহিত।

অধিকৃত পোলদেশে যতদূর মনে পড়ে চারখানি দৈনিকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। তিনখানি জার্মান ভাষায় এবং মাত্র একখানি পোল-ভাষায়। মাসিক ও সাপ্তাহিকের চিহ্নমাত্র নেই। বই ছাপাবার কাগজ নেই, ছাপাখানা অধিকাংশই ভস্মীভূত। এবং জার্মান সরকারের অনুমোদন লাভ করবার জন্যে পাণ্ডুলিপি পেশ করবার মত সাহস লেখকদের ও-অবস্থায় থাকা সম্ভব নয়, কারণ উক্ত সরকার তখন যাবতীয় পুস্তকালয়ে পোলীয় সাহিত্যের বিক্রয় বন্ধ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেছে। বইয়ের দোকানে যে-সব বইয়ের বিক্রয় রোধ করবার জন্যে লম্বা লম্বা তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে প্রায় সমগ্র পোল সাহিত্যের ইতিহাস উজাড় হয়ে যায়। পোলীয় সাহিত্যের অধ্যয়নেও পোলদের অধিকার নেই, সেই সাহিত্য সৃষ্টি করার কথা ছেড়েই দেওয়া যাক্।

যে একখানি পোলীয় দৈনিক রাখা হয়েছে তার প্রধান উদ্দেশ্য ও-দেশে নাৎসি-নীতি প্রচার করা। তার ভাষা পাদ্রীদের বাংলাভাষার মত হাস্যকর, এবং তার আদ্যোপান্ত জার্মান অখ্‌বার সমূহের সারাংশের তর্জমা। খবর ছাড়া যে-টুকু জায়গা বাকী থাকে তা বিজ্ঞাপনে ভরা, কারণ ঐ কাগজখানিকে চালু রাখবার জন্যে ভাঙ্গা বাড়ীর দেওয়ালে হাতে-লেখা বিজ্ঞাপন দেওয়া শাস্তি-বিধেয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তা ছাড়াও যে-টুকু জায়গা কখনো কখনো খালি থাকে সেটুকু নাৎসি-মার্কা

জার্মান ছোট গল্পের অনুবাদ বা জার্মান সরকারের মহত্ত্ব ও গরিমা বিষয়ক রচনায় ভরে দেওয়া হয়।

জীবনধারণের তাড়নায় লেখক ও লেখিকারা রেস্তোরাঁয় খানসামা-গিরিতে আত্ম-প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন। সে রেস্তোরাঁয় স্থির হয়ে এক পেয়ালা হের্‌বাতুম পান করতে হলে যে প্রচুর মনের জোর থাকা দরকার, তা অনুভব করলাম মাত্র একদিনের অভিজ্ঞতায়। হামস্ত্‌ভোর কাছে সাহিত্য পণ্য সামগ্রী মাত্র। তাই সে রেস্তোরাঁয় ভিড় কম নয়। খাওয়া শেষ করে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে অমুক নামজাদা লেখক বা কবির হাতে টাকাটা সিকেটা বক্‌শিস্‌ ফেলে দেওয়ার আত্মগরিমা কম নয়। বাঁ হাতের কব্জীর ওপর ঝোলানো তোয়ালে ও ডান হাতে ট্রেতে খাবার সাজিয়ে নিয়ে কবি ও সাহিত্যি-করা এই যে অতিথি-সেবা করছেন তার ওপর রং চড়িয়ে রাজা-উজীর মারা গল্পের খোরাক শুধু এই রেস্তোরাঁতেই পাওয়া যেত। ওয়েটারের ড্রেস্‌-স্যুট-পরা এই কবি ও সাহিত্যকরা যে তাদের নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি তা তাঁদের মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। তাঁদের সমগ্র অভিব্যক্তিতে যে বিষাদের ছায়া তার সঙ্গে সৃষ্টির বিষাদের কোন সম্পর্কই নেই।

নট ও নটীদের রেস্তোরাঁর আবহাওয়া সম্পূর্ণ বিপরীত।

ভারশৌএর প্রায় সবকটি নাট্যশালাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সুতরাং এঁরা নাট্যশালা ছেড়ে জীবন-নাট্যে প্রবেশ করেছেন। সমগ্র রেস্তোরাঁটা এঁদের কাছে রঙ্গমঞ্চ মাত্র। এঁরা সারাক্ষণ এক একজন এক এক ধরণের ওয়েটার বা ওয়েট্রেসের পার্ট করে চলেছেন। সে-দিক দিয়ে দেখতে গেলে এঁরা প্রত্যেকেই আপন আপন ব্যক্তিত্বের সাহায্যে এক একটি পৃথক্‌ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এমন কি কমিক্‌ পার্ট ও বাদ যায়

নি। এঁরা সবাই খুশী, কারণ এঁরা এই নূতন ব্যবসায়ে সত্যিই আত্ম-প্রকাশ করতে সমর্থ হচ্ছেন। ফিল্‌ম্‌-হিরো ব্রজীশ আর কমিক্‌ অ্যাক্টর বর্তুল-বপু স্কন্মেচ্‌স্কী সমস্ত রেস্তোরাঁটাকে মশ্‌গুল করে রাখতেন। শুধু মনে পড়ে, বৃদ্ধ কৃশেভীঞ্স্কি তাঁর এই নূতন অভিজ্ঞতাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারতেন না। তাঁকে অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় হঠাৎ বসে পড়তে দেখা যেত, যেন এই জীবনের ভার তিনি আর বহন করতে পারছেন না। অথচ তাঁকে কোনরূপে সাহায্য করবারও উপায় ছিল না, কারণ তাঁর আত্মসম্মান-বোধ অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল।

শ্মশান-পুরী ভারশৌ-এ এঁদের এই রেস্তোরাঁটিতে কথনো কথনো স্বাভাবিক মানুষের হাসি শুনতে পেতাম। আশা করি এখনো সে-হাসির কণ্ঠ-রোধ হয় নি।

মাত্র জীবণধারণের জন্যে যে-সব লেখক বা কবি খানসামাগিরি করতে সমর্থ হলেন না তাঁরা একে একে পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। বিশেষতঃ বয়স্থ লেখকদের মধ্যে যেন মড়ক দেখা দিলে। ও-দেশের রীতি অনুযায়ী শহরের সর্বত্র দেওয়ালে দেওয়ালে ছাপানো মৃত্যু-সংবাদের মধ্যে লেখক বা কবিদের নাম প্রায়ই চোখে পড়ে। দুটি নাম স্পষ্ট মনে আছে; কবি তেত্মায়ার ও ঔপন্যাসিক গঁস্যরভ্স্কি। তেত্মায়ারের স্থান কবি হিসেবে যত উচ্চ ছিল, ও-দেশের পাহাড়ীদের দৈনন্দিন জীবন ও সংস্কার সম্বন্ধে তাঁর ছোট গল্প তাঁকে পোলসাহিত্যে আরো উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ঐতিহাসিক উপন্যাসে গঁস্যরভ্স্কি একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। নাপলেঅঁ ও জনৈকা পোলিকার প্রেমকে কেন্দ্র করে তাঁর উপন্যাস "মাদাম ভালেভ্স্কা" আজ ফিল্মের প্রসাদে জগৎ-বিখ্যাত। উভয়েই বৃদ্ধ হলেও তাঁদের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে যেন কী এক গভীর রহস্য গোপন রইলো। অথচ তাঁদের মৃত্যু স্বাভাবিক কিনা তা নিয়ে আলোচনা করবারও কারো সাহস হলো না।

তাঁদের মৃত্যুর কারণ যে নির্যাতন নয়, তা শুধু দেশের স্বাধীনতাহীনতা এ-কথা বিশ্বাস করতে আমি প্রস্তুত। দেশের স্বাধীনতাহীনতা লেখকদের

কীভাবে আঘাত করতে পারে তার একটি চিত্র আমার মনে আছে। পোলীয় P. E. N. ক্লাবের সভাপতি পরেন্তভিচের কথা বলছি।

যুদ্ধের কয়েকমাস আগে এর সঙ্গে আমার প্রথম ব্যক্তিগত পরিচয় ঘটে। দীর্ঘাকার, প্রসন্ন চেহারা, ফরাসী ধরণের দাড়ী, চোখে মুখে ভারী প্রীতিকর একটি সিনিকতার হাসি। ও-দেশে সমালোচক পরেন্ত-ভিচের মত সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক ব্যক্তি অল্পই ছিল। প্রথম পরিচয়েই ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রীতির নিদর্শন পেলাম তাঁর একটি প্রশ্নে। জিজ্ঞেস করলেন কলেগা* গ্যেটেলের "ভারত ভ্রমণ" পড়েছেন?—গ্যেটেল পোলীয় সাহিত্য-পরিষদের সদস্য, নামজাদা লেখক। তাঁর বিখ্যাত কেতাব "দিনের পর দিন" পড়েনি এমন ব্যক্তি পোলদেশে নিজেকে শিক্ষিত বলতে লজ্জা বোধ করতো। ভদ্রলোক কী খেয়ালের বশে বছর কয়েক আগে ভারতবর্ষে বেড়াতে আসেন। এবং যেমন অনুমান করা যেতে পারে, ইংরেজী প্রোপাগান্দার বান্দা বনে যান। বারাণসীর গঙ্গাতীরে ছাইভস্মমাখা সাধুদের দেখে তাঁর ধারণা হয় ভারতীয় সভ্যতায় সাবানের স্থান নেই। এবং মুক্ত কণ্ঠে তাঁর দেশবাসীর কাছে ঘোষণা করেন যে, তিনি ইউরোপীয় (সাহেব আর কী !) হিসেবে এই সাবান-হীন সভ্যতার কদর করতে সম্মত নন্। বইখানি লিখে তিনি নিজের দেশের লোকের কাছে কম গালাগালি খান্ নি। তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে যে তাঁর সম্বন্ধে বেশ খানিকটা অবজ্ঞা প্রকাশ পেত লক্ষ্য করেছি তার মূলে ছিল এই "ভারত-ভ্রমণ"। প্রায় সবার কাছেই শুনেছি গ্যেটেল বইখানা লিখে আপন বুদ্ধিবৃত্তিকে বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করেছেন। যাক্ সে কথা।

পরেন্তভিচ্ প্রশ্ন করলেন—পড়েছেন বইখানা?

*সহকর্মী বা বন্ধু।

আজ্ঞে হ্যাঁ, পড়েছি।

পড়ে খুব চটেছেন তো?

একটু চটেছি বৈকি। তবে গোটেলের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে আমার আক্রোশ অনেকখানি কমেছে। অত্যন্ত ভালোমানুষ ভদ্রলোক, আমাদের দেশে গিয়ে ইংরেজদের খপ্পরে পড়েছিলেন এই যা।

লরেন্তভিচ্‌ বললেন—আপনার রাগ কমেছে, কিন্তু আমি যতবার বইখানা পড়তে চেষ্টা করেছি ততবারই লেখকের সঙ্গে হাতাহাতি করবার দুর্দমনীয় প্রবৃত্তিকে বহু আয়াসে রোধ করতে বাধ্য হয়েছি। শুনুন একটা গল্প। এই বলে লরেন্তভিচ্‌ তাঁর স্বাভাবিক প্রাঞ্জল এবং হাস্যোজ্জ্বল ভাষায় যে গল্প শোনালেন তার সার মর্ম এই:

ফরাসী ভাষায় মিশরদেশ সম্বন্ধে একখানা বই লিখে এক লেখক বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিলে। পাঠক মহলে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিকে তার ফটো বেরুলো, বড় বড় সালঁতে তার ডাক পড়লো, সবাই বললে মিশর সম্বন্ধে এমন পয়লা নম্বরের বই তার আগে কেউ লেখেনি, এবং পরেও যে কেউ লিখতে পারবে তা সন্দেহের বিষয়। এমন সময়ে মিশরী রাজপ্রতিনিধির কাছ থেকে এলো কড়া ভাষায় প্রতিবাদ। মিশর সম্বন্ধে এমন কুৎসিত বই নাকি আর কেউ লেখেনি। বইখানির আদ্যোপান্ত অলীক কল্পনা। ব্যাপারটা যখন বেশ পেকে এসেছে তখন প্রকাশকেরা লেখককে ডেকে পাঠালে। কৈফিয়ৎ চাই। তিন চারশ পাতায় নিছক মিথ্যা কথা লিখে অতবড় প্রকাশকদের সে শুধু প্রতারিত করেছে তা নয়, সমগ্র দেশে তাদের নামের ওপর দু-হাতে কালি মাখিয়েছে।

কৈফিয়ৎ দাও—প্রকাশকরা হেঁকে বসলো।

কৈফিয়ৎ চাও? বেশ।—ধীর সংযত স্বরে লেখক উত্তর দেয়।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ বইখানা লেখবার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকলে আমি কখনই তা লিখতাম না, তা হলপ করে বলতে পারি।

অর্থাৎ !

অর্থাৎ আমার "মিশর ভ্রমণ" লিখেছি মিশর সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তার করবার উদ্দেশ্যে নয়, লিখেছি মিশর যাবার খরচ তোলবার জন্যে, pour y aller.

গল্প শেষ করে লরেন্তভিচ্‌ শিশুর মত উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। আদর্শবাদী, প্রাণবন্ত, হাস্য-রসিক লরেন্তভিচের সেদিনকার চেহারা আজও মনে পড়ে।

আর মনে পড়ে নভেম্বরের বিষণ্ণ সন্ধ্যায় ভাঙা শহরের পথে ভগ্নস্বাস্থ্য অবসন্ন লরেন্তভিচের ছায়ামূর্তি।

দু-পাশে পোড়া বাড়ীর মাঝখানে ময়লা বরফ-ঢাকা পথে যেন প্রেতাত্মার শোভা-যাত্রা। কারো মুখে রা-টি নেই, তুষারের ওপর পায়ে চলার শব্দ নেই। রাস্তার যে-কটা ল্যাম্প্‌-পোস্ট্‌ এখনো খাড়া আছে তাদের কাছ দিয়ে যাবার সময়ে গা ছম্‌ ছম্‌ করে। তাদের কেন্দ্র করে চলতি স্লেজের ঘোড়ার ছায়া বিরাট প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মত হামাগুড়ি দিয়ে চলে, আর হঠাৎ আলোর ঝলকে চোখে পড়ে পথিকের ফ্যাকাশে মুখ, কবর থেকে উঠে আসা মানুষের মুখের মত নির্লিপ্ত, ভয়াবহ। তারই মধ্যে মনে হলো যেন লরেন্তভিচ্‌ কোথায় চলেছেন। তাঁর দীর্ঘাকার মূর্তি শীর্ণ, সঙ্কুচিত, স্পষ্টবাদীর সাহস-ভরা দৃষ্টি পথের ময়লা তুষারে আনত। ওভার কোটের বোতামে ঝোলানো কয়েকটা মোড়ক দৈনন্দিন আহার্য-অন্বেষণে আপেক্ষিক সাফল্যের পরিচয় দেয়, কিন্তু

ললাটে গভীর নৈরাশ্যের বলি-রেখা, সমগ্র আকৃতিতে উদ্দেশ্যহীন অস্তিত্বের অবসাদ।

লরেন্তভিচ্‌!

আমার কথা যেন তাঁর কাণে যায় না। হাত নেড়ে তাচ্ছিল্য ভরে যেন তিনি নিজেই একবারে নিজের নাম উচ্চারণ করলেন—লরেন্তভিচ্‌। তারপর যেন নিজের কাছ থেকে পালাবার জন্যেই তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কিছুদিন পরে ভাঙা দেওয়ালের ওপর ছাপানো মৃত্যু-বিজ্ঞপ্তিতে জানতে পারলাম, লরেন্তভিচ্‌ ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

প্রাচীন পল্লীর এক গোপন গলিতে হঠাৎ একদিন এক চাষার ফুরমান্‌কা* এসে হাজির হলো। ভেড়ার লোমের কুর্তা গায়ে, মাথায় আস্ত্রাহান্‌ টুপী, পায়ে হাঁটু পর্যন্ত বুট, হাত কচলে পাকা ইহুদী ব্যবসাদারের মত বাহাদুরী করে চাষা বলে—মাইরী বল্‌তিচি, শ্বাব্‌রো পতে ধরেছেলো, এই এতগুনি গুণে দিতে হলো, শালারা কী কম ঘুষ খায়? তারপর একছড়া করে সসেজ আর খানিকটা করে মাংস! তা না'লে শস্তায় বেচবো না কেন? গড়পড়তা উপরি খরচই পড়ে গেল তোমার কিলো পিচু দু জ্‌লতী। সুতরাং সাত জ্‌লতী কেনা দামের ওপর ধরে দাও দু জলতী, হলো গিয়ে নয়। তার ওপর আমার মুনোফা, মজুরী আরো পাঁচ আর ঐ জন্তুটো যে গাড্ডে টেনে নিয়ে সারা দুনিয়া ঘুত্তেচে তারও তো খোরাক আচে গো বাবু, এই সর্ব সমেত আটারো জ্‌লতী কিলো নেজ্জো দাম কিনা বলো, তারপর কেনবার হয় কেনো, আর না হয় বলো তো শ্বাব্‌ ডেকে বিলি করে দি। নড়াইয়ের আগে ডেড় জ্‌লতী ছেলো সে আর অস্বীকের কত্তেচে কে গা? নড়াইয়ের আগে কটা বাবু এ জিনিষ খেতো বলোতো?

* ঘোড়ায় টানা গাড়ী

চাষা আপন গাড়ী-ভরা ঐশ্বর্যের দিকে কপট দৃষ্টি হেনে আবার বলে —এ হলো গে তোমার চাষা-ভুষো, দিন-মজুরের খাস্তি! ছোটনোকের সসেজ, টক জরানো কোপির সঙ্গে সেদ্ধ করে এক কামড় কালো রুটি আর এক কামড় এই জিনিষ! হে হে হে, আর একোন তোমার গে এর' এক টুকবো দেকতে পেলে রাজা-উজীরের জিব দে জল ঝরে। না বাবু, আটারো জ্লতীর একটি গ্রশ্‌ ছাড়তে পারবো নি।

গাড়ী-ভরা তেল চুকচুকে সসেজের ছড়া দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যায়। হ্লপ্‌স্ত্‌ভো বেচে, হাম্‌স্ত্‌ভো কেনে, পথের মানুষ, হাঁ করে চেয়ে থাকে, কেউ কেউ এগিয়ে এসে সসেজের স্পর্শ-সুখ লাভ করবার জন্যে হাত দিয়ে টিপে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে টাটকা তো? সমস্ত পাড়াটা মাংসের গন্ধে মশগুল্‌ হয়ে উঠেছে।

প্রাচীন পল্লীর প্রাচীন বনেদী বংশের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি সকালে বেড়াতে বেরিয়েছেন। যুদ্ধের আগেকার প্রাত্যহিক অভ্যাসে এখানো ছেদ পড়েনি। আগেকার মতই সঙ্গে তাঁর সেই প্রকাণ্ড সেণ্ট্‌বার্ণার্ড্‌। শুধু বৃদ্ধের লোল চর্মাবৃত কঙ্কালটাকে ঋজুভাবে ধরে রাখার ভঙ্গিতে তাঁর আগেকার লম্বা-চওড়া বনেদী চেহারার পরিচয় পাওয়া যায়। আর হাড় জিরজিরে সেণ্ট্‌বার্ণার্ডের বুদ্ধিমান চোখের চাহনিতে মনে পড়ে যুদ্ধের আগে সে তার প্রভুকে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্যে যেন সর্বদাই প্রস্তুত হয়ে থাকতো।

সসেজের ফুর্‌মান্‌কার পাশ দিয়ে যাবার সময়ে বৃদ্ধ থমকে দাঁড়িয়ে শুধু একবার জিজ্ঞেস করলেন—কত করে দিচ্ছো হে?—নাক কুঁচকে সেণ্ট্‌বার্ণার্ড্‌ কিসের প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে ওঠে, কিন্তু তা মাত্র ক্ষণেকের চাঞ্চল্য।

হেঁড়ে গলায় চাষার উত্তর শুনি—আটারো জ্লতী!

বৃদ্ধ শুধু বলেন—হুঁ। তারপর লাভ-কামী চাষার দিকে পরম তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আগের মতই পথ চলতে থাকেন। চারিপাশের হাওয়া ধোঁয়ায়-সেঁকা টাটকা সসেজের গন্ধে মশ্‌গুল। সেন্ট্‌ বার্ণার্ড্‌ আর একবার নাক কুঁচকে তার প্রভুর অনুসরণ করে। খানিক দূর গিয়ে সে তার প্রভুর দিকে তাকিয়ে যেন স্পষ্ট বললে—কী দরকার আমাদের সসেজে? তুমি বাপু আর ও নিয়ে মন খারাপ করো না।

কে বলে চোখের ভাষা নেই?

ভাঙা শহরের সবচেয়ে করুণ দৃশ্যের মধ্যে একটি হচ্ছে পথে ঘাটে সর্বত্র প্রভুহীন কুকুরের দল। সমস্ত শহরে কিছুদিন আগে যে কী নিয়ে ভীষণ লঙ্কাকাণ্ড ঘটে গেল, মনুষ্য-জাতির মধ্যে যে হিট্‌লার বলে এক ব্যক্তি বর্তমান, এবং ও-দেশে যে জার্মান বলে এক ধরণের মানুষ এসে রাজত্যি করছে, এ-সব কথা তাদের ক্ষুদ্র পশু-বুদ্ধির আয়ত্তে আসা সম্ভব নয়। তবে আশ্চর্য এইটুকু যে তারা যেন এক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুঝতে পেরেছে, ও-দেশে দুর্দিন এসেছে।

যুদ্ধের আগে আত্মরক্ষা ও সাবধানতা বিষয়ক সাধারণ বিজ্ঞপ্তিতে গৃহপালিত জন্তুদের কথাও বাদ যায় নি। তবে যতদূর মনে পড়ে, অতি আধুনিক এবং অতি পশ্চিমী ইংরেজদের মত যুদ্ধকালে গৃহপালিত জন্তুদের বিষ খাইয়ে "ঘুম পাড়িয়ে" ফেলবার উপদেশ বা আদেশ পোল সরকার ঘোষণা করেন নি। একমাত্র উপদেশ ছিল তাদের যেন বেঁধে রাখা না হয়। অর্থাৎ বিপদের সময়ে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি যে তাদের সাহায্য করবে এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে কুকুরকে এক রকম স্বায়ত্তসাশন দেওয়া হয়েছিল। এবং যুদ্ধের সময়ে দেখা গেল জন্তুর আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তি মানুষের চেয়ে অধিক কার্যকর। অবশ্য জন্তুদের সুবিধা

এই যে কোম্পানীর কাগজ, সোণা-দানা বা কাঁথা-কানী বাঁচাবার জন্যে তাদের মাথা ঘামাতে হয় না, এবং অনেক ক্ষেত্রে এই পার্থিব সম্পত্তি বাঁচাতে গিয়েই বহু লোকের মৃত্যু ঘটেছে।

কুকুরের যে গুণকে আমরা সাধারণতঃ প্রভু-ভক্তি বলে থাকি তা যে শুধু অর্বাব্‌ খিদ্‌মৎকার বা প্রভু ও দাসেব সম্পর্ক নয়, তা যে এক আন্তরিক বন্ধন, যাকে নিবিড় বন্ধুতা ছাড়া আব কিছু বলা যায় না, তা পদে পদে অনুভব করি এই গৃহহীন কুকুরদের জীবন লক্ষ্য করে। যে-বাড়ীতে থাকতো সে-বাড়ীর চিহ্নমাত্র নেই, যে-মানুষের ছায়া পর্যন্ত তার প্রিয় বস্তু ছিল সে-মানুষ পঞ্চভূতে লীন হয়েছে, অথচ দিনের পর দিন রাস্তার ধারে কুকুর শুয়ে আছে, শীত নেই, ক্ষুধা নেই, তাব বন্ধুব অপেক্ষায় সে প্রাণ বিসর্জন দেবে, এমন কি সামনে রাখা অতি লোভনীয় খাবারের দিকে সে ফিরেও তাকাবে না।

আর এক ধরণের কুকুর দেখি যারা পথে পথে আপন আপন প্রভুর অন্বেষণে সক্রিয়ভাবে প্রবৃত্ত হয়েছে। ঠিক মানুষে যেমন আধো চেনা মানুষ দেখলে থমকে দাঁড়ায় এরাও তেমনি হঠাৎ পথ-চলা মানুষের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কাছে এসে আঘ্রাণের সাহায্যে মনে করতে চেষ্টা করে এই তার সেই মানুষ বন্ধু কি না। এদের এক অদ্ভুত আত্মসম্মান-বোধেরও পরিচয় পাই। এরা মানুষের কাছে ভিক্ষা বা আশ্রয় চায় না। কাছে এসে খাবার দিতে গেলে এরা মুখ ফিরিয়ে হন্‌হন্‌ করে চলে যায়।

এই শত শত গৃহহীন কুকুরের মধ্যেও ক্রমে নৈতিক অবনতি দেখা দিলে। যারা হৃদয়কে উদরের উর্দ্ধে স্থান দিলে তারা জীবন-সংগ্রামে হার মানতে বাধ্য হলো। পথের ধারে প্রভু-ভক্ত, আত্মঘাতী কুকুরের মৃত দেহ গাড়ী বোঝাই হয়ে শহরের বাইরে ধাপায় গিয়ে জমা হলো।

যারা নূতন প্রভুত্ব স্বীকার করলে তারা নূতন গৃহে নূতন আবহে ক্রমে নিজেদের খাপিয়ে খাইয়ে নিলে। তৃতীয় শ্রেণীর কুকুররা স্বাবলম্বন গ্রহণ করলে। এদের মনস্তত্ত্ব বোঝা কঠিন। এরা যতদূর মনে হয় যথার্থ সিনিক্‌। সবার পক্ষে যেমন দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করা সম্ভব নয়, এদের পক্ষেও তেমনি দ্বিতীয় বার প্রভু-পরিগ্রহ করা অসম্ভব। জীবনধারণের জন্যে এই সারমেয়ের দল শৃগাল-বৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হলো। এদের চোখে তিক্ত, হিংস্র দৃষ্টি। ভাঙা বাড়ীর ভেতর থেকে প্রায়ই এরা সদ্য আহার সেরে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে বেরিয়ে আসে। সে এক পৈশাচিক দৃশ্য!

গেস্তাপো রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শহরে জীবিকা বলে একটা কথা উঠলো। যুদ্ধের পরে জীবন ধারণ করতে যারা সমর্থ হলো তাদের জীবিকার উপায় কী এ নিয়ে নাকি জার্মান সরকার মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন। অপরের ঘরকন্না সম্বন্ধে উদার-চরিত্র জার্মানদের শিরঃপীড়া নূতন জিনিষ নয়। কাজেই ঐ শিরঃপীড়ার ফল কতদূর গড়াবে তাই ভেবে দেশের লোক আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। সরকার থেকে হুকুম এসেছে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেককে আপন আপন জীবিকা-নির্বাহের উপায় সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করতে হবে।

অর্থাৎ বেকার-সমস্যা দূর করবার জন্যে মহামহিম সরকার আন্-এম্প্লয়মেণ্ট্ ব্যুরো খুলেছেন আর কি! এই নূতন আদম-সুমারিতে যাদের বেকার বলে ধরা যাবে তাদের চাকরী নিতেই হবে। লাখে লাখে লোক নাকি অপরের অন্নধ্বংস করে, দিবানিদ্রা দিয়ে পরম সুখে কালাতিপাত করছে। তারা সমাজের গলগ্রহ, দেশের শত্রু, দশের প্রতারক ইত্যাদি ইত্যাদি এবং প্রভৃতি। এদের চাকরী দিয়ে চরিত্র-সংশোধন একান্ত প্রয়োজন। এবং সরকারের হাতে চাকরী যা মজুত আছে তাতে সাধু

উপায়ে অনায়াসে সমগ্র পোল জাতি আপন আপন পরিবারের সংস্থান করতে পারে।

এর পরে নিজেকে বেকার বলে ঘোষণা করবার মত সাহস কারো থাকা সম্ভব নয়। পথে-ঘাটে দেখা হলে মানুষ অতি নিকট আত্মীয় বা বন্ধুর কাছেও বাহাদুরী করে বলে—যাক্‌, একটা চাকরী পাওয়া গেচে।

তাই নাকি ? তোফা ! কন্‌গ্র্যাট্‌স্‌ ! আমিও একটা জুটিয়েছি।

সত্যি !! বেড়ে !

এর বেশী এক অপরকে প্রশ্ন করে না। পথে সহসা লরী থামিয়ে বেকারকে পাকড়াও করে জার্মানীতে ফ্যাক্টরী বা ক্ষেতে কাজ করতে পাঠিয়ে দেওয়া সরকারের একটি প্রাত্যহিক কর্তব্য।

শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের যারা এখনো টিকে রইলো তারা দলে দলে মিস্ত্রী-মজুরদের খাতায় নাম লেখালে। এবং তলে তলে আগের মতই স্বাধীনতার আন্দোলন চালাতে লাগলো। গুপ্ত সংবাদ-পত্র প্রচার এবং গুপ্ত রাদিওর সাহায্যে বিদেশে দেশের খবর পাঠানো হলো এঁদেরই অধিকাংশের কাজ। জীবিকার জন্যে এঁরা অনেকেই শহরের কাচের শার্শি মেরামত বা পথের মাঝখান থেকে ভাঙা বাড়ীর ইট-পাটকেল সরাবার কাজ নিয়ে সর্বত্র চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা সজাগ রেখে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

আদম-সুমারি পত্তন হবার পর সরকার বিস্ফারিত নেত্রে আবিষ্কার করলেন যে, অধিকৃত পোলদেশে বেকার বলে প্রায় কেউই নেই। সুতরাং বেকার-সকার-নির্বিশেষে ধর-পাকড় চলতে লাগলো। শহরে, গ্রামে সর্বত্র যেখানে সেখানে যাকে সামনে পেলে লরী বোঝাই করে ওরা জার্মানী চালান দিলে। তথা-কথিত বেকার মেয়েদের পাকড়াও করে কী উদ্দেশ্যে কোথায় পাঠানো হলো তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সঙ্গত মনে করি না। তা যেমন করুণ তেমনি বীভৎস।

বেকার-সমস্যা সমাধান করার পর এলো খাদ্য-সমস্যা। আদি কাল হতে জীবজগতে এ-সমস্যা প্রত্যেককে সমাধান করতে হয়েছে। তাই অধিকৃত পোলদেশে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তখন ওদেশের লাট সাহেব ফ্রাঙ্ক্‌ তা এক ফুৎকারে হেসে উড়িয়ে দিলেন। কুকুর-বেড়াল যদি আপন আপন আহার্যের সংস্থান করতে পারে তো পোলদেরও পারা উচিৎ, বিশেষতঃ যদি তারা মনুষ্য-পদবাচ্য হয়। একটু খুঁটে খাক্‌, শিক্ষা হবে, ঘরে খাবারের বন্দোবস্ত না করে লড়তে গিয়েছিলে কেন বাপু? এই হলো একদল কর্তাদের অভিমত। অপর দল বলেন, শোনো কেন ওদের নেকামি? সব বেটাদের ঘরে বস্তাবস্তা ময়দা, কাশা চিনি, এখন ধুয়ো তুলেছেন, খাবার নেই! তাছাড়া যদি সত্যিই অভাব ঘটে থাকে তো তার জন্যে দায়ী ওদেরই নিজেদের দেশের পুঁজীকররা। এই সময়ে লাট সাহেব ফ্রাঙ্ক্‌ আবার বললেন—পোলদেশে দুর্ভিক্ষ ঘটেনি, ও-সব মিত্রপক্ষীয়দের প্রোপাগান্দা। এ সময়ে পুরোনো আমলের পোল সরকার থাকলে অবশ্য দুর্ভিক্ষ ঘটতো নিশ্চয়। আমরা প্রত্যেকটি জিনিষের দর ঠিক করে দিয়ে সে পথ বন্ধ করে দিয়েছি। ওহে পোল জনগণ মনে রেখো তোমাদের শত্রু তোমাদের নিজেদের জাত-ভাই পোল। আমরা অবশ্য তোমাদের দুঃখ বুঝি, তাই ফ্যুরেরের আদেশে তোমাদের চাষ-আবাদ শেখাবার জন্যে কয়েকজন পাকা ওস্তাদ আনাচ্ছি। মায় তোমাদের আসছে ফসলের জন্যে কিছু বীজও ধার দিচ্ছি, আর তোমাদের পশু-পালনের উন্নতিসাধন কল্পে কয়েকটি অতি উত্তম ষাঁড়, মোরগ, শূকর এসে পড়লো বলে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আসল দুর্ভিক্ষ বাক্‌-বিতণ্ডার তোয়াক্কা রাখে না। মড়ক ও মহামারীর সঙ্গে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে একেবারে শহরের ভেতরে এসে পড়লো। তারপর শুরু হলো এই তিন পাগলের ছারখারের খেলা।

টাইফয়েডে পাড়ার পর পাড়া উজাড় হয়ে যায়, শহরে হাঁসপাতাল নেই ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই। ও-সব ব্যবস্থা শুধু জার্মান সৈনিকদের জন্যে। পোলদের অবশ্য ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে টাইফয়েড থেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা যে করা হলো না তা নয়। এবং এই সঙ্গে এক অভিনব উপায়ে শত শত নর-নারীর জনন-শক্তি বিনাশ করে দেবারও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলো।* সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ। মহামারীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মড়কের খোরাক জোটাতে লাগলো।

এইবার সত্যই ও-দেশে জর্মান মহানুভবতা ব্যক্ত করবার অবকাশ পাওয়া গেল। যারা এতদিন আত্মসম্মান বাঁচিয়ে জার্মানদের প্রার্থী হতে স্বীকৃত হয় নি তারাও দলে দলে সরকারী স্থপ-খানায় এসে হাজির হলো। নাৎসী পতাকার প্রচ্ছায়ায় যারা স্থপ প্রর্থনা করতে এলো তাদের ফটো তুলে জগতের জনমতকে পরিতুষ্ট করা হলো। এই সঙ্গে আরো বলা হলো, পোলদের আপন দেশবাসীকৃত দুর্ভিক্ষ থেকে উদ্ধার করলে জার্মান সেনা। নজির চাও তো এই দেখ।

কিছুদিন পরে শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে গোলাপী রঙের কাগজে লেখা বড় বড় অক্ষরে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হলো। শীঘ্রই রসদ-ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। এতদিন পরে সরকারের টনক নড়েছে। অনশনের সীমা অতিক্রম করলে যে বিদ্রোহ ঘটতে পারে তার কিছু কিছু পরিচয় নাকি এর মধ্যেই পাওয়া গেছে। তাই আধ-পেটা খাইয়ে মানুষ-গুলোকে এমনভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হবে যে তারা যেন ভরা পেটে বা খালি পেটে লাঠি ধরতে না চায়। আধ-পেটা খাওয়ার মধ্যে যে একটি প্রচ্ছন্ন বলহীনকর নৈতিক অবনতিসাধক শক্তি সক্রিয় থাকে সে-কথা

*রোগ-প্রতিষেধকের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক উপায়ে জনন-শক্তি বিনাশের কথা একাধিক পোলীয় চিকিৎসকের কাছে শুনেছি।

জার্মানদের অজ্ঞাত ছিল না। তাই মাথা পিছু প্রতিদিন এক পো রুটি সরকারী মূল্যে কেনবার ব্যবস্থা করে দিয়ে ফ্রাঙ্ক্ সাহেব আবার বললেন—পোলরা যদি এই উপকারের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায় তো তারা যেন মনে রাখে যে, সে কৃতজ্ঞতা সর্বৈব জার্মান সেনার প্রাপ্য। উক্ত সেনার ঔদার্য যে কতখানি তা প্রতিপন্ন করবার জন্যে দোকানে দোকানে রুটি সরবরাহ করে জার্মান মিলিটারী লরী। অর্থাৎ, ওহে পোল জনগণ তোমরা যদি দেশের ও দশের মঙ্গল কামনা কর—তো এই জার্মান সৈনিকসাধারণের হিতে রত হও। এরাই তোমাদের একমাত্র শুভার্থী।

বুকে হাত রেখে এ-কথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য যে, সরকারী মূল্যে এক পো রুটীর ব্যবস্থা, তা সে যার প্রসাদেই হোক, শহরে একরকম স্থায়ীভাবে প্রচলিত হলো। অর্থাৎ. যার ট্যাকে পয়সা আছে সে ইচ্ছে করলে ঐ রুটি কিনে সারাদিন হেঁসে খেলে চিবতে পারে। তবে মানুষ যে শুধু রুটি খেয়েই বাঁচতে পাবে না, এই বাইবেলী সত্য অচিরেই অনেকেই উপলব্ধি করলে। অনাহারে থাকার এইটুকু সুবিধা যে, মানুষ রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করার মত বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকে। কিন্তু এই এক পো রুটির প্রক্রিয়া ভয়াবহ। তা সুষুপ্ত বুভুক্ষাকে খোঁচা মেরে জাগিয়ে দেয়; এসে জোটে হাজার হাজার অতৃপ্ত লালসা। তরকারী, মাছ-মাংস, ডিম, মাখন, তেল, চিনি আর তাদের হাজার রকমের সংমিশ্রণের সম্ভাবনা মানুষকে পাগল করে তোলে। এই শুকনো রুটির সঙ্গে আরো কিছু একটা মুখে দেবার জন্যে প্রাণ অস্থির হয়ে ওঠে। সারাদিনের মধ্যে আর কোনো চিন্তা মনে স্থান পায় না। অথচ এই রুটি ছাড়া শহরে আর কিছু নেই।

তারপর একদিন ফিকে সবুজ রঙের কাগজে ছাপান প্রাচীর-বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেল, কী এক অতি সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী শহরে এসে

পড়লো বলে। এবং সত্যই সরকারী দোকানে দোকানে সরকারী মূল্যে ছটাকী ঠোঙায় এই খাদ্য-সামগ্রী কিনতে পাওয়া গেল। এক ছটাক ধূসর লবণ! সঙ্গে সঙ্গে শহরের মানুষকে উপদেশ দেওয়া হলো যে, এই লবণ খাদ্যরূপে ব্যবহার না করাই ভালো। যদি একান্ত ব্যবহারই করতে হয় তো তাকে জলে ফুটিয়ে, সেই জল তরকারী বা সূপে দেওয়া চলতে পারে। অবশ্য এই লবণ যে স্নানের পক্ষে অতি উত্তম বাথ-সল্টেরও উচ্চস্তরের সামগ্রী তা বলাই বাহুল্য। যা পেটে সয় না তা যে পিঠে সয় এও বড় কম সান্ত্বনার কথা নয়।

এর পর প্রায়ই নানা রঙের কাগজে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হতে লাগলো—আসিতেছে! আসিতেছে! এবং আসিল সেই ছটাকী ঠোঙায় ধূসর লবণ। কয়েকবার আসিল কাঁচ্চা পরিমাণ ময়লা চিনি, কয়েক টুকরা সাবান, বাদবাকী ধূসর লবণ। একবার মাংস আসবার কথা ছিল, তবে ছ-মাসের মধ্যে সেই মাংসের দরশন বা পরশনের সুখ আমার ভাগ্যে ঘটে নি।

দৈনন্দিন এক পো রুটির ব্যবস্থা কতদিন টিকে ছিল তা আমার জানা নেই। তবে বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থা শহর ছেড়ে গ্রামে পৌছতে সমর্থ হয় নি। কারণ গ্রামে প্রচুর শস্যক্ষেত্র, শস্য থাকুক বা নাই থাকুক।

এর মধ্যে একদিন ফ্রাঙ্ক্ সাহেব সগর্বে ঘোষণা করলেন—ফ্যুরের এবং ভগবৎ কৃপায় আমরা পোলদেশকে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছি। হাইল্ হিট্‌লার!

যাযাবর জাতিদের একটি বিশেষত্ব এই যে, তারা প্রতিষ্ঠিত জাতিদেব চেয়ে অনেক পরিমাণে সহিষ্ণু, এবং দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামে এমন অভ্যস্ত যে, তাদের উচ্ছেদ-সাধন করতে গিয়ে অনেক সময় উচ্ছেদকারী নিজেই উচ্ছন্ন গেছে। ইহুদী-নির্যাতন হিট্‌লারী আমলের স্পর্ট নয়, প্রাচীন রোমকদের সময় থেকেই ইহুদী-ঠেঙানোব কথা ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছে। তারপর প্রাক্-মধ্যযুগ ও মধ্যযুগে যখন তথাকথিত le Juif errant বা ভ্রাম্যমান ইহুদী ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন দেশে বাসা বাঁধতে শুরু করলে তখন থেকেই "পগ্রমের" গোড়াপত্তন। কোনো দেশের, প্রদেশের বা পল্লীর কোনখানে ব্যাপকভাবে কোন অশুভ ঘটনা ঘটলেই স্থানীয় লোকদের নজর পড়তো এই রহস্য-জড়িত বিদেশীদের ওপর। এবং যেখানে দুর্ঘটনার কারণ নিরূপণ করা সম্ভব হতো না, সেইখানেই তারা আপন দুর্ভাগ্যের বোঝা এদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেদের হাল্কা করে নিত।

আমার একটি ফরাসী পরিচিত একবার বলেছিলেন, তিনি সমগ্র মানবজাতিকে এক-পরিবার-ভুক্ত মনে করেন, শুধু ইহুদীদের ছাড়া। ইহুদীদের ভ্রাতৃজ্ঞানে স্নেহ করবার পথে প্রধান অন্তরায় এই যে, তারা

মূলতঃ বস্তুবাদী, অর্থকামী, যা তাদের স্বভাবগত না হলেও রীতিগত। দ্বিতীয়তঃ তাদের চিন্তাপ্রণালী এমন গোপন, বক্র এবং হয়তো গভীর যে, সাধারণ মানুষের মনে তাদের প্রতি ভীতি সঞ্চারিত হওয়া আশ্চর্য নয়। এই ভীতিই তাদের প্রতি অবিশ্বাস উৎপাদন করে। তা ছাড়া ইউ-রোপের নানা দেশে বহু শতাব্দী যাবৎ বাস করা সত্ত্বেও যে তারা সেই সেই দেশের বাসিন্দা বনে যেতে পারে নি তার কারণ এই যে, তারা নিজেদের বরাবর ভগবৎ-নির্বাচিত জাতি জ্ঞান করে এসেছে। এবং অনেক ক্ষেত্রে, যা অবশ্য নিতান্ত অসত্য নয়, না-ইহুদী জাতিরা যাদের তারা "গয়া" নামে অভিহিত করে থাকে, বুদ্ধি-বৃত্তিতে তাদের সমকক্ষ হতে পারে নি। তাই "গয়ারা" যখনই তাদের সঙ্গে বুদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতি-যোগিতায় হার মানতে বাধ্য হয়েছে তখনই বাহুবল প্রয়োগ করতে দ্বিধা বোধ করে নি।

গত যুদ্ধের পর জার্মানীর দুর্দশার কারণ অনুসন্ধান করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। ইংরেজ, ফরাসী ও মারকিনী এই ত্র্যহস্পর্শের প্রসাদে জার্মানী বহুদিন মাথা তুলতে পারবে না, সে-কথা হিট্‌লার মহোদয়েরও অগোচর ছিল না। কিন্তু ১৯৩১ সালে হিট্‌লারের অস্ত্রাগারে সবেমাত্র কাজ আরম্ভ হয়েছে। সুতরাং সাধারণ জার্মানের পুঞ্জীভূত আক্রোশকে একত্র করে উক্ত ফ্যুরের কৌশলে ইহুদীদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন —লে, লে! তারপর পথে-ঘাটে এই নিরীহ জাতির যে নির্যাতন শুরু হলো সে খবর পৃথিবীর মানুষের অজ্ঞাত নয়। যারা খাস্‌ জার্মানীতে ইহুদী-পগ্রম প্রত্যক্ষ করেছে তাদের মনে পড়ে শত সহস্র মানুষ কীভাবে নিপীড়িত হয়েছে। পথে রক্তগঙ্গা, নারীর অসম্মান, দোকান লুট, ছোট ছোট অপমান, অবমাননা। পোলদেশ অধিকার করে হিট্‌লারী-দুলালের দল আবিষ্কার করলে, সে-দেশে আর কিছু না থাক; ইহুদী-শিকারের

অভাব নেই। সুতরাং শুরু হলো ব্যাপক ও ব্যবস্থিত-ভাবে ইহুদী-নির্যাতন।

ইহুদীদের ধন-দৌলত এবং যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির সীমা নির্দেশ করে দেওয়ার কথা আগেই বলেছি। সুতরাং ইহুদীর সোনার ঘড়ি, গহনাপত্র, ফার-কোট তার গা থেকে খুলে নেওয়া অতিশয় মামুলী জিনিষ হয়ে দাঁড়ালো। ইহুদীদের বাড়ী ঢুকে তার যথাসর্বস্ব লুট করবারও কোন প্রতিবন্ধক রইলো না। তাছাড়া খেয়াল-মাফিক ইহুদীকে ছপ্‌টি লাগানো, তাকে "শোর কুকুর" বলে গাল দেওয়া, তাকে গুলি করবার আগে তাকে দিয়েই কবর খুঁড়িয়ে নেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি সবারই একরকম গা সওয়া হয়ে এলো। কিন্তু এততেও জার্মানদেব আশ মিটলো না। পোলদেশে তাদের অধিকার যতই পাকা হয়ে আসতে লাগলে ইহুদী-নির্যাতন ততই মাত্রায় বেড়ে চললো।

কিছুদিন অত্যাচার করার পর জার্মানরা হতভম্ব হয়ে আবিষ্কার করলে যে আলখাল্লা-পরা, মাথায় গোলটুপী-ওয়ালা ইহুদী ছাড়াও হাজার হাজার ইহুদী আছে যাদের খপ্‌ করে ইহুদী বলে পাকড়াও করা যায় না। অনেকেরই চেহারা হিট্‌লার্‌, গ্যেরিং, গোব্ব্‌ল্‌স, হেস্‌ বা হিম্‌লারেরই মত, কোট-পেন্টুলেন পরে, মাথায় ফেল্‌ট্‌ হ্যাট্‌ চড়িয়ে সর্বত্র ঘুট্‌ ঘুট্‌ করে ঘুরে বেড়ায়, অথচ তারা ইহুদী। এ অবস্থায় যখন তাদের হাত নিস্‌পিস্‌ করছে তখন পথের মানুষকে দাঁড় করিয়ে, সে ইহুদী কিনা জিজ্ঞেস করে ছপ্‌টি লাগাতে গেলে নির্যাতনের আসল মজাটুকুই মাটি হয়ে যায়। তাছাড়া কোট-পেন্টুলেন-পরা অতগুলো ইহুদী হাত-ছাড়া হয়ে যাওয়াও কম আফ্‌শোসের কথা নয়।

সুতরাং ইহুদীদের যাতে দূর থেকেই চেনা যায় সে-ব্যবস্থা জার্মান সরকারই করে দিলে। আদম-সুমারীর খাতা মিলিয়ে যাবতীয় ইহুদীদের

হুকুম দেওয়া হলো যেন তারা হাতের ওপর জিয়নের পাঁচ-কোণা তারা-আঁকা পট্টি ব্যবহার করে।* উক্ত চিহ্ন ব্যবহার করার ফলে ইহুদী-নির্যাতনের পন্থা সত্যিই সুগম হয়ে গেল। ফাই-ফরমাস খাটতে, মোট বইতে, গোসলখানা সাফ করতে আর লোকের অভাব নেই। শুধু রাস্তায় বেরিয়ে হাতে পটিওয়ালা কাউকে ডেকে আনলেই হলো। ইতর-ভদ্রের পার্থক্য নেই, ইহুদী উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, লেখক, শিল্পী, উচ্চ কর্মচারী এমন অল্পই আছেন যাঁরা একবার না একবার উপরি-উক্ত ধরণের আবশ্যিক কর্মে নিযুক্ত না হয়েছেন।

ইহুদীদের জাতি নিরূপণ করায় সরকারেরও কম সুবিধা হলো না। শহরে মাথা পিছু এক পো রুটির বরাদ্দ করে দেবার সময়ে ইহুদীর বেলায় ২॥০ ছটাকের বন্দোবস্ত করা হলো। সে রুটিও সে আর্যের দোকানে কিনতে পারবে না। ছাতা-পড়া আটার ময়লা রুটি ইহুদীদেরই দোকান থেকে তাকে কিনতে হবে। তাছাড়া ধূসর লবণ তার ভাগ্যে জুটলো বটে কিন্তু সাবানে তার অধিকার নেই। এবং তাকে যে মাংস দেওয়া হবে এ আশাও তাকে দেওয়া হলো না।

তারপর হাতে পট্টিওয়ালা ইহুদীদের এক অভিনব কর্ম-ফৌজ গঠন করা হলো। অর্থাৎ "অলস" ইহুদীদের "মেহন্নৎ" করতে শেখানো হবে। শহরে কাজের অভাব নেই। রাস্তায় বরফ জমে মানুষের হাঁটু ছাড়িয়ে উঠেছে, বোমায়-ভাঙা বা পোড়া বাড়ীর ইটপাটকেল এখনো সাফ করা হয় নি। ভোর হতে না হতেই রাস্তায় শুনতে পাই এই মেহন্নৎ-ফৌজের চলন-গীত যার সার মর্ম এই যে, তারা এতদিন কুড়েমী করে

* অনেক জায়গায় ইহুদীরা বুক ও পিঠের ওপরেও উক্ত তারকা-চিহ্ন ধারণ করতে বাধ্য হয়েছে।

কাটিয়েছে, সোণার হিটলারের কৃপায় এবার তারা মেহন্নতের আনন্দ উপভোগ করতে শিখেছে। জার্মান সান্ত্রী এদের লরী-বোঝাই করে আর না হয় রাস্তা দিয়ে কুচকাওয়াজ করিয়ে বেগার খাটাতে নিয়ে যায়। কাঁধে কোদাল, দূর থেকে স্যাপার বলে ভুল হয়। আশ্চর্য সহিষ্ণুতা এই জাতির। এদের মুখ থেকে হাসি মুছে দেওয়া একটা হিটলারের কাজ নয়, তা এদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। তারা যে এই সমস্ত অত্যাচারের একদিন কঠোর প্রতিশোধ নেবে সে সঙ্কল্পের আভাষও তাদের এই হাসি-মুখ মুখোসে ধরা যায় না।

এততেও জার্মানদের আশা মেটে না। ইহুদীদের একত্র করে একসঙ্গে অল্প খরচে কী করে মারা যায় তার উপায়ও যথাসত্বর উদ্ভাবিত হলো। উপায় অতি সহজ। শহরের মাঝখানে যেখানে ইহুদীদের সংখ্যা অধিক, অর্থাৎ একটি সমগ্র পল্লীর চারিপাশে পাঁচিল তোলা হতে লাগলো।* উদ্দেশ্য শহরে একটা ঘেত্তো বানানো, তারপর তাদের একসঙ্গে হত্যা করা। এই ব্যাপক হত্যার তোড়জোড় স্বচক্ষে দেখেছি বটে তবে আসল হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করবার দুর্ভাগ্য আমার হয় নি। শুনেছি এই ঘেত্তো লক্ষ্য করে জার্মানরা নাকি বোমা বর্ষণ করেছিল। এবং ইহুদীরাও নাকি শেষ পর্যন্ত অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এও নিতান্ত মামুলী জিনিষ।

বুড়ো গ্রীন্‌স্পাম্‌-এর একটি গল্প শুনুন ঃ

প্রশেঁ পানা, মিথ্যে বলবোনা, পদ্‌ হাইলেম্‌ ‡ বলচি, যা বলবো তার একটি বিন্দুও মিথ্যে নয়। উলীৎসা ক্রূচায় বাড়ী করেছিলেন আমার

* ১৯৪৯-এর এপ্রিলের শেষে যখন ভারশো থেকে চলে আসি তখনই অনেকখানি পাঁচিল গাঁথা হয়ে গেছে।

‡ শপথ করে বলছি। ইহুদীদের ভাষা।

বাবা, সে কি আজকের কথা? ৬৩ সালের বিদ্রোহের কিছুদিন পরেই বাবা রুশীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে জার্মানীতে পালিয়ে যান। তখন পোলে ইহুদীতে ফারাক ছিল না, তখন ছিল এক ভাষা, এক দেশ, আর একমাত্র লক্ষ্য স্বাধীনতা। জার্মানী থেকে বাবা যখন ফিরে এলেন বিশ বছর গা ঢাকা দেওয়ার পর, তখন মস্কালরা * তাঁর কথা ভুলে গেছে। সে যাই হোক, দেশ ছেড়ে এক রকম ভালোই করেছিলেন। হাম্‌বুর্গে ব্যবসা করে উপার্জন কম করেন নি। তাই দেশে ফিরেই উলীৎসা ক্রূচায় ঐ বাড়ীখানা কিনে ফেললেন। তার আগে আমাদের বাসা ছিল, উলীৎসা ঝেলাজ্‌নায় গরীব পাড়ায়, আমি সেইখানেই মানুষ হই। ক্রূচায় উঠে এসে এ-পাড়ায় আমার কিছুতেই মন টেঁকে না। বয়েস আমার তখন কম নয়, বছর বাইশ, যে-বয়েসে মানুষ নতুন জায়গা, নতুন দেশ খুঁজতে বেরয়, অথচ আমার মন কেবলই সেই এঁদো স্যাঁৎসেঁতে ঘরখানায় ফিরে যেতে চাইতো। সেইখানেই আমার সত্যিকার আধ্যাত্মিক আবহাওয়া, আর এই নতুন জায়গায়, বড় মানুষদের পাড়ায় আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠতো। বাবা শুনে হাসতেন। যাই হোক, আমাদের আর ইহুদী পাড়ায় ফেরা হয় নি, আমার ছেলেপুলেরাও এইখানেই জন্মেছে, এইখানেই মানুষ হয়েছে। আমার একটু আধটু ঈড্ডিশ্‌ † মনে পড়ে বটে, কিন্তু আমার ছেলেমেয়েরা পোল ছাড়া আর কিছু জানে না। কোথেকে জানবে বলুন? উলীৎসা ঝেলাজ্‌না ছাড়বার পর সে-পাড়ায় ইহুদীদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কও আর নেই। আমার কথা ছেড়েই দিন্‌ এই বুড়ো হাড়কখানা রাখতে পারলে বাঁচি।……

…আমার তিন বেটার মধ্যে দুজন যুদ্ধে গিয়ে আর ফেরে নি।

* রুশীদের অবজ্ঞা-সূচক অভিধা।

† ইহুদীদের পাঁচ-মিশালী ভাষা। ঠাট জার্মান তার সঙ্গে হিব্রু মেশানো।

থাকবার মধ্যে আছে ছোট ছেলেটা। মেয়েরা অবিশ্যি যে-যার শ্বশুর-বাড়ী। যুদ্ধে তাদের কি হয়েছে না হয়েছে জানি না, আর এই বুড়ো বয়েসে বাপু আমি আর অত ভাবতেও পারি নি।...

...শহরের ওপর দিয়ে যে-ঝড়টা বয়ে গেল তাতে কি আর কারু বেঁচে থাকবার কথা? তবুও আমাদের এই বাড়ীটা ভগবানের দয়ায় একরকম করে পার পেয়ে গেল। সামনের ঐ দুখানা ফ্ল্যাটের ভাড়াই আমাদের একমাত্র সম্বল। যুদ্ধের পর অবস্থা সকলেরই সমান। তাই এক রকম করে চালিয়ে নিচ্ছিলাম। তারপর একদিন পাড়ার কে একজন জার্মানদের খবর দিলে, আমরা ইহুদী। সেই থেকে এই তারা-আঁকা পট্টি হাতে বেঁধে বেড়াচ্ছি। সে অবিশ্যি এমন কি লজ্জার কথা! এই রকম অত্যাচারের ভেতর দিয়েই হিট্‌লারের লোকেরা হয়তো একদিন আমাদের একটা জাত গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। কিন্তু জর্মানরা আমাদের বাড়ীখানাও নাকি বাজেয়াপ্ত করেছে। তাই শুনে ভাড়াটেরা আর ভাড়া দেয় না। যাক্‌, না দিলে আর করচি কী? ওসব আর গায়ে মাখি না। কিন্তু এই বুড়ো বয়সে জার্মানরা আমার মনে যে দাগা দিলে সে কি আর ভুলতে পারবো!......

...দাভিদের বয়েস গেল অক্টোবরে চার বছর পূর্ণ হয়েছিল। আমার বড় ছেলের ছেলে, ওর বয়স যখন বছরখানেক তখন ওর মা মারা যায়। সেই থেকে আমার ছেলে ওকে মায়ের মতন মানুষ করেছিল। সেও তার বাপকে ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে পরেতো না। মানে যতক্ষণ বাপ বাড়ী থাকতো। তারপর তার বাপ আপিসে গেলে এই দাদু! এই সারাদিন দাদুর সঙ্গে হয় গল্প শোনাতে হবে নয় ছবি দেখাতে হবে, আর না হয় বেড়াতে যেতে হবে। অতটুকু ছেলে, কিন্তু এর মধ্যেই সে পড়তে শিখেছিল। বেড়াতে বেরিয়ে রাস্তার যত রাজ্যের বিজ্ঞাপন

পড়তো আর কেবলই জিজ্ঞেস করতো এটার মানে কী দাদু, ওটার মানে কী দাদু? তার জবাবদিহি করতে করতে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠতো। কিন্তু তার সর্ববিষয়ে খবর রাখা চাই।...

...যাক্‌ সে কথা। যুদ্ধ বাঁধবার আগেই তার বাবাকে ফৌজে যোগ দেবার জন্যে ডেকে পাঠালে। মনে আছে সেদিন ভোরবেলা দাভিদ জাগবার আগেই তার বাবা তাকে শেষ চুমু খেয়ে আমার কানে কানে চুপিচুপি বললে—বাবা, দাভিদকে তোমার কাছে রেখে গেলাম। আমি এলে আবার ফিরিয়ে দিও।...

...তারপর এই যুদ্ধ। কত বাড়ী ভাঙলো কত বাড়ী পুড়লে, কত মানুষ প্রাণ হারালে, কত মানুষ জন্মের মতন খোঁড়া, আতুর হলো। কিন্তু দাভিদের গায়ে আঁচড়টি লাগতে দিই নি। যুদ্ধ যখন থেমে গেল তখন ভাবলাম, দাভিদকে তাহলে তার বাপের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারবো।...

...যুদ্ধের পর এই ভয়ঙ্কর অকাল, দুর্ভিক্ষ। শহরের কোথাও ইহুদীর জন্যে এক ফোঁটা দুধ নেই, একছিটে মাখন নেই, এক টুকরো মাংস নেই। তবুও খাই না খাই দভিদের জন্যে খাবার ভগবান একরকম জুটিয়ে দিতেন। দাভিদ তার বাপের কথা প্রায়ই বলতো। কিন্তু ছেলেমানুষ কিনা, এটা ওটা সেটার গল্প বলে ভুলিয়ে দিলে আবার ভুলে যেতো। একদিন সন্ধ্যেবেলা বলে কি, তার বাপের জন্যে ভারী মন কেমন করছে। জিজ্ঞেস করি, কেন রে? তোর দাদুকে বুঝি ভালোবাসিস না?—বলে, তা কেন, আমার গলায় ভারী বেদনা করছে কিনা তাই বাবার জন্যে মন কেমন করছে। শুনে আমি হেঁসে খুন। কিন্তু ওর মন কেমন করে জানতে পেরেছিল, ও আমাদের ছেড়ে চলে যাবে।...

...তারপরের দিন আর সে কিছু গিলতে পারে না। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকলুম। ডাক্তারে বলে—ডিফ্‌থিরিয়া, তখনও সীরাম না কি ওষুধ দিলে নাকি সারতে পারে। তার দুটি হাতে ধরে কাকুতী মিনুতী করি, বলি দাভিদকে সারিয়ে দাও বাবা, আমি চিরদিনের তরে তোমার কেনা হয়ে থাকবো। ডাক্তার বলে, সে ওষুধ নাকি জার্মান সরকারেব ঠেঁয়ে পাওয়া যায়। এখন নাকি ডাক্তারখানায় তা পাবার জো নেই। ওষুধ যখন আছে তখন দাভিদকে বাঁচাতে পারবো এই আশায় বুক বেঁধে আমি ডাক্তারের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে জার্মানদের কাছারীতে গিয়ে হাজির হলুম। তাও কি ঢুকতে পারি? আমার হাতের তারা-আঁকা পট্টি দেখে সান্ত্রিরা আমায় ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দেয়, লাথী মারে, গাল দেয়। তবুও আমি জোড় হতে করে বলি—বাবারা, একটু দয়া করো গো বাবা, বড় ডাক্তারের কাছে গিয়ে চিঠি না নিয়ে এলে বিনে ওষুধে আমার নাতিটাকে বাঁচাতে পাববো নি বাবা। ওরা দাঁত খিঁচিয়ে আমায় আবার খেদিয়ে দেয়। বলে, হ্যাঃ তোর নাতির জন্যে ভেবে ভেবে ডাক্তার সাহেবের রাতে ঘুম হচ্চে না। ভাগ্। শেষকালে তাদের ঘুষ দিয়ে তো ঢুকলুম সেই আফিসে, তারপর আবার ঘুষ দিয়ে বড় ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখাও তো করলুম। কিন্তু...কিন্তু তার মন গললো না। বললে—য়ুডে*, তোর নাতি যাবে, তাতে তোর যেমন দুঃখ হবে, তার চেয়ে ঢের ঢের আনন্দ হবে সমস্ত জগতের যে একটা ইহুদী কমলো।—তবুও কত কাকুতি-মিনুতি করি। কিছুতেই মন গললো না।...

...তিন দিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে দাভিদ আমায় ছেড়ে চলে

* ইহুদী।

গেল। যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, আর যতক্ষণ কথা কইতে পারতো ততক্ষণই কেবল "বাবার কাছে যাবো," "বাবার কাছে যাবো।"…

…হয়তো সে তার বাপের কাছেই গেছে। তাহলেই বাঁচি, আমাকে আর তার বাপের কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।…

দেওয়ালের গায়ে ছাপানো মৃত্যুসংবাদে থমকে দাঁড়াই ঃ পান্না ম— যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন। অমুক দিনে তাঁর সৎকার করা হবে।

পান্না ম— আমার একটি বিশেষ পরিচিতা। একই প্রতিষ্ঠানে আমারা কাজ করতাম, সুতরাং যুদ্ধের আগে পর্যন্ত এমন দিন যায় নি যে তাঁর সঙ্গে একবার না একবার দেখা না হয়েছে। বয়েস বছর পঁচিশ, স্থির হয়ে বিচার করলে সুন্দরী বলা চলতো। ভারী হালকা মেজাজ, তার সঙ্গে সার্ল-সুলভ ভাব-ভঙ্গি এবং কোথায় যেন একটি গোপন বিষাদ পান্না ম—র সঙ্গ নিতান্ত প্রীতিকর করে তুলতো। আফিসের চেয়ারগুলো কী এক অদ্ভুত উপায়ে যে ক্রমে তাঁর টেবিলের চারিপাশে এসে জড়ো হতো তা কেউ ধরতে পারতো না, অথচ তাঁর সেই কোনটি ছেড়ে হুড়হুড়িয়ে চেয়ার টেনে নিয়ে বিপরীত কোণে গিয়ে বসার মত চরিত্রবল আফিসের কারো ছিল বলে বিশ্বাস হয় না।

বহুদিন আগে এক বেদেনী পান্না ম—র হাত দেখে নাকি বলেছিল, তিনি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাবেন। পান্না ম—র উচ্ছল হাসির মধ্যে যে একটি বিষন্ন ছায়া কখনো কখনো চোখে পড়তো তার সঙ্গে সেই বেদেনীর ভবিষ্যদ্বাণীর কোনো সম্পর্ক ছিল কি না জানি না। কিন্তু লক্ষ্য করেছি

সেই বেদেনীর হাত দেখার গল্প বলবার সময়ে তিনি কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেন। তারপর হেসে বলতেন—মরতে দুঃখু নেই, সত্য বলছি, শুধু আমার কফনের পিছু পিছু যে তোমরা সব টুপী খুলে চলেছো এই দৃশ্য যখনই কল্পনা করি তখনই ভাবি, আহা এতগুলো নিরীহ লোককে কেন মিছে কষ্ট দেওয়া! সত্যি, আমি যদি দুর্ঘটনায় মারা যাই তো তোমরা যেন আমায় গোর দিতে সঙ্গে যেও না।

পান্না ম—র মৃত্যু ঘটলো অদ্ভুত উপায়ে।

যুদ্ধের সময়ে পুরানা শহরের পলকা ছোট বাড়ী ছেড়ে পান্না ম— এবং তাঁর সমগ্র পরিবার আর এক আত্মীয়ের ফ্ল্যাটে এসে উঠলেন। ও-অঞ্চলে অত বড় আর অত মজবুত বাড়ী কোথাও ছিল না। শহরের মধ্যে আর একটা শহর বললেই হয়। লোহার ফ্রেমে গ্রানিট দিয়ে তৈরী সে এক ইমারতের দৈত্য। সমস্ত বাড়ীটায় শ-পাঁচেক মানুষের বাস। যারা শেষ তলায় আশ্রয় পেয়েছিল তাদের সৌভাগ্যের কথা ভেবে পাড়া-পড়শীর ঈর্ষার উদ্রেক হতো। কিন্তু বিপদ সে পাড়ায় ঠিক সেইখানেই এসে হাজির হলো সবার আগে। শহরের ওপর যখন পূর্ণমাত্রায় বোমা বর্ষণ চলেছে তখন ঐ বাড়ীখানাকে সবচেয়ে মজবুত দেখে তারই ছাদের ওপর বিমান-ঘাতী কামান বসানো হলো। তাছাড়া তার ভেতরকার প্রকাণ্ড উঠোনে এসে আশ্রয় নিলে শ-খানেক যুদ্ধের ঘোড়া। কয়েকবার সে পাড়ায় বোমা ফেলতে এসে জার্মানী বৈমানিকরা ঐ বাড়ীর ছাদ থেকে গুলী খেয়ে গেল বটে কিন্তু যারা ফিরলো তারা বাড়ীখানাকে ছকে নিয়ে গেল। তারপরে চললো সেই বাড়ী লক্ষ্য করে বিমান আক্রমণ। বারকয়েক অকৃতকার্য হয়ে জার্মানদের জেদ বেড়েই চললো। এবং এতবার শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করায় সবারই ধারণা হলো ঐ বাড়ীর মত নিরাপদ স্থান শহরের আর কোথাও নেই। কিন্তু সে বিশ্বাস বেশী

দিন টিকলো না। অজস্র বোমা-বর্ষণে এই ইমারতের দৈত্য বিশাল ভগ্নস্তূপে পরিণত হলো। এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ সেই পর্বত প্রমাণ ভগ্নস্তূপের ইট পাটকেল সরিয়ে ভেতরের মানুষকে রক্ষা করবারও কোনো উপায় রইলো না।

যুদ্ধের পর ছ মাস অবিরত পরিশ্রমের পরে এই ইমারতের ভেতর প্রবেশ করা সাধ্য হয়েছে। তখন আর মানুষ চেনা যায় না।

পান্না ম— বলে যে-দেহটাকে খুঁজে পাওয়া গেল তার হাতে মুঠো-করে ধরা তাঁরই ফটো।

আপন মর অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মানুষের এই যে মায়া এ এক অদ্ভুত আকুতি।

দিদির সঙ্গে কতদিন দেখা হয় নি ! হঠাৎ একদিন মনে হলো যেন আমায় তাঁর খুব দরকার, যেন আমায় ডাকছেন। কী এমন দরকার হতে পারে ? হয়তো আমার মনের ভুল। আমি কি চলে আসতে চেয়েছিলাম ? তিনিই তো আমায় নিজে সরিয়ে দিলেন ! হয়তো আমার জন্য মন কেমন করছে। আর আমার করে নি বুঝি ? মনে মনে বলি, আজ খুব একচোট শুনিয়ে দেবো। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন তাঁর ডাক শুনি। সেই মুহূর্তেই যেন ছুটে না গেলে নয়।

তাঁর ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবি। ঘণ্টা টেপবার সাহস পাই না। তারপর অতি সাবধানে আস্তে আস্তে দরজায় টোকা মারি। ঘরের ভেতরে চেয়ার সরাবার শব্দ, ঐ ঢুকে দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। দিদি !

দোর খুলে বলেন—আয় রে।—গলার স্বর ভারী, যেন একলা বহুক্ষণ ধরে কেঁদেছেন।

জিজ্ঞেস করি—হালীনা কোথায় ?

মামুস্যার কাছে।

কেমন আছো ?

আমি ভালো আছি।—উত্তর সংযত। তাই আর বেশী প্রশ্ন করতে ভরসা হয় না। একটু পরে বলেন—বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবি ? আয়, তোকে ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম। ওঁর অসুখ বেড়েছে।—দিদির চোখে জল টলটল করে। তারপর কান্না চেপে হেসে বলেন—আয় রে, তোকে আমার ভারী দরকার। লক্ষ্মী ভাইটি, তোর অন্য কোন কাজ নেই তো ?

ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে তাঁর স্বামীর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন—ওঁর আর জ্ঞান নেই। কাল রাত্তিরে ডাক্তার বলে গেছে, আর আশা নেই।

ডাক্তারে বললেই হলো কি না !—সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি।

দিদির স্বর সংযত—ক্ষেপেছিস্ ! ওঁকে আর রাখতে পারলাম না ভাই। আচ্ছা হিরণ, সত্যি করে বল্ দেখি, তোর কী মনে হয় ? ওঁকে কি সত্যিই বাঁচাতে পারা যাবে না ?

দিদি, তুমি তো সব বোঝো। শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে চেষ্টা করতে হবে বৈকি।

দেখ্, আমারও তাই মনে হচ্ছিল। তাইতো তোকে মনে মনে ডাকছিলাম, তুই ভাই যদি এক দৌড়ে মামুস্তাকে খবর দিয়ে আসতে পারিস। মামুস্তা এঁর কাছে বসলে আমি একবার ডাক্তারের কাছে ঘুরে আসতে পারি।

মামুস্তা জানেন না বুঝি ?

মামুস্তা, হলীনা, কেউ না। পরশু রাত থেকে হঠাৎ বাড়াবাড়ি, কাউকে কি আর খবর দিত পেরেছি !

বল্লি—শোনো দিদি আমি এঁর কাছে বসছি। তুমি আগে ডাক্তারের বাড়ী গিয়ে পথে মামুস্তাদের ডেকে নিয়ে এসো।

তাই ঠিক হলো। দিদি তাড়াতাড়ি ওভারকোট গায়ে দিয়ে ঘর

থেকে বেরিয়ে গেলেন। পেছনকার সিঁড়ি দিয়ে তাঁর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো, দিদির মনে এই যে নূতন আশার সঞ্চার হয়েছে, এর জন্যে হয়তো আমিই দায়ী। নির্বাণোন্মুখ মুমূর্ষুর দিকে চেয়ে ভাবি, দিদি ফিরে আসার আগেই যদি যাদু বিদ্যার সাহায্যে এঁকে বাঁচিয়ে তুলতে পারতাম তাহলে হয়তো দিদিকেই বাঁচানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়তো। তাঁর স্বামীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছে। দিদির নিজের মনেও আশা নেই, শুধু এই দীর্ঘ অসুস্থতায় তাঁর মন এমন অভ্যস্থ হয়ে গেছে, যে তাঁর পক্ষে তাঁর স্বামীর সহসা আরোগ্যলাভ বা মৃত্যু দুইই সমান অসহনীয় হয়ে উঠেছে। তিনি যে ছুটে ডাক্তার আনতে গেলেন, তার মূলে ছিল শুধু এই বাঁচিয়ে রাখবার আশা।

মুমূর্ষুর মুখের ভাব আস্তে আস্তে কেমন যেন প্রশান্ত হয়ে আসছে। বহুদিন রোগ ভোগ করে তাঁর কপাল আর গালের দুপাশে যে বেদনার পুঞ্জীভূত রেখা টঙ্কিত হয়ে উঠেছিল সেগুলো ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসছে। কোথায় যেন তাঁর অস্তিত্বের নিভৃতে এক চরম উপশমের পরোয়ানা এসে পৌছেছে। পঙ্গু দেহের যাকিছু যন্ত্রণা, আধো জাগা মনের ঘোলাটে অন্ধকারে এই যে লক্ষ্যহীনভাবে হাতড়ে বেড়ানো, আর মাঝে মাঝে তার ভেতর চেতনার অকস্মাৎ আলোক-বিচ্ছুরণ, আর সারাক্ষণ ধরে এই যে অবচেতনার মুহূর্ত হতে মুহূর্ত পর্যন্ত বেঁচে থাকবার অন্ধ আকুতি এই অনর্থক সংগ্রাম থেকে অব্যাহিত পাবার পরোয়ানা। এইবার তাঁর ছুটি।

আকাশের সর্বাঙ্গে ধূসর তুষারের মেঘ, কে যেন স্বর্গ থেকে পৃথিবীটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। বাইরের বারান্দাটায় তুষারের পাহাড় জমে গেছে। বেচারী দিদি, তাঁর আর ঘরকন্না দেখবারও সময়

নেই। ঘরের ভেতরে কী ভীষণ ঠাণ্ডা। স্টোভের গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, উত্তাপের রেশমাত্র নেই। বহু দিন তার ভেতর আগুন জ্বালা হয় নি। অথচ কিছুদিন আগে একটা রুক্‌-সাকে ভরে একটু কয়লা দিতে এসেছিলাম বলে কী রাগ! আমার নাকি কয়লার খনি আছে, নিশ্চয়ই জার্মানদের সঙ্গে জুটে কয়লা জোগাড় করছি, আমি যেন মনে রাখি তিনি ফল্‌ক্‌স্‌-ডয়েচ্‌ও নন্‌, উক্রাইনীও নন্‌, এই ধরণের কতকগুলো কড়া কড়া কথা ক্যাঁট ক্যাঁট করে শুনিয়ে দিলেন। তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললেন—অমনি অভিমান হলো তো! তুই তো জানিস না তোর দিদি কী ভীষণ ধূর্ত! মুখে বড় বড় কথা বলে, কিন্তু আসলে কাজটি ঠিক বাগিয়ে নেয়। কয়লা আমার আছে রে, এই পর্বত প্রমাণ কয়লা, এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি। চাস্‌ তো একদিন দুই ভাই-বোনে রুক্‌সাকে করে খানিকটা বয়ে আনবো। আর শোন্‌, তোর কয়লা ফুরিয়ে গেলে দিদিকে যেন বলতে ভুলিস নে।—নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে দিদি কী ভয়ানক মিথ্যাবাদী তা আগেই জানতাম। কিন্তু রুগ্ন স্বামীকে এই ঠাণ্ডা ঘরে রেখে তিলে তিলে মেরে ফেলবার অধিকারও কি তাঁরই?

আমার বাড়ী বেশী দূর নয়। মুমূর্ষুকে একলা ফেলেই কয়লা নিয়ে এলাম। তারপর প্রকাণ্ড স্টোভটায় আগুন জ্বেলে তার লোহার দরজা এঁটে বন্ধ করে দিলাম। কিছুক্ষণ পরেই স্টোভের মসৃণ শুভ্র গায়ে উত্তাপের জলুস ফুটে উঠলো। বাইরের তুহীন আর ভেতরের উষ্ণতার সংস্পর্শে জান্‌লার শার্শিগুলোয় বাষ্প জমতে লাগলো। ঘরের উত্তাপকে আর গোপন রাখা চললো না।

দিদি ঘরে ঢুকেই আমায় ভর্ৎসনা করতে গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমার মাথাটা দু-হাত দিয়ে ধরে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

আত্মোৎসর্গে তাঁর হার হয়েছে, তাঁকে ফাঁকি দিয়ে আমি আগুন জ্বেলেছি, অথচ স্বামীর দিকে চেয়ে এই হারকে মেনে নিতেই হবে। তাঁর সেই স্নেহ, কৃতজ্ঞতা ও অভিমানে ভরা দৃষ্টি আজো স্পষ্ট মনে আছে।

স্টোভের গায়ে জমে-যাওয়া হাত সেঁকতে সেঁকতে দিদি বললেন—অনেক দেরী হয়ে গেল, হয়তো তোর অনেক কাজের ক্ষতি হলো।

আহা, আমার কী ভয়ানক কাজ!

কে জানে বাপু, কাজ না থাকলে কি আমার কাছে আসতিস্ না?

বলি—আসতে তো তুমিই বারণ করেছিলে! দু-মাসের ওপর গা ঢাকা দিয়ে রয়েছি, এখনো ওরা আমায় ধরতে পারে নি।

উত্তরে দিদি বলেন—দেখ্ ভাই আমার সত্যিই মনে ছিল না। তোর অমন যখন-তখন যেখানে-সেখানে যাওয়াটা আমি পছন্দ করি নে। কিন্তু জানিস তো আমি কী ভয়ঙ্কর স্বার্থপর। এই গেল দু-দিন যে-করে কেটেছে আমার, তাই ভারী ইচ্ছে হচ্ছিল যদি একবার আসতে পারতিস তো বেশ হতো। ঐ দেখো, তোকে কিছু খেতেও দিইনি. তোর নিশ্চয়ই ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।

আমার ক্ষিদের জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। তোমার জন্যে কী রেঁধেছি দেখো না!

নাক কুঁচকে যেন ঘরের হাওয়াকে আঘ্রাণ করে দিদি তাঁর স্বাভাবিক উৎফুল্লতার সহিত বললেন—সত্যি! কারি? তোর বাহাদুরী আছে বটে। এত সব করলি কখন? চল্ দু-জনে খেয়ে নি। শোন্, দিদির ওপর দরদ করে তোর নিজের কারি-পাউডারের সবটা উজোড় করে দিস্ নি তো?

দিদির তখনকার চেহারা দেখলে মনে হয়, তিনি যেন তাঁর স্বামীর অসুখের কথা একেবারেই ভুলে গেছেন। যেন আমার সঙ্গে ভাগাভাগি

করে কারি খাওয়া ছাড়া ওঁর জীবনে কাম্য আর কিছুই নেই। দিদির অভিনয়-প্রবৃত্তি জানা ছিল বলেই খাওয়া শেষ হলে জিজ্ঞেস করলাম—ডাক্তাব এক্ষুনি আসবে নাকি ?

দিদি আমার দিকে না তাকিয়ে একান্ত স্বাভাবিক গলায় বললেন—না। ডাক্তারের দেখা পেলাম না। হালীনা আর আমুস্তা এক্ষুণি আসবে। আর একটু বোস্ না।

না, যাবার তাড়া নেই আমার। তাছাড়া আজ এইখানেই থাকবো বলে তৈবী হয়ে এসেছি। ডাক্তারের ঠিকানাটা দাও তো, একবার ঘুরে আসি।

দিদির চোখ ছলছল করে। বলেন—গিয়ে কোনো লাভ হবে না।

অর্থাৎ ?

ডাক্তার যে হাসপাতালে কাজ করে সেখানকার নতুন জার্মান কর্তা তাকে হাসপাতাল ছাড়তে হুকুম দিলে না। তাছাড়া ওঁর নাকি সত্যিই আশা নেই। একটা ইনজেক্শন্ দিয়েছে লুকিয়ে, খুব বাড়াবাড়ি হলে দিতে বলেছে।

বুঝলাম, আসন্ন শোকের জন্যে দিদি মনে মনে তৈরী হচ্ছেন। যে অনাগতকে প্রতিরোধ কববার তাঁর সামর্থ্য নেই তাকে গ্রহণ করবার সময়ে যে সংযমের প্রয়োজন হবে এ তারই মহড়া চলেছে। বলি—দিদি, একটু ঘুমিয়ে নেবে ?

তুই জেগে থাকবি ?

ক্ষতি কী ?

ঘুমোতে পারবো কী ?—যেন নিজেকে প্রশ্ন করলেন। তারপর আর তাঁর অশ্রু বাধা মানে না। দিদির শোকের কান্না সেই একবার। একটু পরে একেবারে ছেলেমানুষের মত অসহায়ভাবে জিজ্ঞেস করলেন—

ওঁকে কী করে খাওয়াই বল্তো? পরশু আপেলের কম্পৎ খেতে চেয়েছিলেন। কত কাণ্ড করে আপেল জোগাড় করে আনলাম, রাঁধলাম, কিন্তু খেতে দেবো কাকে? দেখ্ হিরণ, আমার মনে হয় কি জানিস্, হয়তো না খেয়েই উনি ঝিমিয়ে গেছেন। কোনো রকমে এই চামচে দুয়েক কম্পৎ খাওয়ালে আবার হয়তো চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। কাল ডাক্তারে গ্লুকোস ইন্জেকশন্ করে গেছে। কিন্তু আমার বাপু ওসবে বিশ্বাস নেই। আয় না ভাই, দু-জনে একবার চেষ্টা করে দেখি, হয়তো এই চামচে দুয়েক খাওয়াতে পারবো।

দিদিকে ছেলেমানুষের মতই ভুলিয়ে বলি—ও অবস্থায় কিছু দেওয়া চলবে না দিদি। একটু ভালো হয়ে উঠলে সব খাওয়াতে পারবে। এখন ওঁকে ঘুমোতে দাও, দেখছো না কী রকম ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন!

আচ্ছা, সত্যি করে বল্ তো ভাই, উনি ঘুমোচ্ছেন কি না।

ঘুমোচ্ছেন না তো কী? তবে ঘোর ঘোর ভাবটা না কাটলে ওঁকে জাগানো যাবে না।

সত্যি ঘুমোচ্ছেন?

হাঁ, তুমিও একটু ঘুমিয়ে নাও দেখি।

দুরাত্রি অনিদ্রার পর দিদিকে বেশী অনুরোধ করতে হলো না। টেবিলের ওপর বালিসে মাথা রেখে তিনি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লেন। শীতের খাটো বেলা হুহু করে পড়ে আসে। আধো অন্ধকার ঘরের মধ্যে অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে নিদ্রাতুর দিদি আর তাঁর অচৈতন্য স্বামীর রেখা-মূর্তি, যেন এক অতি মর্মন্তুদ বিয়োগান্ত নাট্যের অন্তিম দৃশ্য। মামুস্যা আর হসীনা এসে কতক্ষণ যে নিঃসাড়ে বসে আছে তা টেরও পাইনি।

সন্ধ্যের পর দিদির স্বামী হঠাৎ চোখ খুলে চাইলেন, দৃষ্টি প্রাঞ্জল। ঠোঁট নেড়ে কী যেন বলতে চেষ্টা করলেন। দিদির আনন্দে বাধা দিতে

মন সরে না। তাঁর সেই দু চামচে কম্পৎ খাইয়ে দিয়ে দিদি যখন সগর্বে আমার দিকে চেয়ে বললেন—দেখলিতো ডাক্তাররা কী ভয়ঙ্কর বোকা!—তখনো তাঁকে বলতে সাহস হলো না, তার স্বামীর শেষ মুহূর্ত সত্যিই খুব কাছে এসে পড়েছে।

ঘণ্টা কয়েকের জন্যে তাঁর স্বামী যেন হঠাৎ নীরোগ হয়ে উঠলেন। পাশ ফিরে শুয়ে আমাদের সকলের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন, যেন সবাইকে চিনতে পারছেন, যেন দু-এক দিনের মধ্যেই স্বচ্ছন্দে কথা কইতে পারবেন। অদূর ভবিষ্যতের চিত্র কল্পনা করে দিদি বেচারীর যে কী আনন্দ!

রাত দশটা আন্দাজ সময়ে মুমূর্ষু আবার চৈতন্য হারালেন। এবার যেন তিনি বহু গভীরে নেমে গেছেন। বহু ডাকেও আর কোন সাড়া পাওয়া যায় না। এবং দিদির শেষ আশা ডাক্তারের দেওয়া সেই ইন্‌জেক্‌সন দিতে গিয়ে স্থচের আগাটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। যেন দৈবের কারসাজি। সামনের মোড়টা পার হলেই ডাক্তারখানা, একটা জানলায় খানিকটা ঘোলাটে আলো দেখা যায়। হয়তো নতুন স্থচ পাওয়া যাবে। কিন্তু রাত দশটা বেজে গেছে, সাতটার পর পথে বেরুনো মানা। তাড়াতাড়ি ওভারকোটটা গায়ে দিয়ে বেরোতে যাচ্ছি এমন সময়ে দিদি হঠাৎ আমার হাত ধরে টেনে ঘরে ঠেলে দিয়ে আমার আগে বেরিয়ে গেলেন। অন্ধকারে সিঁড়ি দিয়ে তাঁর দ্রুত নেমে যাওয়া পায়ের শব্দ লক্ষ্য করে ডাকি, দিদি, লক্ষ্মীটি দাঁড়াও, তা না হলে আমিও রাস্তায় বেরিয়ে যাবো। সদর দরজার কাছে হঠাৎ পায়ের শব্দ থেমে যায়। তারপর চুপি চুপি দিদি বললেন—গ্লুপ্‌তাশ্‌কু!* শোন্‌ এইখানে চুপ্‌ করে দাঁড়া, আমি এক্ষুনি আসছি। আমি মেয়েমানুষ আমায় যদিও ওরা রেহাই দেয়

*বোকচন্দর

তোকে পেলে আর ছাড়বে না। শ্ শ্ শ্ !—রাস্তায় জার্মান সান্ত্রীর ভারী বুটের শব্দ একেবারে সদর দরজার সামনে দিয়ে চলে গেল। দিদি দোর খুলে বেরিয়ে গেলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখি, তিনি সটান সান্ত্রী-জুটোর সামনে গিয়ে তাদের ভাঙা স্চ দেখিয়ে কী বোঝাতে চেষ্টা করছেন। তারা মাথা নেড়ে বললে শুনতে পাই, য়া য়া আবের গেহেন জী নুর! বেশ তো যান না। মানুষের সমবেদনায় যে জার্মান সান্ত্রীরও হৃদয় মানুষের মতই সাড়া দেয় তার দৃষ্টান্ত সেই প্রথম চোখে পড়লো। কিংবা হয়তো দিদি যাদু জানেন। মিনিট পনেরোর মধ্যেই দিদি ডাক্তার-খানা থেকে নতুন স্চ নিয়ে ফিরে এলেন। শুনতে পেলাম ফেরবার পথে তিনি তাঁর ভাঙা ভাঙা জার্মান ভাষায় সান্ত্রীদের অনুগ্রহের জন্যে ধন্যবাদ জানালেন—ডাংকে শ্যোন্।—অত্যন্ত ভদ্র গলায় উত্তর এলো—বিট্‌শ্যোন্।

কিন্তু ইন্‌জেক্‌শনেও কোনো ফল হলো না। রাত বারোটার সময়ে দিদির স্বামী আস্তে আস্তে স্থির হয়ে গেলেন। সে এক অদ্ভুত সমাধি, অন্তরের গভীরে ধীরে ধীরে লীন হয়ে যাওয়া, প্রয়াণ নয়, নির্বাপণ।

সে রাত্রে দিদিকে সান্ত্বনা দেবার প্রয়োজন হলো না। কারণ মৃতের দেহে আরো গোটা দুই শক্তিশালী ইন্‌জেক্‌শন্ দিয়ে তার অবশ্য-ম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার প্রতীক্ষায় তিনি একটা চেয়ারে ঠায়ে বসে রইলেন। শুধু মাঝে মাঝে উঠে মৃতের দেহ পরীক্ষা করে জিজ্ঞাসা করেন—তোর কী মনে হয়? আমার মনে হয়, উনি আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, নয়? যে দুর্বল শরীর তাই হয়তো নিঃশ্বাস এত আস্তে বইছে যে আমরা ধরতে পারছি না। নাড়ী আছে কিনা তাও কী আমরা দেখতে জানি! তোমরা বুঝতে পারছো না, ওঁর নাড়ী ঠিক আছে, শুধু আমরা ধরতে পারছি না।

সারারাত তুষার পড়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশের অজস্র শুভ্রতায় আলোর প্রতিফলন যখন মৃতের মুখের মূক গাম্ভীর্যকে পরিস্ফুট করে তুললে তখন দিদি তাঁর স্বামীর চোখের পাতা তুলে, বুকে কান পেতে বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন, সে দেহে প্রাণের শেষ পরিস্পন্দন বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়েছে।

এখন আর কাঁদবার সময় নেই। সৎকারের সকল ব্যবস্থা দিদিকে একাই করতে হবে। তাছাড়া তাঁকে তাঁর স্বামীর অন্তিম কালে কোনোরূপে সাহায্য করতে গেলে যে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হতে হবে তা আমরা সবাই জানতাম। সারাদিন বাইরে বাইরে কাটিয়ে সন্ধ্যের কিছু আগে তাঁর বাড়ী গিয়ে দেখলাম দিদি মৃতের মাথার কাছে বাতী জ্বেলে দিয়ে একলা বসে বসে তাঁর স্বামীর ডায়েরী পড়ছেন। একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করি, ওরা সব গেল কোথায়?

মামুস্কা আর হালীনা এতক্ষণ বসে ছিল, একটু আগে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি।

আমায় আজ এখানে থাকতে দেবে?

না, ভাই, তুইও বাড়ী যা।

আর যে সময় নেই দিদি, সাতটা বাজে প্রায়, সাতটার আগে বাড়ী পৌছতে পারবো না।

খুব পারবি, এক দৌড়ে চলে যা!

দাও না থাকতে।—আবার বলি।

না, বিরক্ত করিস নি।

আমি আমার ঐ পোড়া বাড়ীতে একলা থাকতে পারবো না আজ। চলো না দু-জনে আজ মামুস্কাদের ওখানে গিয়ে থাকি।

হিরণ, লক্ষ্মীটি ভাই আমায় আর জ্বালাস নি। আজকের দিনটা আমায় একেবারে একলা থাকতে দে।

আজ যে তোমায় একলা থাকতে নেই দিদি, আমাদের দেশে বলে।

তা সে যে-দেশে যে যাই বলুক আমি আজ একলা থাকতে চাই। যা দেরী করিস নে।

একলা থাকতে পারবে ?

খুব পারবো। এইতো একটা রাত, কাল সকালেইতো ওঁকে নিয়ে যাবে! শুধু এই একটা রাত ওঁর সঙ্গে থাকতে দে। যা, আমার অনেক কাজ আছে ভাই, রাতে ঘুমোবারও সময় পাবো না। ওঁর সব জিনিষপত্তর গুছিয়ে গাছিয়ে রাখতে হবে, যুদ্ধের হিড়িকে আর অসুখের সময়ে কোথায় কী রেখেছেন তা মনে নেই।

দাওনা থাকতে। আমি তোমায় একটুও বিরক্ত করবো না।

আজ আমার ওঁর স্ত্রীর কর্তব্য পালন করতে দে, কাল থেকে আবার তোদের দিদি হবো। যা, দেরী করিস নে।—দিদির চোখে জল ছাপিয়ে ওঠে।

পরের দিন ভোর থাকতে উঠে দিদির ওখানে গিয়ে দেখলাম সৎকারের সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করে ফেলেছেন। তাঁর স্বামীর পরণে তাঁর সখের কালো স্যুট, গলায় তাঁর সব চেয়ে পছন্দ টাইটি, পকেটে তাঁর সব চেয়ে পছন্দ রুমালটি, কফিনের ভেতরে তাঁর কয়েকখানি প্রিয় বই, পেন্সিল, নোটবই, যেন সত্যিই কোন্ দূর দেশে যাত্রা করছেন।

আমায় দেখে দিদি বললেন—ভাগ্যিস্ এলি, তোকে আমার ভারী দরকার।

বলো না কী করতে হবে।

না কিছু করতে হবে না। শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করবো।

কী ?

আচ্ছা, তোর কি মনে হয়, উনি সত্যিই চলে গেছেন !

তাঁর প্রশ্নের অর্থ বুঝতে পারি না। জিজ্ঞেস করি—চলে গেছেন মানে ?

মানে, আমার মনে হয়, হয়তো উনি এখনো বেঁচে আছেন। এই দেখ্ না।—বলে দিদি টেব্‌ল্‌-ল্যাম্প জ্বেলে তাঁর স্বামীর হাতটা আলোর ওপর তুলে ধরলেন। দেখলাম জীবিতের দেহের মত তাঁর হাতের লাল আভা এখনো কাটে নি। তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ না থাকলেও দিদির মন তাকে এখনো মেনে নিতে পারে নি।

কয়েক ঘণ্টা পরে যখন দিদিদের আত্মীয়স্বজনে মিলে কফন নামিয়ে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে তুললে তখনও দিদি যেন মাত্র সামাজিক কর্তব্যের খাতিরে কোনো আপত্তি করলেন না। আবার হু হু করে তুষার নামলো। কবর-স্থলে যখন পৌছলাম তখন কালো রঙের শব-যান আর কালো পোষাক-পরা শববাহী এবং অনুগামীরা তুষারে একেবারে শাদা হয়ে গেছে। ছোট্ট গির্জায় পাদরী যখন আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করে কবরের দিকে কফন নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন, তখনও দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, যেন এই সৎকারে দিদির সম্পূর্ণ আস্থা নেই।

তারপর কফন নামিয়ে দিয়ে মাটী চাপা দেওয়া হলো, আত্মার উদ্দেশে প্রার্থনা করা হলো, আত্মীয়েরা একে একে বিদায় নিলেন, কেউ কেউ দিদিকে সান্ত্বনা দিয়ে গেলেন, বন্ধুজনে সমবেদনা জ্ঞাপন করলেন, তবুও দিদি যেন বুঝতে পারেন না, কিসের এই অনুষ্ঠান, কিসের এই লৌকিকতা।

তুষারে তুষারে আকাশ যেন ভেঙে পড়ে। সেই অসহ্য শীতে কোনো

প্রকারে হাতড়ে হাতড়ে পথ চিনে দিদিকে নিয়ে যখন তাঁর বাড়ীতে এসে পৌছলাম তখন সন্ধ্যা হয় হয়। জানলার শার্শীর ওপর কে যেন বাইরে থেকে আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে ধাক্কা দিচ্ছে। আধো-অন্ধকার ঘরে দেওয়ালের ওপর কার ছায়া। বারান্দায় শুকিয়ে-যাওয়া ভার্জিনিয়া লতার কঙ্কাল। দিদির স্বামী নিজের হাতে টবে বসিয়েছিলেন। প্রতি বছর গ্রীষ্মে ও হেমন্তে তার সে কী পাতার বাহার! নূতন অতিথি এলে গৃহস্বামী সগর্বে তাঁর পোষ্য-কন্যা ঐ ভার্জিনিয়া-লতার কত খেলা কত খেয়ালের খুঁটিনাটি গল্প শোনাতেন। আগামী বসন্তে সে আবার হলফলিয়ে উঠবে, তখন হয়তো কার স্নেহস্পর্শের অভাব সে মর্মে মর্মে অনুভব করবে। কিন্তু আজ তার সুষুপ্ত চেতনায় সে-খবর পৌছেছে কী?

বারান্দার দোরটা খুলে দিদি ভার্জিনিয়ার শুকনো ডাল-পালাগুলোর দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সেই প্রথম নিজেকে প্রশ্ন করলেন—আমার কী হবে?

কয়েক দিন পরেই ক্রিস্‌মাস্‌। সকাল থেকেই শহরে এক নূতন আবহাওয়া অনুভব করি। ভাঙা, আধ-পোড়া বাড়ীর যেখানে যেখানে মানুষের বাস সেইখানেই সন্ধ্যার উৎসবের জন্যে যথাসম্ভব পারিপাট্য সৃষ্টি করবার তোড়জোড় পড়ে গেছে। জানালার ভাঙা কাচ ধুয়ে সাফ করা হচ্ছে, দেওয়ালহীন ঘরের ভেতরে ঝাড়া-মোছা সাজানো-গোছানো, কারো একদণ্ড বসবার সময় নেই। সম্বৎসরের এই একটি দিনে ওদেশের মানুষের নিজের নিজের বাড়ীর কথা মনে পড়ে; আত্মীয়, পরিজন, প্রিয়জন সবার সঙ্গে মেলবার দিন। আলোয়, ভোজে, সঙ্গীতে, হাসিতে উজ্জ্বল ও মুখর প্রতিটি গৃহে যেন যথার্থ-ই খ্রীষ্ট প্রতিবৎসর জন্মগ্রহণ করতেন। যুদ্ধের পর এই প্রথম ক্রিস্‌মাস্‌। ভাঙা বাড়ী আর সার্বজনীন আত্মীয়-বিয়োগের মাঝে প্রতি বৎসরের এই উৎসবকে পালন করবার মত মনের জোর যে এদের এখনো আছে সেইটুকুই আশ্চর্য। সাম্প্রতিক বিয়োগের কৃষ্ণবাস বা কৃষ্ণ-চিহ্ন ধারণ করে নি এমন স্ত্রী বা পুরুষ খুব অল্পই চোখে পড়ে। অথচ অবাক হয়ে দেখি এরা সন্ধ্যার উৎসবের জন্যে যথাসম্ভব খাদ্য ও উপহার কেনবার জন্যে দলে দলে পথে বেরিয়েছে। বিজেতার দেশ-জোড়া উৎপীড়নের এ এক অভিনব মূক প্রতিবাদ। ওরা এদের নৈতিক বলকে ক্ষুণ্ণ করতে

চেয়েছে, আত্মাকে ক্ষিপ্ত করতে চেয়েছে। তাই এরা সম্বৎসরের উৎসবকে অক্ষুণ্ণ রেখে প্রমাণ করতে চায় তারা এখনো মরে নি।

পথে মানুষ ধরে না; কারো মুখে হাসি নেই, অথচ দৃষ্টিতে বিষাদও নেই, মনের গভীরে কী এক সঙ্কল্পকে জাগরুক রেখে এরা যে-যার আয়োজনে ব্যস্ত। সন্ধ্যার আগেই উৎসব শেষ করতে হবে। সাতটার পর পথে বেরুনো মানা। কেউ পেয়েছে একটা বাঁধা-কোপি, কেউ গোটাকয়েক আলু, কেউ বা গাজর, কেউ বা বহু কষ্টে জোগাড় করেছে গোটা তুই ডিম। প্রিয়জনকে উপহার দেবার জন্যে কেউ কিনেছে পুরোনো একখানা বই, কেউ পুরোনো একজোড়া জুতো, কেউ বা গৃহস্থালীর এটা ওটা সেটা, কেউ সের পাঁচেক কয়লা, কেউ বা একটুকরো মাংস। প্রচণ্ড তুর্ভিক্ষের মাঝে কেউ কেউ বাচ্চাদের জন্যে খেলনা কিনতেও ভোলে নি।

অবৈধ ব্যবসায় যারা তু-পয়সা করেছে তাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তবে অজস্র অর্থের বিনিময়েও শহরে আন্‌কোরা নতুন জিনিষ পাবার উপায় নেই। তাই তারা কিনছে দামী রূপোর সেট্‌, গালচে, ছবি, ওভারকোট, গরম মোজা, ছেলেদের জন্যে বরফে হাঁটবার স্কেট্‌স্‌, ইলেক্‌ট্রিক্‌ উনুন, ক্যামেরা, ঘর সাজাবার নানান্‌ রকম কিউরিয়ো, ফারের টুপী, রোমের দস্তানা। পুরোনো, ব্যবহার-করা হলেও এখনো কাজ চলে, সম্ভ্রান্তের ঘরে বহুদিন সযত্নে রক্ষিত ছিল, আজ সেগুলো কয়েকটুকরো রুটি বা তু-মুঠো কয়লার সংস্থান করবার জন্যে পুরোনো দোকানে এসে জমা হয়েছে। মোড়ে মোড়ে পুরোনো জিনিষের দোকান, নম্বর-লেখা একটুকরো কাগজের রসিদ নিয়ে যারা কয়েক সপ্তাহ আগে বিক্রয়ের জন্যে দোকানে রেখে গিয়েছিল তারাও আজ এই উৎসবের দিনে নিতান্ত প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তার পীড়নে

দোকানে দোকানে খবর নিতে এসেছে তাদের জিনিষের ক্রেতা জুটেছে কিনা। স্পষ্ট-"মা"-বলতে-পারে অত সাধের ঐ ডলি পুতুলটা খুকীর চোখের সামনে কারা নিয়ে চলে গেল, সোণার আংটিটা মা স্বচ্ছন্দে আর কাকে দিয়ে দিলে, ছোট্ট ছেলেটির ট্রাইসিকেলটা আর কাদের ছেলে চেপে বসে পা চালিয়ে চলে গেল, বরফের ওপর শী (ski) করবার ঐ সুন্দর পশমের পোষাকটা আর কাদের ছেলে পবে দেখছে, আর ঐ লাইন, স্টেশন ও সিগনাল-শুদ্ধ রেলের সেটটা যেটা নিয়ে ছেলেটি সারাদিন দেশ-বিদেশের কত কল্পনা কত স্বপ্ন রচনা করতো সেটাও যে ওরা নিয়ে গেল! না, না. তাবা একটুও কাঁদবে না, মা বলেছে, বাবা যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে সব ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। কিন্তু বাবাটাও এমন, এখনো ফেরবার নাম নেই।...

সকালেই মামুস্যা এসে বলে গেছেন, আজ ওঁর ওখানে যাই যেন, বর্চ্ছরকার দিন, একলা একলা ঐ নির্বান্ধবপুরীতে থাকলে তিনি আর আমার মুখ দর্শন করবেন না। তাই সন্ধ্যার কিছু আগেই তাড়াতাড়ি তাঁর ওখানে যাবার জন্যে পথে বেরই। তাঁর বাড়ী দূর নয়, কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় ঐটুকু পথ অতিক্রম করা যেন একটা কঠিন সমস্যা হয়ে উঠলো। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে সৈনিকের ছেঁড়া উর্দি-পরা একটি লোক শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে পথের মানুষকে আবেদন জানায়—দুটি খেতে দিন, পানিয়ে, খ্রীস্টের দোহাই। এই পা-দুটো ঢাকবার জন্যে এক জোড়া ছেঁড়া-খোঁড়া যা হয় জুতো দিন, পানিয়ে।...বৈধব্যের কালো পোষাক-পরা একটি মেয়ের চোখের জল তার গালের ওপর জমে বরফ হয়ে গেছে, কে যেন তার মুখের দু-পাশে আঙুল দিয়ে শাদা চকচকে রঙ মাখিয়ে সঙ সাজিয়ে দিয়েছে।...একটি ছোট ছেলে দুটো ডিম হাতে করে তার মায়ের সঙ্গে পথ চলেছে, বাড়ী গিয়ে সেদ্ধ করে কাকে কাকে

দেবে তার লম্বা ফর্দ শুনতে পাই, আমোদ-প্রিয় একটি হিটলারী দুলাল তার হাতটা ধরে ওপর দিকে ঝাঁকুনি দিয়ে ডিম দুটো ফেলে দিয়ে গেল।···এক দল লোকের হাতে দড়ি বেঁধে দুটো জার্মান সান্ত্রী শিষ দিয়ে কুচকাওয়াজী সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সেইমের * দিকে নিয়ে চলেছে।···

মামুস্তার ওখানে গিয়ে দেখলাম উৎসবের কোনো অনুষ্ঠানই বাদ যায় নি। ওঁদের সংসারে মাত্র কয়েক দিন আগেই যে বিপদ ঘটেছে তার যেন কোনো চিহ্নই নেই। সমগ্র দেশে সাম্বৎসরিক উৎসবের মধ্যে দিয়ে জাতির নৈতিক বলকে বাঁচিয়ে রাখার এই যে সঙ্কল্প তা সেদিন ওদের সমাজের ভেতর থেকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেলাম। এ সঙ্কল্পের পেছনে কোনোরূপ প্রকট আন্দোলন চোখে পড়ে না, অথচ প্রতিটি ব্যক্তির সমতাল সঙ্কল্প আপনা হতেই জাতীয় সঙ্কল্পের আকার ধারণ করেছে। ওঁদের আত্মীয়-স্বজন, অতিথি আগেই এসে হাজির হয়েছেন। টেবিলের ওপর খাদ্যের সম্ভার, হাঙ্গেরীয় সুরা, অজস্র ফুল। আকাশে প্রথম তারা ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই খ্রীস্ত-নাম গীতে সবাই যোগ দেয়, ঠিক গত বৎসরের মত। সবাই পরস্পরকে অভিনন্দন জানায়, সঙ্গীতে হাসিতে মামুস্তার ঘর মুখর হয়ে ওঠে। উৎসবের ঘোরে দিদির কথা বারে বারে মনে পড়ে। মামুস্তাকে জিজ্ঞেস করি—দিদিকে দেখছিনা কেন? দিদি কোথায়?—চোখের ইশারায় আড়ালে নিয়ে গিয়ে মামুস্তা চুপি চুপি বলেন—সারাদিন এইখানেই ছিল। সেই তো নিজের হাতে রেঁধে বেড়ে সব করে দিয়ে গেছে। ও-সব খাবার-দাবারও তারই, এই দিনটির জন্যে বেচারী এতদিন জমিয়ে রেখেছিল।

* পোলীয় পার্লামেন্ট্। জার্মান অধিকারে সেইমের মাঠে বন্দীদের গুলি করা হয়।

তাই বলে নিজেকে থাকতে নেই বুঝি ?

একটু ইতস্ততঃ করে মামুস্তা বলেন—থাকবে বলেই তো ঠিক করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলে না।···আজ যে ওর স্বামীর ইমিয়েনীন্ট্যী *, হাজার হোক মানুষের মন তো, তাই সে ছুটে সেখানে গেলো। তুই বাপু ও নিয়ে আর মন খারাপ করিস নে। চল্‌, এইবার তোকে একটা তোদের দেশের গান গাইতে হবে।

* নামোৎসব। ইউরোপের কাতলিক-প্রধান দেশে জন্মদিনের পরিবর্তে ব্যক্তির নাম অনুযায়ী বৎসরের এক একটি বিশেষ দিনে জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দিদির স্বামীর নাম আদাম, নামোৎসবের দিন ২৪শে দিসেম্বর। লেখকের "হাতের কাজ" গল্প-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১৯৪০ সালের জানুয়ারীতে নববর্ষের অভিনন্দন এলো খুদ জার্মান সরকারের কাছ থেকে। সংবাদপত্রের এক বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেল, ভারশৌ-অধিবাসী যাবতীয় বিদেশীদের সরকার সকাশে উপস্থিত হয়ে আপন আপন নাম, ধাম, ও কাম সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব জ্ঞাপন করতে হবে। অন্যথা মৃত্যুদণ্ড।

দেখতে দেখতে তিন মাস হয়ে গেছে। এতদিন গা ঢাকা দিয়ে রয়েছি আর বোধ হয় চললো না। পশ্চিমে নাকি ইংরেজ আর ফরাসীরা জার্মানদের ঠেঙিয়ে হাড় গুঁড়ো করে দিচ্ছে, আজ অমুক জায়গায়, কাল তমুক জায়গায় মাঠের ওপর ইংরেজী উড়োজাহাজ এসে নাকি মুঠো মুঠো হ্যাণ্ড্‌বিলের খই ছড়িয়ে গেছে, ওরা এলো বলে, পোলরা যেন তৈরী থাকে, তাদের মুক্তির দিন সন্নিকট। এই ধরণের ইচ্ছা-পূর্তির গুজব পথে-ঘাটে সর্বত্র। আকাশে উড়োজাহাজ দেখলেই পথের মানুষ ঊর্দ্ধে তাকিয়ে কোন্ সুদূর শূন্যে উড্ডীয়মান কল্পিত কাগজের টুকরোর প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে। উড়োজাহাজের গতি লক্ষ্য করে শহরের বাইরে মাঠে বাটে কাগজের টুকরো খোঁজে। আকাশের ওপর বিমানের গতি দিয়ে কোনো অক্ষর লেখা হচ্ছে কিনা এক দৃষ্টে তাকিয়ে দেখে, তারপর কল্পনার সাহায্যে তার ঋজু, বঙ্কিম ও বর্তুল গতির খণ্ড খণ্ড সাজিয়ে এক নিগূঢ়

সঙ্কেতের তথ্য আবিষ্কার করে। শুনি কখনো তা "মুক্তি," কখনো "সাহস," কখনো "সহিষ্ণুতা।" এক কথায় ইংরেজ আর ফরাসীরা জার্মানদের হারিয়ে তাদের দেশ দখল করে পোলদের বীরত্ব ও দুর্ভোগের পারিতোষিক স্বরূপ তাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে এবং তার ওপর ফাউ স্বরূপ জার্মানীর এক থাবলা উপহার দেবার জন্যে একেবারে দোর গোড়ায় এসে পড়েছে আর কি!

এই সার্বজনীন গুজবে দিল্‌ খুশ্‌ হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু জার্মানরা যে-ভাবে বুক ফুলিয়ে হাঁটে, তাদের অত্যাচারের মাত্রা যেভাবে বেড়ে চলে, এবং ততোধিক ক্ষিপ্র গতিতে যেভাবে তাদের শাসন-যন্ত্র শিকড় গাড়ে তাতে তাদের পোলদেশ থেকে পাত্তাড়ি গোটাবার কোনো লক্ষণই চোখে পড়ে না। তবুও শহরে হয়তো একদিন মিত্র পক্ষীয় সৈন্যদল আকস্মিকরূপে প্রবেশ লাভ করবে এই আশার অতীত আশায় আরো কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু তারপর আর চললো না; বাড়ীর দরোয়ান একদিন মিনতি জানালো, আমায় জার্মানদের কাছারীতে হাজরে দিতে হবে। কাল হাজরে দেবার শেষ দিন। এর পর যদি ধরা পড়ি তো আমার মৃত্যুদণ্ড সুনিশ্চিত বটেই, উপরন্তু আমাকে লুকিয়ে রাখার জন্যে তারও বিপদ সমূহ। সুতরাং সেইদিনই ব্রিতানী পাস্‌পর্ত্‌-খানি ঝেড়ে মুছে পকেটে পুরে জার্মানদের কাছারী অভিমুখে যাত্রা করতেই হলো।

রুটীর দোকান বা রেলের স্টেশনের সামনে যে-রকম ভিড়, জার্মানদের ঐ কাছারীর সামনেও ভিড় তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তিন সপ্তাহ ধরে বিদেশীদের তত্ত্ব নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এখনো যত লোক বাকী তাতে মনে হয় আরো তিন সপ্তাহের আগে শহরের বিদেশীদের নাম ধাম টোকা শেষ হবে না। সুতরাং হাতের কাছেই বিলম্বের একটা অজুহাত

পাওয়া গেল। শত শত মানুষ কঠিন শীতে ঠায় দাঁড়িয়ে সরকারের দর্শন লাভের প্রতীক্ষা করছে। অপেক্ষমানদের মধ্যে ব্রাজিলীয়, আর্জেন্তিনীয়, আর ফরাসী, নরওয়েজীয়, ওলন্দাজ, কাফ্‌শাসী, নান্‌সেনের আন্তর্জাতিক পাস্‌পর্ত্‌-ওয়ালাদেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এবং এদের মধ্যে এমন একদল লোকের মোলাকাৎ মিললো যারা আমার মতই ব্রিতানী পাস্‌পর্তের অধিকারী। মর্ণিং পোস্টের ভারশৌএর সংবাদ-দাতা মিঃ সাইক্‌স্‌ নাকি দেশে ফিরে বড়াই করে লিখেছিলেন, তিনি যুদ্ধের সময়ে শেষ ব্রিতানী প্রজাকে রোমানিয়ার সীমান্ত পার করে দিয়ে তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়েছিলেন। তা যে কত ভুয়ো তা সেই দিনই ধরা গেল। আমার কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, কারণ ভারতীয় হিসেবে (আমার পাস্‌পর্ত্‌ খাস্‌ বিলাতী হলেও) আমার প্রজাসত্বের ন্যায্য অধিকারের কথা সবক্ষেত্রে ওঠে না যদিচ প্রতি পদে আমাদের উক্ত প্রজাসত্বের কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যুদ্ধের তৃতীয় দিনেই যারা দল বেঁধে শহর ছেড়ে পালিয়েছিল তাঁরা স্ব-জাতিদের কথাও মনে করে নি। যাই হোক্‌, এখন কী উপায়ে ভালোয় ভালোয় জার্মানদের নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় সেই সমস্যাই প্রধান হয়ে উঠলো।

বুলী-স্বভাব জার্মানদের রীতি-নীতি আমার আগেই জানা ছিল বলেই আত্মরক্ষার প্রথম উপায় স্থির করলাম সম্পূর্ণ নির্ভীকতা, অর্থাৎ ওদের চোখে যদি ধরা পড়ে আমি ভয় পেয়ে গেছি, তাহলে রক্ষা নেই। সুতরাং কাছারী ঘরে ঢোকবার আগেই অমি মা ভৈঃ বলে মনে মনে একবার অসমসাহসিকতার পাঁয়তাড়া কষে নিলাম। জানি ঘণ্টা খানেক ধরে আমায় নাগাড়ে এক্ট করতে হবে, এবং এমন ভাবে ওদের প্রশ্নের উত্তর সাজাতে হবে যাতে ওদের ধারণা বদ্ধমূল হয় যে আমি একটি নিতান্ত গোবেচারী মাষ্টারাধম।

দু-একটা প্রশ্নোত্তর যা মনে আছে তা এই :

প্রশ্ন। (জলদ গম্ভীর স্বরে) এতদিন লুকিয়ে ছিলেন কেন ?

উত্তর। (সংযত স্বাভাবিক স্বরে) আজ্ঞে, লুকিয়ে থাকবো কেন ? আজ তিন হপ্তা ধরে কাছারীতে ঢোকবার চেষ্টা করছি, তার ধারে কাছেও এগুতে পারিনি। কাল শেষ দিন বলে আজ বহু ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করে তবে ঢুকেছি। এই দেখুন না, জামাটা একেবারে ছিঁড়ে গেছে।

প্রশ্ন। (রহস্য-ভরা দৃষ্টিতে) ঢোকবার আগে বোধ হয় একবারও ভাবেন নি, ধরা পড়লে আপনার অবস্থা কী হতে পারে ?

উত্তর। (সহজ ভাবে) ধরা দিতেই যখন এসেছি তখন সে ভয় করলে চলবে কেন ? তা ছাড়া আমি মশায় এখানে মাষ্টারী করে খেতাম, যুদ্ধে আটকে পড়েছি এইতো আমার অপরাধ, যদি বলেন তো আমি কালই এখান থেকে চলে যেতে রাজী আছি।

প্রশ্ন। (ক্রুর স্মিতহাস্যে) হেঁ হেঁ অত সহজে ছাড়া পাবেন বলে তো বোধ হয় না। পৃথিবীতে আজ যুদ্ধ চলেছে সে কথা আপনার খেয়াল আছে আশা করি।

উত্তর। (অন্যমনস্কভাবে) কী বলেন ? যুদ্ধ ? আজ্ঞে হ্যাঁ, যুদ্ধ আমার ঢের দেখা হয়েছে, আর যুদ্ধ দেখে কাজ নেই। এখন ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরলে বাঁচি। তাছাড়া ওসব মারামারি হাতাহাতি আমার ধাতে নেই।

প্রশ্ন। (সবিস্ময়ে) গত যুদ্ধে আপনাদের দেশের লোক আমাদের কম ক্ষতি করে নি। এ-যুদ্ধেও ইংরেজরা আমাদের ওপর হিন্দুস্থানী লেলিয়ে দেবে তো ?

উত্তর। আমি মশায় পরম অহিংস, ওসব লেলানো-ফেলানোর ধার ধারি না।

প্রশ্ন। (উৎফুল্লভাবে) আপনি তাহলে গান্ধীর চেলা ?

উত্তর। (সহজভাবে) আমি মশায় কারো চেলা-চামুণ্ডা নই। তবে গান্ধীজীর সঙ্গে আমার মতের মিল এইখানে যে তিনিও মারাধোর পছন্দ করেন না, আমিও না। তাছাড়া আমি ভদ্রলোক, বামুনের ছেলে, খামখা মারামারি করতে যাবো কেন ?

প্রশ্ন। আপনি ব্রাহ্মণ ?

উত্তর। (বিনীতভাবে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার যতদূর মনে হয় সেদিন যদি আমার কোট-পেন্টুলেন ছাড়িয়ে নিয়ে একখানি পাঁচী পরিয়ে দিয়ে কাঁধে একখানা নামাবলী দিয়ে দেওয়া হতো তাহলে নিশ্চয়ই আমার চোখ ও মুখের শান্ত দান্ত ভাব দেখে মনে হতো, একজন নিষ্ঠাকাষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পরম সহিষ্ণুতার সহিত শ্রাদ্ধ বাড়ীতে দান-সামগ্রীর প্রতীক্ষা করছেন।

প্রশ্নোত্তর শেষ হলে উক্ত সরকারের কর্মচারী মোটা খাতায় কয়েক পাতায় কী লিখে নিয়ে আমার পাস্‌পর্তের ওপর একটা ছাপ বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আপনার ঠিকানা কী ?

সেই প্রথম দিদির বন্ধুর ছোট্ট ঘরখানার ঠিকানা দিলাম। কারণ সেইখানেই আমার জীবন-ধারণের একমাত্র সংস্থান দেড়মণ আলু আর বারোসের পেঁয়াজের অবশিষ্ট সঞ্চিত রয়েছে। এবং এক্ষেত্রে আমার অনুমান মিথ্যা হলো না। বজ্র-কঠিন স্বরে হুকুম এলো—আজ থেকে আপনাকে সেই ঠিকানায় যেন সর্বদা খুঁজে পাওয়া যায়। তাছাড়া সপ্তাহে তিনদিন থানায় হাজরে দিয়ে আসতে হবে। এবং ঐ

ঠিকানা ছেড়ে বেশী ঘোরা-ফেরা না করাই আপনার পক্ষে মঙ্গল। আদেশ লঙ্ঘন করলে আপনাকে ততক্ষণাৎ বন্দী করে কনসেণ্ট্রেশন্‌ ক্যাম্পে পাঠানো হবে। হাইল্‌ হিট্‌লার্‌!

হাতে বা গলায় দড়ি পড়লো না বটে কিন্তু সেইদিন থেকে আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিলুপ্ত হলো।

জার্মানদের কাছারী থেকে পুলিশ সমভিব্যাহারে দিদির বন্ধুর পাঁচ তলার ওপর pied-à-terre বা জমিতে পা রাখবার মত ছোট্ট ঘরখানার দরজা খুলেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম—এই ঠিকানা দিয়ে ভালো করেছি কী?—হাত চারেক চওড়া আর হাত ছয়েক লম্বা ঘরখানায় কড়িকাঠ পর্যন্ত আমারই আসবাব সাজানো। মাঝখানে বড় লেখবার টেবিলটাকে কেন্দ্র করে মেঝের চারিপাশে প্রথমে হাজার দেড়েক বই থাক দিয়ে সাজানো, তার ওপর সারি সারি খুচরো জিনিষ, ডেক্‌চি, সস্‌প্যান্‌, বাক্স-পেঁটরা, জুতো, ছবি, কিউরিয়ো, ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং টেবিলটার ওপর সার্কাসী কায়দায় চেয়ারগুলো একটার ঘাড়ে আর একটা খাড়া হয়ে রয়েছে। তাছাড়া দেওয়ালের একধারে শোবার দিভানটা এমনভাবে দাঁড় করানো যে তার তল্লাটে যেতে হলে সমস্ত ঘরের জিনিষগুলো বাইরে নিয়ে আসতে হবে। এবং তার ভেতরটা সিন্দুক হিসাবে ব্যবহার করা যায় বলে দিদি নাকি সেটুকু জায়গাও আমার খুচরো সম্পত্তিতে ভরে দিয়েছেন।

ঘরের চেহারা দেখে পুলিসের কর্মচারী দু-জন আপন আপন মুখ স্মিতহাস্যে উদ্‌ভাসিত করে বললে—আপনারা যোগী পুরুষ, শুধু কী করে ঐ দিভানখানা পেতে শোবার ব্যবস্থা করেন তা একদিন দেখে যাবো কী বলেন?

ওরা অবার দর্শনদানের আশ্বাস দিয়ে বিদায় নেবার পর আমারও

মনে ঐ সমস্যা উপস্থিত হলো। এবং কয়েক ঘণ্টা ধরে নানা কসরৎ করে দিভানের ত্রিসীমানায়ও পৌঁছতে না পেরে হাল ছেড়ে দিতে হলো। অবশেষে হঠাৎ মাথার মধ্যে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। টেবিলের ওপর থেকে চেয়ারগুলো নামিয়ে নিলেই তো তার ওপর দিব্যি লম্বা হয়ে শুয়ে পড়া যাবে! এবং কার্যতঃ তাই করতে হলো। ঘরের বাইরে কারিডরে আলু ও পেঁয়াজের সিন্দুকটার ওপরে আবার সার্কাসী কায়দায় চেয়ারগুলোকে একটার ঘাড়ে আর একটা চাপিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম, দরজা থেকে সটান টেবিলে লাফিয়ে উঠে তার ওপর দিব্যি চেয়ার পেতে বসা যায় যদিও মাথায় ছাদ ঠেকে, এবং সেই চেয়ারখানা ঘরের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টেবিলটার ওপরে সটান হয়ে শোওয়া যায়। অবশ্য ঘুমের ঘোরে অতি সন্তর্পণে পাশ ফিরতে হবে, কারণ সামান্য অসাবধানতায় দুপাশের থাক-দেওয়া সম্পত্তি-সম্ভারের পদস্খলন হয়ে আপন অধিকারীকে চাপা দেওয়ার সম্ভাবনা প্রতি পার্শ্ব-পরিবর্তনে।

বাড়ীখানার চেহারা আগে ভালো করে দেখিনি। এইবার তার পরিবেশের সঙ্গে অল্পে অল্পে পরিচয় ঘটলো। করিডরের দেওয়ালের খানিকটা ভেঙে জানলার মত গর্ত হয়ে গেছে। সেই গর্তের ভেতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম ওদিকে ধূ ধূ করছে শূন্য। পাশের বাড়ীগুলো সারি সারি বোমায় ভেঙে গিয়ে ইটের পাঁজায় পরিণত হয়েছে। এ-বাড়ীখানারও আমাদের দিকটা ছাড়া অনেক অংশ ভেঙে পড়েছে। ইটের গাদার তলায় যে অনেক মানুষের কবরলাভ হয়েছে, তা অতি নিকটে যুদ্ধোত্তর জৈব পূতি-গন্ধের উপস্থিতিতেই বোঝা যায়। শুধু আমাদের দিকটায় কয়েকটি পরিবার আবার নতুন করে সংসার পেতে বসেছে। আমার পাশের ঘরটায়, যেখান থেকে প্রায়ই টাটকা বাঁধা-কোপি সেদ্ধ করার গন্ধ পাওয়া যায়, যতদূর অনুমান করি, একটি পথচারিণী এসে

আশ্রয় নিয়েছে। তার পরের ঘরটায় একজন ব্যবসাদার, যে অবৈধ উপায়ে শহরে খাবার আমদানী করে দু-পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে, এবং শেষের ঘরখানায় কে থাকে তা একটি সম্পূর্ণ রহস্য। সেখান থেকে মাঝে মঝে আলো জানলা দিয়ে সামনের ভগ্নস্তূপে পড়ে দেখেছি, কখনো কখনো সেই আলোয় ছায়াও চোখে পড়েছে। প্রতিবেশীরা বলে, লোকটা নাকি জার্মান সৈনিক।

সহবাসেই হোক বা তার আপন প্রচ্ছন্ন গুণাবলীর প্রসাদেই হোক, ঘরখানিকে আস্তে আস্তে ভালোবেসে ফেললাম। তার প্রধান গুণ যা আমাকে আকৃষ্ট করলে তা তার কৌতুক-প্রিয়তা। প্রথম কয়েকদিন এই অল্প পবিসরের মধ্যে হাজার রকমের প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় জিনিষের প্রাচুর্যে কেমন যেন হাঁপ ধরতো। টেবিলের ওপর শুয়ে যখন দেখতাম মাত্র হাত তিনেক ওপরে ছাদ, আর আমার চারিপাশের সমস্ত জায়গাটুকু আসবাবে ভরা, তখন মনে হতো কে যেন জোর করে আমায় জীবন্ত অবস্থায় একটা কফনে পুরে রেখেছে। আপন মনের সঙ্গে সারারাত যুক্তি-তর্কে শেষে রাতের দিকে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানে থাকতে হলে মস্তিকের বিকৃতি ঘটা বা কঠিন স্নায়বিক পীড়ায় আক্রান্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, অথচ আর অন্যত্র যাওয়া চলে না। বাজিয়ে বন্ধুর বোহেমীয় ফ্ল্যাটে ফিরে গেলে তাঁর বিপদ। এবং একবার এই ঠিকানা দেওয়াতে জার্মানদের কাছারীতে আর ঠিকানা বদল করা চলে না। যে পুলিস অফিসাররা তত্বাবধান করে রায় তাদের কাছে কথাটা পাড়াতে তারা মুচকে হেসে বলে—আপনার ভাগ্যে যে জেলখানার সেল্‌ জোটে নি এই ঢের। ঠিকানা বদলাতে চান তো বার্লিনে দরখাস্ত করুন, মূসেন্‌ জী নাথ্‌ বের্লীন্‌ শ্রাইবেন্‌।—ওদের সব কথায় ঐ এক বুলী, মুসেন্‌ জী নাথ্‌ বের্লীন্‌ শ্রাইবেন্‌।—অর্থাৎ যদি

গোদের ওপর বিষ-ফোটকের প্রয়োজন থাকে তো লেখ বার্লিনে।

একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ খেয়াল হলো করিডরের ভাঙা দেওয়ালের গর্তটা দিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়তে হবে। মনের মধ্যে যেন দুটো মন মল্লযুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছে, একটা বলছে—চলো, চলো, আর দেরী করলে চলবে না। দরজাটা খুলে সামনেই ঐ গর্তটা দিয়ে এক্ষুণি লাফিয়ে পড়ো। মুক্তি চাইছো, ঐ তো মুক্তি, চলো, ওঠো।—সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মন বাধা দেয়, বলে—তুমি ক্ষেপে গেছো নাকি? চুপ্‌ করে শোও। গর্ত দিয়ে লাফিয়ে পড়লেই মুক্তি পাওয়া যাবে নাকি? সত্যিকার মুক্তি ঐ দেখ। —কাচ-ভাঙা জানলাব ভেতর দিয়ে কে যেন দেখিয়ে দেয় চোখের সামনে শেষ রাত্রের তরল জ্যোৎস্নায় স্নাত তুষার-ঢাকা প্রকাণ্ড একটা গাছ। একটি পাতা নেই, অথচ শুকনো ডালের ওপর একটি চড়াই পাখীর বাসা। প্রকৃতির অর্থহীন নিষ্ঠুর প্রকোপের মাঝে পাখীদের এই নিরাপত্তার নীড়, সার্বজৈব উচ্ছেদের মাঝে প্রাণের ঐ ছোট্ট আশ্রয়টুকু সেদিন নূতন করে চোখে পড়লো। জীবের মুক্তি বেঁচে থাকায়, সমস্ত বাধা, বিপত্তি, সঙ্কটের ভেতর দিয়ে নিজেকে ধ্বংস হতে না দেওয়াতেই জীবনের জয়।

সেইদিন প্রথম আবিষ্কার করলাম, ঘরখানার একটি প্রচ্ছন্ন কৌতুক-বোধ আছে। সে যেন এই এলো-মেলো হেলা-গোছা জিনিষে নিজেকে সঙ সাজিয়ে আমায় হাসবার চেষ্টা করছে। এবং সত্যিই সেদিন নিজের প্রাক্‌-সামরিক যুগের, জীবন-ধারণের পক্ষে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় এই সম্পত্তি-সম্ভারের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললাম। চাকী-বেলুনের ওপর ভেনুস্‌ দ্য মিলোর প্রতিমূর্তি, বইয়ের গাদার ওপর জুতো-ভরা থলে, এক সময়ে অতি প্রিয় ফান্‌ হহ্‌, সেজ়ান্‌ ও গোগ্যাঁর ছবিগুলোর ওপর বাল্‌টি-ভরা জ্বালানি কাঠ, বোহেমীয়তার চূড়ান্ত। জীবন যেন নিজের

হাতে একটি সম্পূর্ণ ব্যঙ্গচিত্র রচনা করেছে। তারই পটভূমিতে বাস করা পরম সৌভাগ্য বলে মনে হলো।

পাঁচ তলার ওপর এই pied-à-terre-খানিতেই আস্তে আস্তে গুছিয়ে গাছিয়ে সংসার পেতে ফেললাম। টেবিলের চারিপাশের সম্পত্তিগুলিকে অল্পে অল্পে সরিয়ে আর একটু হাত পা ছড়াবার জায়গা করে নিলাম। মেঝের ওপর থাক-দেওয়া বইয়ের গাদা থেকেও আস্তে আস্তে দু-একখানা বই বের করে নিয়ে দিন ও রাত্রির নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তগুলি ভরে রাখবার ব্যবস্থা করে নিলাম। থাকতে থাকতে কোন্ কোণে কিসের নীচে কোন্ জিনিষটা পাওয়া যায় তারও মোটা-মুটি ধারণা হয়ে গেল।

গৃহরক্ষায় সব চেয়ে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করলাম রন্ধনের ব্যবস্থায়। ঘরের কোণে স্টোভটার কাছ থেকে জিনিষগুলো সরিয়ে স্টোভের দরজাটা অনেক কষ্টে খোলা গেল। এবং তার তলায় মেঝের ওপরও হাতখানেক খালি জায়গা পাওয়া গেল। তারপর অনেক পুরানো লোহা-লক্কড়ের দোকান খুঁজে একটি অমূল্য রতনের সন্ধান পেলাম। একটি ও-দেশী লোহার চুলা। জিপ্সীদের গাড়ীতে যে-ধরণের চুলা দেখা যায় এ সেই জাতীয় জিনিষ। আগুন দিয়ে বন্ধ করে দিলে ঘরে উত্তাপের সঞ্চার হয়, এবং তার ওপর প্যান্ চাপিয়ে দিব্যি রাঁধা চলে। শুধু অসুবিধা এই যে তার পেছন দিকে ধোঁয়ার নল। এবং আগুন ধরাবার সময়ে তার ভেতর থেকে যেন এক শয়তান নল দিয়ে কুলকুচো করে ধোঁয়া ছাড়ে। দু-এক দিন ঘরের ভেতর দক্ষযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে ধূম-সমস্যারও সমাধান করে ফেললাম। চুলার নলটাকে ঘরের স্টোভের ভেতর পুরে দিলাম। নলের ধোঁয়া চিমনী দিয়ে ওপরে উঠে গেল! দেখতে দেখতে ঘরটি গরম হয়ে ওঠে, আর চুলার ওপর সস্‌প্যানে ফুটতে থাকে সুপ্ হেলে দুলে, মৃদু গুঞ্জন করে, তার দিকে চেয়ে

টেবিলের ওপর চেয়ার পেতে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বসে দিবাস্বপ্ন রচনা করো। জীবন যদি সত্যিই মন্দাক্রান্তা ছন্দে প্রবাহিত হয় তো এই সে জীবন। ও-দেশে ঐ চুলার নাম কজ্‌। বা ছাগলী। আমার ঐ ছাগলটী আমার অর্দ্ধ-বন্দী জীবনের যথাথ অনুগতা সখী, সঙ্গিনী ও বয়স্যা হয়ে উঠলো।

ভোর থাকতে উঠে প্রথমেই এই প্রিয় ছাগীর আহারের সংস্থান করতে হয়। অর্থাৎ কাঠ কেটে আগুন ধরিয়ে আস্তে আস্তে কয়লা দিয়ে সঙ্গিনীটিকে চাঙ্গা করে তুলি। তারপর কয়লা বাঁচাবার জন্যে হাতের কাছে যা পাই তাই তার মুখে তুলে দি, এবং প্রবাদ-বচনের যাথার্থ্য রক্ষা করে সেও যা পায় তাই পরম তৃপ্তিতে রোমন্থন করে। ইত্যবসরে আপন খাদ্যেরও ব্যবস্থা করে নিতে হয়।

ঘরে খাবারের অভাব নেই। সিন্দুক ভরা আলু আর পেঁয়াজ। তাছাড়া যুদ্ধের সময়ে জীবন বিপন্ন করে দিদি যে কয়েক ঠোঙা ময়দা, কিছু চাল, কাশা আর চিনি বাঁচিয়েছিলেন সেগুলোও সব খরচ হয় নি। সুতরাং সারাদিন কাটাই রন্ধনের ধান্দায়। কখনো ভাত নামে, কখনো কাশা সেদ্ধ, কখনো আলু সেদ্ধ, কখনো ফুটন্ত জলে তাল তাল ময়দা সেদ্ধ, তারই ওপর একটু কাঁচা তেল এবং নুন ছড়িয়ে দিয়ে কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে পরম আনন্দে দিনে তিনবার ভোজ সমাপ্ত করি।

ওদিকে ঠোঙাগুলিও আস্তে আস্তে খালি হয়ে আসে। তখন চলে একবেলা ফেন আর একবেলা ভাত, একবেলা ময়দা সেদ্ধ জলের স্যুপ আর একবেলা ময়দা সেদ্ধ। তারপর মাসখানেক যেতে না যেতেই তাও বন্ধ হয়ে গেল। সিন্দুক-ভরা আলু আর পেঁয়াজের কথা ভেবে অদৃষ্টের প্রতি কটাক্ষ করে মনে মনে হাসি। কিন্তু অদৃষ্ট সে অদৃষ্টই। আমার

অগোচরে সে যে আলুর সিন্ধুকে হাত পুরেছে সে খবর যখন পেলাম তখন আর আলুগুলোকে বাঁচাবার উপায় নেই।

একদিন সিন্দুক খুলে আলু আনতে গিয়ে মনে হলো কে যেন তামাশা করে আলুগুলো সরিয়ে নিয়ে গিয়ে এক সিন্দুক পাথরের নুড়ী ভরে রেখে গেছে। আলুগুলো জমে বরফ হয়ে গেছে। হাতে করে ছাড়াবার উপায় নেই। গোটা দুই ছাড়াবার পরেই হাত জ্বালা করে। সুতরাং খোশা-শুদ্ধ আলুই সেদ্ধ হয়ে যে অপরূপ খাদ্য প্রস্তুত হয় তাকে আলু বলে চেনা যায় না। পেঁয়াজের অবস্থাও অনুরূপ। প্রতি দিনই তৈরী হয় জমে-যাওয়া আলু আর পেঁয়াজের স্তূপ। অবশেষে মাথায় এক দুর্বুদ্ধি পাঠিয়ে দিয়ে অদৃষ্ট সেটুকুও হরণ করে নিলে।

শৈত্য ও উত্তাপের আনুপত্য হিসেব করে স্থির করলাম, বাইরে রাখাতে যদি আলু আর পেঁয়াজগুলো জমে গিয়ে থাকে তো সেগুলো ঘরের ভেতরে সরিয়ে নিয়ে এলে নিশ্চয়ই আপন আপন আলুত্ব ও পেঁয়াজতায় ফিরে আসবে। বহু কসরৎ করে অনেক জিনিষ সরিয়ে অবশেষে সিন্ধুকটাকে ঘরের ভেতর টেনে নিয়ে একে পূর্বোক্ত ছাগীর অনতিদূরে রেখে দিলাম। পরের দিন প্রফুল্লচিত্তে আপন এক্সপেরিমেণ্টের ফল পরীক্ষা করতে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে হলো। ঘরের উত্তাপে সমস্ত আলু আর পেঁয়াজগুলো গলে নরম হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি সিন্ধুকটা টেনে করিডরে রেখে সেগুলোকে বাঁচাবার চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু তা বৃথা। পরেরদিন সেগুলো আবার বরফে পরিণত হলো, কিন্তু তা রেঁধে খেতে গিয়ে ধরা গেলো সেগুলো পচে আবার বরফ হয়ে উঠেছে। মিত্রপক্ষীয়দের যুদ্ধে জয়লাভের তখনো অনেক দেরী। সুতরাং এবার থেকে ত্রিসন্ধ্যায় ঐ পচা আলু ও পচা পেঁয়াজের স্তূপই একমাত্র ভরসা।



কদিন থেকে পাপ চিন্তার মত কী একটা আকাঙ্খা মনের আনাচে-কানাচে কেবলই ঘুরে ফিরে বেড়ায়। সকালে স্থপ চড়িয়ে দিয়ে যখন একটু সৎ-চিন্তা করতে বসি তখন বারে বারে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। প্লেটোর কথোপকথন যখন জমে আসছে, ঠিক সেই সময়ে যেন শিষ্য গুরুকে কী একটা পেঁচালো প্রশ্ন করলেন, এবং গুরু সক্রাতেস্ তার উত্তর দিতে না পারাতে শিষ্য প্লেটো যেন চোখটিপে বলেন—গুরো, পৃথিবীতে এমন বহু বিষয় আছে তা আপনারও অজ্ঞাত, হে, হে, হে—। কাব্য, কলা,দর্শন, ভাষাতত্ত্ব কোন বই খুলে খানিকক্ষণ পড়ার পরই মনে এক প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন জাগে যাকে ধরতেও পারিনা এবং যার সমাধানও করতে পরি না। কোথায় যেন কিসের অভাব। এবং সেই অভাব পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত একদণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারি না।

দিনের দুশ্চিন্তা রাতে গভীর হয়ে নিদ্রা হরণ করা শুরু করলে, এবং দিনের পর দিন সেই অতি গুপ্ত, অতি নিগূঢ় অভাব-বোধ বেড়েই চললো। বহু আত্মবিশ্লেষণেও তাকে ধরা যায় না। মনের কাছে সাহস করে জীব জগতের আদিম প্রশ্ন পেশ করি। মন তাতেও নিরুত্তর।

উঠতে, বসতে, খেতে, শুতে সর্বদা, সর্বত্র সেই প্রচ্ছন্ন অভাব। কিছুতে শান্তি পাই না। যেন সেই অভাবটির মোচন না হওয়া পর্যন্ত

মনের সঙ্গে বোঝা-পড়া করা যাবে না। আমার তুহীন-শীতল মেজাজ ক্রমে খেঁকী হয়ে ওঠে, হাতের কাছে যা পাই তাই ভেঙে চুরমার করে ফেলতে ইচ্ছে হয়। বহু পুরোনো ভুলে-যাওয়া মনোমালিন্যের কথা মনে পড়ে। অতি নিকট বন্ধুকে শত্রু বলে বোধ হয়, মনে হয় আমার বিরুদ্ধে সমস্ত জগৎ যেন একজোট হয়ে শত্রুতা শুরু করেছে।

ভোজনেও আর স্পৃহা নেই। সকাল-সন্ধ্যায় আর রাঁধতেও ইচ্ছে করে না। যদিও বা কখনো কখনো রাঁধি তাও মুখে দিই না, গরগরে করে তেল লঙ্কা আর তেজ-পাতা দেওয়া শুপ যেন কার ওপর রাগ করে কলতলায় ফেলে দিয়ে আসি।

ক্রমে মাথা-ধরা শুরু হলো, সঙ্গে সঙ্গে গা-ঘোরা, উঠে দাঁড়লে পা-দুটো থরথর করে কাঁপে, শুয়ে শুয়ে পড়বার সময়ে পাঁচ মিনিটের বেশী বইখানাকে হাতে করে ধরে রাখতে পারি না। যে পরিমাণ ক্লান্তি বোধ করলে ঘুমনো যায়, দেহ ও মনের অবসাদ বহুদিন তা অতিক্রম করেছে। শয্যাশায়ী হয়েও শয্যা-সুখ উপভোগ করতে পারি না। দিনে দিনে দুর্বলতা বেড়ে চলে, সঙ্গে সঙ্গে মনের অস্থিরতা। জার্মানী পুলিস খবর নিতে এলে শুয়ে শুয়েই চিঁ চিঁ করে উত্তর দিই—ইশ্‌ বিন্‌ ক্রাঙ্ক্‌, অসুখ করেছে। তারা ভালোমানুষী করে "আর্‌ৎ" বা ডাক্তার আনার প্রস্তাব করলে নিতান্ত স্তোয়িক্‌-ভাবে উত্তর দিই—নাইন্‌ ডাঙ্কে, 'স্‌ইষ্ট্‌ ৎস্থ স্পেট, না ধন্যবাদ এখন আর ওতে ফল হবে না।

অর্থাৎ মহাপ্রয়াণের সব ঠিকঠাক।

এমন সময়ে একদিন সন্ধ্যার দিকে কে দরজায় আস্তে আস্তে ধাক্কা দিলে। অভ্যাস মত ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিই—ডাক্তারের আর দরকার নেই, 'সইষ্ট ৎস্থ স্পেট্‌। ইশ্‌ বিন্‌ জ্যো ক্রাঙ্ক্‌।

সটান ঘরে ঢুকে কে বলে—কিরে, ক্ষেপে গেছিস্‌ নাকি!

মামুস্তা! তুষারে সর্বাঙ্গ সাদা হয়ে গেছে। করিডরে ওভারকোট আর গলশজোড়া খুলে রেখে ভেতরে এসে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেন—কার সঙ্গে জার্মানে হিড়ির বিড়ির করে কথা কইছিলি? "ক্রাঙ্ক্‌" না তোর মাথা! কিসের অসুখ শুনি!

পূর্ববৎ ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিই—কী জানি, মামুস্তা, কদিন থেকে শরীরটা দুবল হয়ে পড়েছে। আর বোধ হয় বাঁচবো না।

ন্যাকামি রাখ্‌ দেখি। জ্বর না জাড়ি না, অমনি বাঁচবো না বললেই হলো কিনা! আচ্ছা মানুষ বাপু তুই। ঠিকানা বদল করেছিস, তা খবরটাও তো দিতে হয়!

খবর দেবো কোথা থেকে? ওরা যে আমায় ধরে ফেলেছে।

তা এই আজ শুনলাম। তাই তো ছুটে এলাম। শোন্‌ এখন আর ছেলেমান্‌ষী করিস্‌ নে। খেয়ে দেয়ে শরীরে জোর করে নে। ওদের সঙ্গে যুঝতে হবে, শরীরে বল না পেলে কী নিয়ে যুঝবি?

আর শরীরে বল! 'স ইষ্ট্‌ ৎসু স্পেট্‌।

রাখ্‌ তোর ন্যাকামি। এই দেখ্‌ কী এনেছি তোর জন্যে!

মামুস্তা হাতের মোড়কটি অতি সন্তর্পনে খুলে আমার চোখের সামনে মেলে ধরেন। অবাক হয়ে দেখি, পূর্ণ চার ইঞ্চী পরিমাণ একটুকরো সসেজ আরে পুরো দুইঞ্চি পুরু এক টুকরো রোষ্ট করা মাংস।

আমার মনের সেই প্রচ্ছন্ন প্রশ্নের সমাধান হঠাৎ যেন মূর্ত হয়ে ওঠে ঐ মাংসে। এতক্ষণে বুঝতে পারি, আপন দেহের অস্থি-মজ্জায় যে অভাব আদিম বুভুক্ষার মত আমায় অস্থির করে তুলেছিল তার পরিপূরণ পশুদেহের ঐ দুটি টুকরোয়।

হিংস্র জন্তুর মত মুখে পুরে অনেকক্ষণ ধরে চিবিয়ে চিবিয়ে তার রস আস্বাদন করি।

অনেকক্ষণ চাঁদ অস্ত গেলেও শাদা ধব্‌ধবে তুষারের রাশি রাশি ফুল্‌কিতে ফস্‌ফরাসের মত আবছা আবছা আলো দেখা যায়। জানলার ধারে কার্ণিশটায় কে যেন থেকে থেকে মুঠো মুঠো অভ্র ছাড়িয়ে দেয়। পৃথিবীর এই সুপ্তির অবসরে কারা যেন পরদিনের পট-পরিবর্তনের জন্যে গোপন আয়োজনে ব্যস্ত। কয়েক ঘণ্টা পরেই রাত্রির যবনিকা-অপসরণের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীকে এক নূতন সাজে দেখতে পাবো। গত দিনের দৃশ্যপটের সঙ্গে আগামী দিনের পটভূমির কোনো সাদৃশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে না। দিনের পর দিন তুষার ও তুহীনের এই মায়ার খেলা ভারি ভালো লাগে। রাত্রিশেষের এই নব নব দিন-জন্মের প্রতীক্ষমান মুহূর্তগুলিতে নিজেকে খুব কাছে পাওয়া যায়। সারাদিনের কঠোর মোহ-মোচনের পরে শেষ রাত্রির এই স্তব্ধ অবসরে মন আবার স্বপ্নরচনা শুরু করে।

সেদিন হঠাৎ যেন আকাশে আগুন লেগে গেল। খুব দূরে যেন কোনো আগ্নেয়গিরি থেকে আগুনের ফোয়ারা ছুটেছে। ধূসর অন্ধকারের পটভূমিতে অগ্নিশিখার সে এক অদ্ভুত ফান্তাস্‌মাগরিয়া। ওদিককার সমস্ত আকাশখানা লাল হয়ে উঠেছে, তার ওপর অসংখ্য তুষার-বিন্দুর

দ্রুত পরিমিত গতিতে মনে হয় যেন সমস্ত আকাশখানা থর থর করে কাঁপে। এই অদ্ভুত আলোর খেলার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি, হয়তো এতদিনে আকাশে ঈশ্বরের বাণী লেখা সুরু হলো।

আগুনের লাল আভায় বহু দূর দুরান্তর পর্যন্ত চোখে পড়ে দিগন্ত-প্রসারী ভগ্নস্তূপ, সহস্র সহস্র মানুষের মূক অভিশাপে অশুভ-সঙ্কেত-লিখা, আর এই রাত্রিশেষের নিথর, সংহত মুহূর্তে শুনতে পাই যেন সহস্র সহস্র মানুষের নির্বাক্ প্রার্থনা।

ঘণ্টা দুই পরে আকাশ থেকে আগুনের আলো মুছে গিয়ে আবার চারিদিক অন্ধকারে একাকার হয়ে গেল। কিন্তু মনের চোখে বহুক্ষণ সেই অদ্ভুত আলোর বিচ্ছুরণ দেখতে পাই। আগুনের এক রকম মায়া আছে। সে যেমন বস্তুকে দগ্ধ করে তার সমস্ত খাদ দূর করে, তাকে পবিত্র করে, তেমনি সে আপন প্রকাশে মানুষের মনকে শঙ্কিত করে, উদ্দীপিত করে তাকে উন্নত করে। সেদিনকার সেই আকাশ-জোড়া অগ্নিকাণ্ডে আমি যেন আবার নূতন করে মনের বল ফিরে পেলাম। বন্দীর সঙ্কুচিত পরিধির মধ্যেই আমার জীবনকে নূতন করে গড়বার উৎসাহ শিরায় শিরায় স্ফীত হয়ে ওঠে।

কিন্তু সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গেই পারিপার্শ্বিক নৈরাশ্যের বিষ-বাষ্প আবার আমার ঘরের হাওয়াকে দূষিত করেছে। হাজার হাজার পথ-চলা মানুষের মুখে দেখি নূতন উৎপীড়নের কালো ছায়া।

কাল শেষ রাত্রে জার্মানরা ভারশৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বাড়ীখানা জ্বালিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রঙ্গ দেখেছে।

আমার ঐ ঘরখানির বাইরে বেশী ঘোরাঘুরি করলে যে কেন্দ্রীকরণ-শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে সে-কথা জার্মানী পুলিস সপ্তাহে তিন বার করে জানিয়ে যায়। এ এক রকম শাপে বর বলে মনে হলো। গত ক-মাস স্বাধীন অবস্থায় শহরে যে-সব ঘটনা চোখে পড়েছে তাতে আর পথে বেরবার স্পৃহাও নেই। অল্পে অল্পে আমার ঐ ছোট্ট pied-à-terre-টিতে যে নিজের একটি ঘরোয়া, আশ্রয়-ভরা আবহ গড়ে তুলেছি তার ওপর পারিপার্শ্বিক ঘটনার অভিযান প্রায় অনুভবই করা যায় না। স্থির হয়ে আপন অবস্থার কথা ভাবলে অবশ্য মনে হয়, আমায় যেন একটা থলের ভেতর পুরে তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। তখন ঘর ও বাহিরের পার্থক্য খুবই সামান্য।

তবুও সেদিন ঘর ছেড়ে বাইরে বেরই। সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়েছে কয়েকদিনের মধ্যেই যার যা পুঁজী আছে তা সরকারের হাতে তুলে দিয়ে আসতে হবে। যাদের জীবন-ধারণের সঙ্গতি একেবারেই নেই তাদের কথা স্বতন্ত্র বিচার করে এক শ জ্‌লতীর নোটের পরিবর্তে খুচরো টাকা দেওয়া হবে। শতোর্দ্ধ বা পঞ্চাশোর্দ্ধ জ্‌লতীর নোট এর পরে যদি কারো কাছে পাওয়া তো উক্ত ব্যক্তির যথাযথ শাস্তির

ব্যবস্থা করা হবে। * উক্ত বিজ্ঞপ্তির ফলে লাখে লাখে মানুষ ভারশৌএর পাঁচটি বাঙ্কের সামনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে ঐ অসহ্য শীতে দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করতে লাগলো, কবে সরকারের সম্মুখীন হয়ে আপন ঐশ্বর্য সমর্পণ করবে বা সরকারের করুণায় আপন পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্যে এক শ জ্‌লতী খরচ করবার অধিকার লাভ করবে

সরকারের ঐ বিজ্ঞপ্তির মূলে কী ছিল জানি না। তবে যতদূর মনে হয় তা এই যে, সরকারের কোষে তখন নতুন নোট ছাপা হচ্ছে। তা চালু করবার আগে পোলদের নিজের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা প্রয়োজন। কারণ নতুন নোট বাজারে ছাড়লেও পোলরা নিজের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সাবেকী জ্‌লতীরই সাহায্যে চালিয়ে চলবে। এবং সে অর্থ যতদিন চালু থাকবে ততদিন তাদের জাতীয়তাবোধও ভেঙে দেওয়া যাবে না। দ্বিতীয়তঃ, ঐ অর্থ বাজেয়াপ্ত না করলে অর্থশালী পোল, যারা তলে তলে দেশের কাজ করে চলেছে তাদের পঙ্গু করে ফেলা সম্ভব নয়। যে-কোনো কারণেই হোক আইন জারী করে পোলদের সর্বস্বান্ত করবার ব্যবস্থা করা হলো।

এই হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে সারি দিয়ে আমাকেও এসে দাঁড়াতে হলো। যুদ্ধের পরে যে কয়েকখানি খুচরো এক শ জ্‌লতীর নোট পুঁজী করা ছিল † সেগুলির অন্ততঃ একখানির পরিবর্তে যদি শ খানেক চলতি জ্‌ল্‌তী পাওয়া যায় তো সেও বড় কম সৌভাগ্যের কথা নয়। কয়েকদিন পরে আর ঐ দৈনন্দিন এক পো রুটি কেনবারও উপায় থাকবে না। দিন দুই লাইন বাঁধবার পর ঘন্টায় গড়পড়তা পাঁচ পা পথ অতিক্রম করে মাইলখানেক দুরমুশ করে সত্যিই সেদিন সকালে

* "মহত্তর যুদ্ধে প্রথম অধ্যায়"—পৃঃ ৩১৫।

† বাঙ্কে সঞ্চিত অর্থ আগেই বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

বাঙ্কের প্রবেশ দ্বারের কাছে এসে হাজির হলাম। এখনোও বিশ্বাস নেই। প্রবেশদ্বারের কাছে লাইন সামান্য বাঁকা-চোরা হয়ে গেলেই জার্মান সান্ত্রী এসে ঘাড় ধরে অপরাধীকে ঠেলতে ঠেলতে মাইলখানেক দূরে আবার সবার শেষে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আসে। সে এক অভিনব স্পোর্ট! তাছাড়া এই প্রবেশদ্বারেব কাছেই দিনের পর দিন কত যে ছোট-খাটো বিষাদময় নাটক অভিনীত হয়েছে তার প্রমাণ স্বরূপ চোখে পড়ে তুষারের ওপর, দেওয়ালের গায়ে জমাট-বাঁধা রক্ত।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখি বাঙ্কের প্রকাণ্ড দরজা আর তার নীচে সিঁড়ির ধাপগুলোর ওপর সঙ্গিন খাড়া করে সাজানো সান্ত্রীর দল। সত্যিই যেন কোনো নাটকের দৃশ্যের মত দেখায়। এবং সেই নাটকের অভিনেতারূপে দুটি মানুষের চেহারা চোখে পড়লো।

তারা এতক্ষণ আমারই সামনে একটু আগে দাঁড়িয়ে ছিল, একটি প্রায়-বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর তাঁর সঙ্গী, পক্ষাঘাতে পঙ্গু, খঞ্জের যষ্টির ওপব ভর করে সারাক্ষণ থর থর করে কাঁপছিল। আর একটু পরেই তাদের প্রবেশ করবার পালা আসতো। কিন্তু প্রায়-বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি কী মনে করে তাঁর সঙ্গীর হাত ধরে সিঁড়ির তলায় সান্ত্রীর কাছে গিয়ে ঐ রুগ্ন লোকটির দোহাই দিয়ে আবেদন জানালেন, যেন তাঁদের ভেতরে যেতে দেওয়া হয়, তাঁর সঙ্গীর পক্ষে আর ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। আবেদনেব শেষে যোগ করলেন, শুনতে পেলাম—ইশ্‌ বিন্‌ আইন্‌ ডয়্‌চের্‌ বেআম্‌টার, আমি জার্মান কর্মচারী।—এতক্ষণ যাদের অবস্থা দেখে জনতার মধ্যে যাদের মনে সমবেনার উদ্রেক হয়েছিল, ঐ ক'টি কথা কানে আসাতে তাদের প্রতিবাদের সাহস না যোগালেও তারা তাদের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। আপন সাফল্যে বৃদ্ধের তখন যেন নেশা লেগে গেছে। তিনি ধাপে ধাপে প্রতি সান্ত্রীর কাছে ঐ একই

আবেদন জানিয়ে শেষে যোগ করেন—ইশ্ বিন্ ডয়্চের্ বেআমটার। সান্ত্রীরাও অতি ভদ্রভাবে পথ ছেড়ে দেয়। জনতার সমবেত ইচ্ছাশক্তি আছে কি না জানি না, তবে চারিপাশের মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় তারা যেন এক যোগে প্রার্থনা করছে, পরমেশ্বর যেন ঐ জাতিগর্বহীন বৃদ্ধ ও তাঁর সঙ্গীর শাস্তিবিধান করেন। আশ্চর্য, একটু পরেই যখন তারা একেবারে দরজার কাছে এসে পড়েছে, তখন সান্ত্রীদের সর্দার কড়া গলায় জিজ্ঞেস করে –ভো্হীন্, কোথায় চলেছো?—দূর থেকে শুনি বৃদ্ধের গদগদ কণ্ঠ—ইশ্ বিন্ আইন্ ডয়্চের্ বেআম্টার।

খেঁকী গলায় সর্দার চিৎকার করে—বিষ্ট্ ডূ, তাই নাকি? হেরাউস্, ভাগো হিঁয়াসে।

ইশ্ বিন্ আইন্ ডয়্চের্ বেআম্টার।—বৃদ্ধ সর্দারের মন গলাবার জন্যে আপন উক্তির পুনরাবৃত্তি করেন।

হেরাউস্, শ্বাইনের-হুন্ট্, ভাগ্ শূয়ার কা বাচ্চা, বিষ্ট্ ডূ কাইন্ ডয়্চের্ বেআম্টার, শ্বাইনের-হুন্ট্ বিষ্ট্ ডূ। তুই জার্মান কর্মচারী! শূয়ার কাঁহাকার!

চোখের নিমেষে দেখি ঐ একতলার সমান উঁচু ধাপগুলোর ওপর থেকে সর্দার ধাক্কা দিয়ে তাদের নীচে ফেলে দিলে। তারপর তাদের ঘাড় ধরে নিয়ে চললো মাইলখানেক দূরে লাইনের একেবারে শেষে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যে। পঙ্গু লোকটি খঞ্জের যষ্টির ওপর ভর করে কাঁপতে কাঁপতে চলে। জনতার দিকে চেয়ে সহানুভূতি প্রার্থনা করবার মতও আর তার সাহস নেই।

ক-দিন থেকে শুনি শহরেব কাছেই কোথায় কী এক ভীষণ কাণ্ড ঘটে গেছে। ভারশৌএর চারিপাশের শহরতলী ও গণ্ডগ্রাম থেকে হাজার হাজার মানুষ আতঙ্কে দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে শহরে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। কেউ বলে শহরের বাইরে আবার নাকি যুদ্ধ লেগে গেছে, কেউ বলে ইংরেজ আর ফরাসীরা শহরেব এত কাছে এসে পড়েছে যে জার্মানরা মরিয়া হয়ে শহরের চারিদিকে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে সে-অঞ্চলের লোকদের সরিয়ে আনছে, কেউ বলে শহবেব বাইরে মড়ক লেগে গেছে।

চারিদিকে এই চাঞ্চল্য, অথচ পোল ভাষায় যে সরকারী অথবার প্রকাশিত হয় তাতে সে-সম্বন্ধে একটা কথাও চোখে পড়ে না। জানলা দিয়ে দেখি রাস্তায় দলে দলে মানুষ আপন আপন ঘর-সংসার পিঠে নিয়ে বাড়ী-বাড়ী আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। আশ্রয় না পেয়ে উঠোন আস্তাকুঁড় যেখানে পায় সেইখানেই কম্বল টাঙিয়ে আপন আপন পরিবারের মাথা গোঁজবার জায়গা করে নেয়। ওদেরই একজনকে জানলা দিয়ে ইশারা করে ওপরে ডেকে জিজ্ঞেস করি—কী ব্যাপার বলো তো হে?

সাড়ে ছ ফুট চেহারার মরদটার মুখ দিয়ে কথা বেরয় না। ভাবে, আমি বুঝি তার মুখ দিয়ে কী একটা বেফাঁস কথা বের করে নিয়ে তাকে

বিপদে ফেলবার মতলবে আছি। রাজপুতের মত লম্বা এক জোড়া গোঁফ, গায়ে ভেড়ার ছালের কোট, হাঁটু পর্যন্ত বুট পায়ে, মাথায় রোমের আস্ত্রাহান্ টুপী। তার সঙ্গে হাতাহাতিতে এঁটে উঠতে পারে এমন মরদ কা বাচ্চা পৃথিবীতে কমই আছে। অথচ শহরতলীর এই চাষাদের জীবনে সম্প্রতি এমন কিছু ঘটেছে যাতে তাদের স্নায়ুর শক্তি একেবারে চুরমার হয়ে গেছে। অনেক আশ্বাস ও অভয় দেওয়ার পরে সে চুপি চুপি বলতে শুরু করে ঃ

একোনো শোনো নি বুজি ? পানিয়ে, অবাক্ করলে তোমরা এই শহর-ওলারা। তোমবা একেনে দিব্যি নিশ্চিন্দি মনে খাচ্চো দাচ্চো, বিঁড়ি টানচো, আর উদিকে শ্বাব্‌বা যে আমাদের শেষ করে দিলে বাবা ! তবে বলি শোনো, কিন্তু দোহাই বাবা, শ্বাবদের গোয়েন্দা হও তো খুলে বলো, আমি এই মুকে তালা দিনু, হাঁ-টি পজ্জন্ত করবো নি।...হ্যাঁ, কী বল্‌ছিনু, এই দেকো এই শওরের বাইরে যে ভাভের্ বলে জায়গাটা না, ওকেনেই তো শুরু হলো। তারপর দেকতে দেকতে সর্বত্তর ছইড়ে পড়লো।

অসহিষ্ণুভাবে জিজ্ঞেস করি—কী শুরু হলো ?

কী আবার ? ওদের যা রেওয়াজ তাই। মারধোর, খুঁন-জখম।

এমনি শুধ্ শুধ্ ?

না, সে অনেক কতা। আমার বাড়ী ভাভের্ থেকে কোশখানেক রাস্তা, এই একটা মাট পেরুলেই আর কী, তা সে এক রকম ভাভের্‌ই। ভাভের্‌ই আমাদেঘরেরও পোস্ট-আফিস, থানাও ঐ ভাভের্‌ই। ভাভের্ তা তোমাদেঘরেব ভারশাভার মতন অত বড্ডা না হলেও সেও শওর গো বাপু, কম সে কম এক হাজার মান্‌ষের বাস, আর এই ভারশাভা থেকে এই তো কোশ তিনেক পত, ছোট এল-গাড়ী করে যেতে হয়।

ভাভেরে কী হয়েছে কী ?

এজ্ঞে হ্যাঁ, সেই কতাই তো বলছিনু পানিয়ে। ভাভেরের মতন শওরে তোমার গে যা চাও তাই পাওয়া যাবে, ইস্কুল, ডিস্পেন্সারী, ফুটবল কেলাব, মদের ভাঁটি, সব। সেই মদের ভাঁট্টিতেই শুরু হলো। আমি অবিশ্যি নিজের চোকে দেখিনি। পরে শুনন্নুন। হয়েছে কী, একোন একদিন ঐ মদের ভাঁট্টোয় পাঁচজন মান্ষে বসে বীয়ার খেতে খেতে নিজের নিজের সুকদুক্খুর গল্প-গুজোব কচ্চে, এমন সময়ে কতায় কতায় দু-বেটা শ্বাবের সঙ্গে তক্ক বেদে গেল। কী নে বাপু জানিনে এমনি কতায় কতায় তক্ক আর কী। ইদিকে তক্ক চলেচে, আর উদিকে গেলাসের পর গেলাস খালি হচ্চে। তারপর নেশার ঝোঁকে দু-পক্ষে হাতাহাতি। এ ওর গায়ে মদ ছুঁড়ে দেয়, এ ওর জামা ছিঁড়ে দেয়, তারপর ঘুঁষোঘুঁষি। শেষকালে ঐ দু-বেটা শ্বাব আমাদের দেশ নিয়ে কি সব কুচ্ছিত কতা বলতে নাগলো। আর উদিকে দুটো পোল, চাষার ছেলে সহ্যি করবে কেন বাপু! লেগে যা গুরো। ব্যাস, শ্বাব্-দুটো পেটের পিস্তল খুলে পটাপট্ গুলী চালাতে নাগলো, আর ওরাও চেয়ার ছুঁড়ে তাদের ঘায়েল করলে কিন্তু তবুও কি থামে? শেষকালে ঝটাপটি। চাষার পুত, দুঃভিক্ষের বাজারে পেটপূরে খেতে না পেলেও বাপ্দাদার দেয়া গায়ে জোর আচে তো রে বাবু, শ্বাব্-দুটোকে মেরে ভূত ভাগিয়ে দিলে। তারপর দেকে কী, সে দু-বেটা মারামারি কত্তে কত্তে কোন্ এক তক্কে অক্কা পেয়েচে। তাই না দেকে চাষার পুত দুজন একেবারে নম্বা, মাট দে সটান, তাদের ধরে কার সাদ্দি! তারা কোতায়, যে উদাও হলো তার পাত্তাও কেউ পেলে না। তাছাড়া তারা ভিন গাঁয়ের মানুষ ভাভের্ দে কোতায় যেতে যেতে মদের ভাঁটিতে এক ঢোক করে খেতে ঢুকেছেলো। তারপর এই কাণ্ড। তারা যে কোতায়

ভাগলো, তা ভাভেরের মানুষ কী করে জানবে বলো তো গা !...তারপর পুলিশ এলো, তদন্ত হলো, চাষার পুত দুজনের নাম, ঠিকানা কেউ বলতে পারে না। ইদিকে শ্বাব্ দুটোর অক্কা পাওয়ার খবর ভারশাভায় গে পোঁচেচে। আর দেকে কে? পরের দিন গাড়ী গাড়ী শ্বাব্ বন্দুক, সঙ্গিন নে ভাভের্ ছেয়ে ফেললে। শ্বাব্রা বললে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আসামী দুজনকে হাজির করে দিতে না পারলে তারা ভাভের্কে ভাভের্ উড়িয়ে দেবে। আসামী ভাভেরের মানুষই নয়, আর হলেই বা কে তাদের ধরে নে শ্বাব্দের হাতে তুলে দেবে বলো তো? যুদ্ধের সময়ে হলে তারা সরকার থেকে মেডেল পেতো, আর একোন যুদ্ধ থেমে গেচে বলেই কি তাদের অমনি শত্তুরের মুকে তুলে দিতে হবে!...ইদিকে চব্বিশ ঘণ্টা কাবার, আসামীদের দেকা নেই। ব্যাস্, শ্বাব্রা বাড়ী বাড়ী গে পুরুষ মানুষদের টেনে নিয়ে এসে গুলী কত্তে নাগলো। খবর শুনে ভাভের্ থেকে সবাই পালাতে শুরু করলে, ঘর বাড়ী ফেলে। শ্বাব্ বেটারা শেষ পজ্জন্ত পতে-ঘাটে যাকে পায় তাকেই গুলী কত্তে নাগলো। সে কী কাণ্ড, সে সব কতা একোন মনে হলেও গা কাঁপে। এক ভাভেরেই ওরা শ দেড়েক শ দুয়েক মানুষকে খুন করলে। তারপর ভাভের্ শেষ হলে তার পাশের গাঁগুনোয় হাত পড়লো তারপর তার পাশের শওরে। এমনি করে ওরা ভারশাভার আশপাশের সব জায়গাগুনো সাবাড় করে চলেচে। সেকেনে কি মান্ষে টেঁকতে পারে বাবা? ওরা গুলী করে, আর আমাদের কাচে একখানা মুরগী জবাই করবার ছুরী পজ্জন্ত নেই। তাই আমরা একোন পালিয়ে এসে জীবন রক্ষে করিচি। তোমরা একেনে বসে নিশ্চিন্দি মনে খাচ্চো দাচ্চো, বিঁড়ি টানচো, গাঁয়ের দুক্খু তোমরা কী বুজবে, পানিয়ে?

একদিন দুপুরে নিজের আস্তানায় বসে আপন অভ্যাস মত মানসিক রোমন্থন করছি, এমন সময়ে বাইরে দরজার গায়ে ঝোলানো চিঠির বাক্সে খড়্‌খড়্‌ করে কাগজের শব্দ হলো। যুদ্ধের আগে পত্র-ব্যবহার বলে সভ্য জগতে যে একটি সামাজিক রীতি ছিল যুদ্ধের পরে সে-কথা আর মনেও নেই। তাই চিঠির বাক্সে কাগজের শব্দ শুনে মনে হলো তা পাড়ার দুষ্টু ছেলের এক রকম নির্দোষ আত্ম-বিনোদন। খানিকক্ষণ পরে কৌতুহল দমন করতে না পেরে আলস্য বর্জন করে দরজা খুলে দেখি চিঠির বাক্সে হলদে রঙের লম্বা একখানি খাম। সত্যিই আমার নামে একখানি চিঠি এসেছে

খাম খুলে অবাক্ হয়ে যাই। ভারশৌএর মার্কিনী কন্‌সুলাৎ আমার উপস্থিত গতিবিধি সম্বন্ধে আপন কৌতুহল প্রকাশ করেছেন। যুদ্ধের সময়ে যখন পায়ে হেঁটে ভারশৌ থেকে চলে যেতে বাধ্য হই তখন ব্রিতানী প্রজাবৃন্দের অভিভাবক হিসেবে উক্ত কন্‌সুলাতে গিয়েই সাহায্য প্রার্থনা করি। তখন আমায় সোজা পথ দেখিয়ে দিয়ে বলা হয়, যদি শহর থেকে চলে যেতে চাই তো সামনে পথ পড়ে আছে, এবং তার ব্যবহারে তাঁদের কিছুমাত্র আপত্তি নেই। এ ছাড়া আর কোনো সাহায্য

করতে তাঁরা অসমর্থ। সেই দিন আমার ধারণা হয়েছিল যে, যে-মার্কিনীদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা যখন তখন কাঁদতে কাঁদতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নালিশ জানাই, ভারতীয়ের প্রতি ব্যবহারে তারা ইংরেজদেরও হার মানাতে পারে। হয়তো চারিদিকের বোমার আওয়াজে তখন উক্ত কন্‌সুলাতের কর্মচারীবৃন্দের স্নায়ুর অবস্থা প্রকৃতিস্থ ছিল না। যাই হোক্ যুদ্ধের পর হঠাৎ এই অধমের অস্তিত্বের কথা তাঁদের য়াদে আসা খুবই আশ্চর্য বোধ হলো। *

যুদ্ধের তদানীন্তন পরিস্থিতিতে মার্কিনীদের স্থান অত্যন্ত অনিশ্চিত, মার্কিনীরা জার্মানদের যখন তখন গালি-গালাজ করলেও জার্মানদের কাগজ পড়ে তখন মনে হতো তারা পরস্পরকে অত্যন্ত সমীহ করে চলে, বিশেষতঃ জার্মানরা। মার্কিনীরা যে এ-যুদ্ধে যোগ দেবে না, এমন কথাও বহুবার উচ্চারিত এবং লিখিত হয়েছে, মনে আছে। তত্রাচ ইংরেজদের জাতভাই মার্কিনীদের সঙ্গে আমি যে স্বাধীনভাবে পত্র-ব্যবহার করছি তা অপরাধ বলে গণ্য হওয়া আশ্চর্য নয়। সুতরাং মার্কিনী কন্‌সুলের পত্রের উত্তরে আমি শুধু একটি নির্দোষ আবেদন জানাই। আমার দেশে ফেরবার ব্যবস্থা করলে যার-পর-নাই কৃতজ্ঞ হবো। যতদূর মনে হয় সে-পত্র তাঁদের কাছে পৌছেছিল, কারণ এর পর যখন আমি দেশে ফেরবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেলাম, তখন যেন একটি অদৃশ্য শক্তি আমায় কখনো কখনো সাহায্য করতো।

মার্কিনীদের কাছে স্বদেশ প্রত্যাগমনের আবেদন জানিয়েই সেই স্বপ্নেরও অতীত সাম্রাজ্যের কথা দিনরাত্রি মনে জাগতে লাগলো।

* পরে শুনলাম লন্ডনের পররাষ্ট্র-বিভাগ থেকে মার্কিনী কন্‌সুলাতের মধ্যস্থতায় আমার তত্ত্বাবধান করা হয়েছিল। এই ব্যাপারে উদ্যোক্তা অবশ্য আমার পিতা।

আমার কোনো দেশ আছে কিনা জানি না। ভারতীয় সংস্কৃতিকে আমি শ্রদ্ধা করি, যদিও তার কোনো বিশদ সংজ্ঞা আমার মনে এখনো রূপ গ্রহণ করে নি, বাংলা ভাষাকে আমি ভালোবাসি, কারণ তার আদর ও আন্তরিকতা আমায় আবাল্য মুগ্ধ করেছে, যদিও বঙ্গবাসীজনের জাতীয় সংমিশ্রণ এবং ব্যক্তি হতে ব্যক্তির বর্ণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আমার মনে অশান্তি সৃষ্টি করে। তবুও সেই দীর্ঘ ও সুদূর প্রবাসে বাংলায় ফেরবার জন্যে আমার মন অস্থির হয়ে উঠলো। ছেলেবেলাকার সেই লাটু, ঘুড়ি, পুজোর কাপড়, প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথের কাব্য, বাঙালীদের হাসি-ঠাট্টা, আর সেই গাছে গাছে ছায়া-করা দেশ। তখন স্মৃতির তহবিলে এর বেশী দেশ বলতে আমার কাছে আর বিশেষ কিছু ছিল না। আর একটি জিনিষ ছিল যার মাহাত্ম্যে আমি বিশ্বাস করি। তা এই বাংলা ভাষা। এ ভাষা হিন্দুর না মুসলমানের, এতে কতখানি সংস্কৃত আর ক ছটাক, ক কাচ্চা আরবী-ফার্সী শব্দ মিশেল আছে তার বিশ্লেষণ আমি কোনো দিন করি নি। শুধু এইটুকু জানি, এই ভাষার দরদ, সূক্ষ্মতা ও লাস্য আমায় মুগ্ধ করে। আমার কাছে সমস্ত ভাষার প্রণব এই বাংলা ভাষা। সীমাহীন ধ্বংস-প্রান্তরের মাঝে আমার এই ছোট্ট ঘরখানায় বসে যখন আদিম মানুষের মত আপন প্রতিবেশের সঙ্গে পরিচয় করতে চাই তখন মনে পড়ে— আকাশ, তারা, চাঁদের আলো, পাখীর বাসা। যেন শিশুর প্রথম উচ্চারণের আবেগ ও আনন্দ অনুভব করি।

পরের দিন যখন জার্মানরা নিয়মমত আমার তল্লাস করতে এলো তখন ভরসা করে জিজ্ঞেস করলাম—দেশে ফেরা যায় কী করে বলুন তো!

ভাস্‌! দেশে ফিরতে চান্‌! ক্ষেপেছেন! যুদ্ধ শেষ না হওয়া

পর্যন্ত, মাইন্ লিবের্ হের্, প্রিয় মহাশয়, ও-কথা মনে স্থান না দেওয়াই আপনার পক্ষে মঙ্গল।—একটু পরে যোগ করে—অবশ্য দরখাস্ত করতে কোনো বাধা নেই, শ্রাইবেন্ জী নাখ্ বের্লীন্, বার্লিনে লিখুন!—ওদের সেই মামুলী বুলী, শ্রাইবেন্ জী নাখ্ বের্লীন্।

তবুও জিজ্ঞেস করি—এদেশের লোকেরা কী বিদেশে যাচ্ছে না?

য়া গেভিস্, কিন্তু এদের কথা আলাদা. এরা এখন জার্মানী প্রজা। তাছাড়া ইহুদী ছাড়া কোনো পুরুষ মানুষেরই এখান থেকে বেরবার উপায় নেই। মেয়েদের অবশ্য আমরা ছেড়ে দিচ্ছি। পোল মাগীগুলো বেজায় দজ্জাল মশায়, কেবলই ঝঞ্ঝাট বাধাচ্ছে। দেশ থেকে সবগুলোকে বের করে দিতে পারলে ভালো হয়।

আবার জিজ্ঞেস করি—যারা চলে যাচ্ছে তাদের পাসপর্তের কী ব্যবস্থা হচ্ছে?

আবের্ এস্ গিব্ট্ আউখ্ আইন পাস্‌স্-ষ্টেলে ইন্ ভারশাউ, এখানেও পাসপর্ত অফিস আছে যে।—সগর্বে জার্মনী পুলিস ঘোষণা করে।

সত্যি নাকি? কোথায় বলুন তো?

আগে যেখানে এদের ডিপ্লোমেসীর খেলা-ঘর ছিল, অর্থাৎ তথাকথিত পররাষ্ট্রমন্ত্রিত্বে।

য়া?!

য়া, য়া।

মামুস্থার বাড়ী পৌছতে আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। ঘরে ঢুকেই সোল্লাসে ঘোষণা করি—মামুস্থা, দেশে চললাম।

তোর যেমন ঠাট্টা করা অভ্যেস, কখন যে তামাশা করচিস্ সে আর কখন যে সত্যি কথা বলচিস্ তাও কি বোঝবার জো আছে! সত্যি যাবার ঠিক করেচিস নাকি?—মামুস্থার বুক থেকে যেন জগদ্দল পাথর নামে। হিরণের যে কখন কী হয়, সেই ভয়ে বেচারারা সর্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকেন। মামুস্থা বলেন—সত্যিই যদি কোনো রকমে এখান থেকে বেরুতে পারিস্ তো আমার বাপু ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। এই বুড়ো বয়েসে আর ভাবতে পারি নে।

বলি— না, যাবার এখনো কিছু ঠিক নেই। তবে আজই খাব্‌দের কাছ থেকে খবর পেলাম, যাবার অনুমতির দরখস্ত করা যেতে পারে, অবশ্য বের্লিনে।

মামুস্থার মুখ থেকে হাসি মুছে যায়, একটু রাগ করে বলেন—তোর বাপু ঐ সবতাতে ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না। তুইও বার্লিনে দরখাস্ত করেচিস্, আর ওরাও তোকে অমনি হট্ বলতে ছেড়ে দিয়েচে! নে, রাখ্ তোর তামাশা। আজ তোর মেজাজ যে রকম খুসী দেখচি,

তাতে মনে হয় জার্মানরা তোর ব্যাঙ্কের টাকা কিছু ফেরত দিয়েচে। কী ব্যাপার বল্ তো?

ক্ষেপেছেন! সে টাকার ভরসা আমি করি না, তাছাড়া কাগজ-পত্রও ওরা এতদিনে পুড়িয়ে শেষ করেছে।

তবে দেশে যাবি কী করে রে? ঐ দেখো, আমি আবার তোর তামাশায় বিশ্বাস করতে শুরু করেচি।

দেশে যাবার টাকার কথা ভাববো পরে, এখন ছাড়পত্র তো পাওয়া যাক্। যাবার চেষ্টা আমি কাল থেকেই করবো। কিন্তু তার আগে জানতে চাই, হালীনাকে আমার সঙ্গে যেতে দেবেন কিনা।

মামুস্তার মুখ দেখে মনে হলো তিনি ভেতবে ভেতরে এই প্রশ্নটিরই প্রতীক্ষা করছিলেন। হাসি মুখে বললেন—ও-কথা জিজ্ঞেস করচিস কেন? যুদ্ধের সময়ে তোর সঙ্গে ছেড়ে দেই নি? তবে এখন ও যেতে চাইলে হয়। দেশেব কাজ, দেশের কাজ বলে যে-রকম ক্ষেপেচে আজকাল!—তারপর স্বর নামিয়ে যোগ করেন—তুই বাপু যদি পারিস তো জোর করে ওর মত কর। আজকাল ওরা যাকে তাকে গ্রেপ্তার করে যেরকম গুলী করচে তাতে আমার আর এক দণ্ড মনে শান্তি নেই। তাছাড়া, জানিস্ তো, ও যে-আপিসে কাজ করতো সেটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তাই, না হলে ওর সত্যিকার পরিচয় পেলে ওরা কোন্কালে ওকে ধরে নিয়ে যেতো। ওর আপিসের কর্তাকে ধরবার জন্যে ওরা কম খোঁজাখুঁজি করচে!

মামুস্তা কিছুক্ষণ ভেবে আবার বলেন—শোন্ বাছা, হালীনাকে নিয়ে আর জার্মানদের ঘেঁটাস নি। ওরা যদি ধরে ফেলে ও কোথায় কাজ করতো তখন আর বাঁচাতে পারবি না। আমি বলি কী, ওকে রেখে তুই ভালোয় ভালোয় রওনা হ। আবার ঐ দেখো, আমি আজকাল যখন

তখন ভুল বকি, তোর যাবার ঠিক কোথায়, আর অমি ভাবছি তুই বুঝি কালই'রওনা হচ্ছিস্‌।

মামুস্তা যে-প্রসঙ্গ উথাপন করলেন তাও ভেবে দেখা দরকার। হালীনার আপিস ভস্ম-স্তুপে পরিণত হলেও তার পরিচয় যদি জার্মানরা ঘুণাক্ষরে জানতে পাবে তাহলে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বলা শক্ত। অপর পক্ষে তার এদেশে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকাও কম বিপদের কথা নয়। কারণ ক্রমে গেস্তাপো যখন কায়েমী হয়ে আপন কাজ শুরু করবে, তখন তাদের আলেয়া সুখা-র ঐ আফিসটি একটি ভৃগু-সংহিতার গ্রন্থাগারের আকার ধারণ করবে এবং হালীনা তো কোন ছার তার ঊর্দ্ধতন চতুর্দশ পুরুষেরও নাম-ধাম, কার্য কলাপ স্বভাব-চরিত্র এবং যাবতীয় বিবরণ সেই গ্রন্থাগারের কাতালগে লাল কালীতে তোলা হয়ে যাবে।

যুক্তি-তর্কে হালীনাকে পরাস্ত করা বিশেষ কঠিন হলো না, কারণ যতদূর মনে হয়, তা৲ দেশাত্মবোধ তার নারীত্বের কাছে হার মানলে। স্থির হলো, আমরা উভয়েই স্বতন্ত্র বিদেশ যাত্রার অনুমতির জন্যে দরখাস্ত করবো। এবং পোলদেশ থেকে বেরিয়ে পথে কোনো দেশে উদ্বাহ কার্য সম্পন্ন করে * পদব্রজেই হিন্দুস্থান যাত্রা করবো। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, স্বপ্ন-রচনা করা যদি যৌবনেরই ধর্ম হয় তো সেই যৌবনের গর্ব আমি তখনো করতে পারতাম।

পরের দিন হালীনা সমভিব্যহারে পূর্বোক্ত পাস্‌স্‌-ষ্টেলে বা পস্‌পর্ত্‌ আফিসের কাছে গিয়ে আগের দিনের স্বপ্নের কতখানি বাকী রইলো বলা শক্ত। গভীর হতাশার সহিত দূর থেকেই আবিষ্কার করলাম,

* উক্ত কার্যটি ইতালিয়াতে অনুষ্ঠিত হয়।

পাস্‌স্‌-ষ্টেলের সামনে হাজার হাজার মানুষ ভোর থেকেই অপেক্ষা করছে। পাস্‌স্‌-ষ্টেলে বা পাস্‌পর্ত আফিসের মার্ফতে বিদেশ-যাত্রা করবার প্রত্যাশা করে এমন লোক বেশী ছিল বলে মনে হয় না। তবে ও দেশের এক শহর থেকে আর শহরে যেতে হলেও পাস্‌পর্ত জাতীয় তথাকথিত আউস্‌ভাইস্‌ (ausweis) বা অনুমতি-পত্র আবশ্যক। সুতরাং সবাই একসঙ্গে এক জায়গাতেই জড়ো হয়েছে। তাছাড়া ঐ পাস্‌স্‌-ষ্টেলেতেই ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় আউস্‌ভাইস্‌ দেওয়া হয়। কাজেই ভিড় বাড়িয়েছে বেনে, মুদী, যারই শহরে দোকান আছে তাকেই শহরের বাইরে থেকে মাল আমদানী করতে হলেও আগে এখানে এসে দাঁড়িয়ে আউস্‌ভাইস্‌ নিতে হবে, তবে সে শহর ছাড়তে পারবে। জার্মানরা বরাবর নিজের শাসন প্রণালী এবং ordnung বা সুব্যবস্থার বড়াই করে শুনেছি, কিন্তু তাদের verwaltung বা কার্যনির্বাহক ব্যবস্থার যে নমুনা পোলদেশে চোখে পড়েছে তাতে মনে হয় তাদের সে বড়াই একেবারে ভুয়ো। যাই হোক্‌ এই সহস্র সহস্র প্রার্থীর পেছনে দাঁড়িয়ে কতদিনে যে পাস্‌স্‌-ষ্টেলের ভেতরে ঢোকা যাবে তা অনুমান করা তখন সম্ভব নয়, প্রবেশ করলে কী ফল হবে সে কথা ছেড়েই দেওয়া যাক্‌। তবুও দিনের পর দিন আশায় বুক বেঁধে ভোর থেকেই লাইন বেঁধে দাঁড়াই।

দিন কতক পরে আবিষ্কার করলাম, আমাদের প্রচেষ্টা নিতান্ত ব্যর্থ হয় নি। কারণ কয়েক দিন পরে এমন একটি জায়গায় এসে পড়েছি যেখান পর্যন্ত ভবিষ্যতে প্রবেশ-লাভের জন্যে নম্বর-লেখা টিকিট বিতরণ করা হয়। অর্থাৎ আরো কয়েক দিন অপেক্ষা করার পরই সটান পাস্‌স্‌-ষ্টেলের তোরণ অতিক্রম করা যাবে। রাস্তার ওপর সেই কঠোর শীতে অপেক্ষমান জনতার কথা মনে আছে। সারাদিন দাঁড়িয়ে থেকে মাত্র

রাত্রের জন্যে তারা ঘরে ফেরে আবার ভোর হলেই সারি বেঁধে দাঁড়ায়। তার ওপর মার-ধোর, গালি-গালাজ, হাজার লাঞ্ছনা।

এমনি করে একদিন সত্যই পাস্‌স্‌-ষ্টেলের ভেতরে প্রবেশ করা গেল। কিন্তু কোথায় পাস্‌র্পত্‌ আফিস্‌! বাড়ীখানার ভেতরের বারান্দাতেও শত শত মানুষ সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে দারোয়ানের ঘরে ঢোকবার প্রতীক্ষা করছে। সেখান থেকে জানা যাবে কার আফিস কোন্ ঘরে। আবার রোজ এসে সেই বারান্দায় সারি দিয়ে দাঁড়াতে হয়। এততেও নির্দিষ্ট ঘরে যে ঢোকা যাবে তারও কোনো স্থিরতা নেই। কারণ জার্মান সান্ত্রীর যদি খেয়াল হয় তো সে ঘাড় ধরে আফিস থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে আবার পথের শেষভাগে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আসতে পারে।

আরো কয়েকদিন অপেক্ষা করার পর অবশেষে যখন সত্যিই দারোয়ানের সম্মুখীন হওয়া গেল তখন সে আমাদের আবদনের উদ্দেশ্য শুনে মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো, তারপর বাতুলের প্রতি প্রযোজ্য তাচ্ছল্যের সহিত বললে—নুম্মের ৎসোয়াই, দুনম্বর ঘর।

সপ্তাহ দুই ধরে নানাস্থানে নানা লেজুড়ে দাঁড়িয়ে যখন দু নম্বর ঘরের সামনে এসে সত্যিই হাজির হলাম তখন আশা হলো, হয়তো একদিন ও-দেশ ছেড়ে বাইরে বেরনো যাবে। এবং এখানেও এক অদৃশ্য দৈবের হস্ত আমার সাহায্য করলে।

একদিন আমাদের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে ঐ আফিসেরই একটি কর্মচারী হঠাৎ আমার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এন্‌শুলডিগেন্‌ জি., জি়ন্দ জী আইন ইণ্ডিয়ের, মাফ করবেন, আপনি ভারতবাসী?

তাঁর ভদ্রতা ও কথার সুরে আশ্বস্ত হয়ে কবুল করলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভিয়েনায় আমি একটি ভারতবাসীর সঙ্গে পড়তাম। তাঁর মত বন্ধু আমার জীবনে আর পাই নি।—ভদ্রলোক আমায় অভ্যর্থনা করবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেন।

আজ যদি কোনো আউস্ট্রীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় তো আমাকেও বলতে হবে—সেই আউস্ট্রীয় কর্মচারীর মত বন্ধু আমার জীবনে অল্পই পেয়েছি।

আমার ব্যক্তিগত পরিচয় জেনে নিয়ে ডক্টর ক—নিজের হাতে দরখাস্ত লিখে দিয়ে বললেন—যদি সত্যিই আপনার বিরুদ্ধে কোনো গুরুতর অভিযোগ না থাকে তো আপনাদের বিদেশ-যাত্রা সম্বন্ধে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।—এবং চোখ টিপে ক্লটো জার্মানী কায়দায় শূন্যে চড় উঁচিয়ে বিদায় জানালেন—হাইল্‌ হিটলার!

বাড়ী ফিরে স্বদেশ-যাত্রা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়লো, আমার বিরুদ্ধে যদি একটি গুরুতর অভিযোগ সত্যিই একদিন গেস্তাপোর প্রসাদে আবিষ্কৃত হয় তো আমার কেন্দ্রীকরণ-শিবিরবাস তো সুনিশ্চিত বটেই, এমন কি মুণ্ডপাতও আশ্চর্য নয়। ব্যাপারটা এই :

বাল্যকাল হইতেই ফরাসী-ঘেঁসা হওয়ার দরুণই হোক্ বা জার্মানদের স্বীয় গুণাবলীর দৌলতেই হোক, আমি জার্মানদের বিশেষ অনুরক্ত এ-কথা বলা চলে না। এমন কি ওদের ঐশ্বর্যশালী সাহিত্য অধ্যয়ন করবারও আকুতি নিজের মধ্যে কোনো দিন অনুভব করি নি। দর্শনের দোহাইয়ে ওদের প্রতি যে-টুকু শ্রদ্ধা একদা প্রথম যৌবনে সঞ্চয় করেছিলাম সেটুকুও ওদের দেশে গিয়ে ওদের সঙ্গে মিশে হারাতে বাধ্য হয়েছিলাম, যদিও একথা সত্য যে, যে-জার্মানীকে দেখবার দুর্ভাগ্য আমার ঘটে তা হিট্‌লার জার্মানী। ওরা হয়তো গভীর অনুশীলনে পটু, মানব সভ্যতায় ওদের অবদান হয়তো সত্যিই অপরিমিত, তাছাড়া সঙ্গীতে ওদের দোসরা মেলে না, সব মানি, কিন্তু সাধারণ জার্মানের চরিত্রের দুটি বৈশিষ্ট্য ওদের সঙ্গে মেলবার পথে বরাবর বাধা সৃষ্টি করেছে। তা ওদের রসানুভূতির স্বল্পতা আর ওদের স্বভাবের অন্তর্নিহিত নিষ্ঠুরতা। যাই হোক্, আমি অকুতোভয়ে স্বীকার করি, জার্মানদের বিরুদ্ধে আমার প্রাগ্বিচার অত্যন্ত স্পষ্ট।

সুতারাং যখনই ওদের সম্বন্ধে কোনো মত প্রকাশ করেছি তখনই তা প্রাগ্বিচার দোষে দূষিত হলেও অপরিহার্যরূপে শ্রুতিকটু হয়েছে। এবং

যুদ্ধের আগে বক্তৃতা ও লেখনে বহুবাব আমার মনোভাব অসঙ্কোচে ব্যক্ত করেছি। যুদ্ধের এই সর্বসাধারণ ধ্বংস-কার্যে সেগুলোর চিহ্ন যদিও বিলুপ্ত হয়ে থাকে তো একটি রচনা কোথাও না কোথাও আত্মগোপন করে আছে যার আবিষ্কাবের সঙ্গে সঙ্গেই আমায় পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। রচনাটি একটি গ্রন্থের অবতরনিকা।

যুদ্ধেব ঠিক আগে ওদেশেব একটি লেখিকা মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে একখানি বই লিখে আমায় বইখানির ভূমিকা লিখে দিতে অনুরোধ করেন। তখন যুদ্ধ খুব কাছে এসে পড়েছে। সুতরাং গান্ধীনীতির সঙ্গে হিটলাব-রীতিব বৈসাদৃশ্য প্রমাণ করবার প্রসঙ্গে কয়েক পৃষ্ঠা ধবে হিটলারকে নানা অভিধায় আখ্যাত এবং নানা অলঙ্কারে ভূষিত কবেছিলাম। হিট্‌লাবেব অভিনয় করার অপবাধে যদি ভেঙ্গ্‌ক্লীনেব মেরুদণ্ড লোহার ডাণ্ডা দিয়ে ওরা ভেঙে দিয়ে থাকতে পরে তো পূর্বোক্ত মহাপুরুষের প্রতি চোখা চোখা বিশেষণ প্রয়োগ কবাব অজুহাতে আমার মুণ্ডচ্ছেদ কবা তো যুক্তিসিদ্ধ বটেই, উপবন্ত মৃত্যুর পরে শাশ্বতীঃ সমাঃ নরকের কেন্দ্রীকরণ শিবির-বাসও অবধাবিত, অবশ্য যদি যমবাজ্যেও নাৎসী প্রভাব বিস্তৃত হয়ে থাকে।

যাই হোক্‌ এখন সমস্যা হলো, কী উপায়ে বইখানির প্রচার বন্ধ কবা যায়, অথবা এমন কী যজ্ঞ অনুষ্ঠিত করা যায় যে, মন্ত্রের আকর্ষণে যেখানে যেখানে যার কাছে যে একখানিও ঐ বই আছে, সবগুলি উড়ে এসে স্বেচ্ছায় ঐ যজ্ঞে আত্মাহুতি দেবে?

বহুক্ষণ ধরে ভাবনার কূল-কিনারা না পেয়ে স্থির কবলাম স্বয়ং লেখিকার কাছে গিয়ে পরামর্শ নেওয়া যাক। প্রয়োজন হলে তাঁর সাহায্যে ও পুস্তক বিক্রেতাদের মধ্যস্থতায় যতগুলো সম্ভব বই নষ্ট করা যাবে।

এখানেও অপ্রত্যাশিত-রূপে দৈবের সাহায্য পাওয়া গেল।

কয়েক দিন হাঁটাহাঁটির পর সত্যই একদিন লেখিকার সাক্ষাৎ মিললো, এবং আমায় দেখামাত্র তিনি নিজেই বললেন—আমরা খুব জোর বেঁচে গেছি।

অর্থাৎ!

অর্থাৎ একখানি বইও বেঁচে নেই।

তাঁর মুখ থেকে যে গ্রন্থ-যজ্ঞের বিবরণ শুনলাম তা সংক্ষেপে এই ঃ

পোল ভাষায় মহাত্মা গান্ধীর জীবনী সেই প্রথম। সুতরাং বইথানির বিক্রয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে প্রকাশক ও-দেশের সাধারণ মুদ্রণ-সংখ্যার চতুর্গুণ পরিমাণে বইখানিকে ছাপিয়ে ফেলেছিলেন। ছাপানো তৈরী, বহু অগ্রিম ফরমাইস সরবরাহ করবার ব্যবস্থাও ঠিক হয়ে গেছে, বইয়ের দোকান থেকে ঘন ঘন তাগিদের টেলিফোন আসে, দফ্‌তুরীর কাজ হয়ে গেলেই বাজারে ছাড়া হবে। এমন সময়ে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তখনও জার্মানদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের তিক্ত মনোভাবের সুবিধা নিয়ে বইথানি যে কয়েক মাসের মধ্যেই বিক্রী হয়ে যাবে এই ভেবে প্রকাশক আপন মুনাফার স্বপ্নে মশ্‌গুল। কিন্তু কয়েকদিন পরেই শহর ছেড়ে হাজারে হাজারে লোক যখন চলে যেতে বাধ্য হলো তখন প্রকাশকের স্বপ্ন ভাঙলো। জার্মানরা শহরের একেবারে দোর গোড়ায় এসে পড়েছে, তখন স্বয়ং প্রকাশকও অন্য সবার সঙ্গে শহর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন।

অধীরভাবে জিজ্ঞেস করি—আর বইগুলোর কী হলো?

লেখিকা উত্তর দেন—সেই তো মজা। আমার মনেও সেই একই ভয়, বইগুলোর কী হবে? জার্মানরা ছাপাখানা-শুদ্ধ বইগুলোকে ধরে ফেললে আপনার আর আমার অবস্থা কী হতো তাই ভাবি।

আশা করি, আপনি বইগুলোকে নষ্ট করবার ব্যবস্থা করেছেন, কারণ বুঝতেই তো পারছেন, বিপদ আমাদের উভয়েরই···

বাধা দিয়ে লেখিকা বলেন—আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই। জার্মানদের কাজ জার্মানরা নিজেই করেছে। যুদ্ধের সময়ে বোমাবৃষ্টি মাথায় করে আমি প্রায়ই ঐ বন্ধ ছাপাখানাটার সামনে গিয়ে প্রার্থনা করতাম, হে ঈশ্বর জার্মানদের বোমা দিয়ে তুমি বইগুলোকে নষ্ট করে দাও। ছাপাখানায় প্রকাণ্ড তালার ওপর তালা, নিজে ঢুকে যে বইগুলো নষ্ট করবো সে উপায়ও নেই। শহরে যখন ভীষণ যুদ্ধ লেগেছে তখন একদিন সেখানে গিয়ে অবাক হয়ে দেখি আমার প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে। জার্মানদেব আর শহরে ঢোকবার দেরী নেই। তার আগেই জার্মানদেরই আগুনে বোমা পড়ে ছাপাখানাটাকে একটি নিখুঁত ভস্মস্তূপে পরিণত করেছে।

এতক্ষণ পরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। তবুও জিজ্ঞেস করি—একখানি বইও কি বেঁচে নেই?

ছাপা একখানিও না। তবে পাণ্ডুলিপি বেঁচেছে।

আপনার কাছে আছে?

আমার কাছে যেখানা ছিল তার জন্যে ভাবনা নেই। তা আমি যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মাটি খুঁড়ে পুঁতে ফেলেছি। তবে যেখানা প্রকাশকের কাছে ছিল সেই খানার জন্যেই ভাবনা।

এখন উপায়?

উপায় মানে ভাগ্য ভরসা। যুদ্ধের পরে প্রকাশকের কর্ম্মচারীদের কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছি ছাপাখানার পেছন দিকে গুদাম-ঘরে হাজার হাজার বাক্সে কাগজ ও অন্য পুরাণো পাণ্ডুলিপির মধ্যে সেখানিকে রেখে প্রকাশক শহর ছেড়ে চলে যান। পাণ্ডুলিপি এখন সেইখানেই। সময় মত ধীরে সুস্থে খানাতল্লাসী করবার অভিপ্রায়ে গেস্তাপোর লোকেরা সেই গুদাম-ঘরের দরজায় তালার ওপর তালা লাগিয়ে গেছে।

আমার ঐ আউস্ট্রীয় শুভানুধ্যায়ীটির সহায়তাতেই হোক বা মার্কিনী কনসুলাতের প্রভাবেই হোক দরখাস্ত পেশ করবার দু সপ্তাহ পরেই জার্ম্মান কাছারীর ছাপ মারা এক টুকরো কাগজের মার্ফতে আমাদের দুজনকেই পাস্‌স্‌-ষ্টেলেতে হাজির হতে বলা হলো। কয়েক দিন ধরে অপেক্ষমান জনতার লেজুড় অতিক্রম করে যখন বিক্ষিপ্ত চিত্ত ও কম্পিত কলেবরে সেই দুস্মের ৎসেয়াই বা দু-নম্বর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম তখন গম্ভীর বদন পাস্‌পর্ত্‌ অফিসারের রহস্যময় মুখভঙ্গি লক্ষ্য করে স্বদেশ-যাত্রা সম্বন্ধে যেটুকু আশা সঞ্চয় করেছিলাম তাও কর্পূরের মত আস্তে আস্তে উবে যেতে লাগলো। তারপর সুরু হলো জেরা। কী করি, কী খাই, গতকাল কার সঙ্গে দেখা হয়েছে? ওখানকার শীত আমার সহ্য হয় কিনা, ভারতীয় হয়েও ইংরেজী পড়াতাম কেন, দেশে গিয়ে করবো কি, এ যুদ্ধে কার জিত হবে বলে মনে হয়, সিনেমা দেখি কিনা, জার্মানদের আফিসে কাজের চেষ্টা করিনি কেন, আমায় অর্দ্ধ-বন্দী অবস্থায় রাখা হয়েছে কেন, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নে ছিন্নভিন্ন করেও যখন মনের মত জবাব পাওয়া গেল না, তখন আমাদের দরখাস্তে একটা করে ছাপ মেরে দিয়ে সেই

কুহেলিকাময় মুখোস পরা জার্মান অফিসারটি বললেন—আপনাদের এদেশ ছাড়ার যে বিশেষ আশা আছে তা তো মনে হয়না। তবুও আমি আপনাদের দরখাস্ত বের্লীনে পাঠাচ্ছি। হাইল্ হিট্‌লার!

স্বদেশ যাত্রার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে যখন আমরা বিষণ্ণচিত্তে পাস্‌স্-ষ্টেলে থে'কে বেরতে যাচ্ছি তখন হঠাৎ বারান্দায় সেই আউস্ট্রীয় কর্মচারীটির সঙ্গে দেখা হলো। তিনি চুপিচুপি বললেন—আপনারা চিন্তা করবেন না, আমার যথাসাধ্য আমি করবো। তারপর হঠাৎ চোখ টিপে খেঁকী গলায় যোগ করলেন—য়া য়া, আমায় দিক্ করে কোনো লাভ হবে না, বার্লিন থেকে জবাব এলে, খবর পাবেন, এখন যান্। যান্ আমায় বিরক্ত করবেন না। হাব্ কাইন্ ৎসাইট্, সময় নেই আমার, য়া য়া, হাইল্ হিট্‌লার!

আবার সপ্তাহ দুয়েক পরে ডাক পড়লো, পাস্‌স্-ষ্টেলেতে হাজির দিতে হবে। এবং আবার দিন দুই ধবে ভিড় ঠেলে সেই দুম্মের ৎসোয়াই ঘরে যখন হাজির হলাম তখন দেখলাম জার্মান অফিসারটির মুখের ভাব অনেকটা মানুষের মত। কখনো কখনো তাঁব মুখে হাসির রেখা দেখা যায়, বাক্যে কখনো কখনো কথঞ্চিৎ ভদ্রতা প্রকাশ হয়ে পড়ে, এমন কি মর্দনের অভিপ্রায়ে নিজের বোমশ, কড়া ও পেঁচালো হাতখানিও বাড়িয়ে দেন। চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বসতে অনুরোধ করে কয়েকবার চশমা মুছে, চিবুকে হাত বুলিয়ে বললেন—বের্লীন্ আপনাব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানতে চেয়েছেন।

সাহস করে বলি—বলুন, আমি আপনার প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দেবো।

যথাসাধ্য নয়, আপনাকে যথাযথ উত্তর দিতে হবে। আপনার উত্তরের উপর আপনার এ-দেশ ছাড়াবার অনুমতি তো বটেই, এমন কি আপনার এদেশে আংশিক স্বাধীনতাও নির্ভর করবে।

এতক্ষণ পরে লক্ষ্য করলাম ঘরের এক কোণে একটি খর্বাকার ব্যক্তি একখানা খবরের কাগজে আত্ম-সমাহিত অবস্থায় চেয়ারের দুপায়ে ভর করে দোল খাচ্ছেন। আমাদের কথোপকথনের দিকে যে তাঁর দুটি শশক কর্ণ সজাগ রয়েছে তা বুঝতে দেরী হলো না।

পাসপর্ত্-অফিসার সওয়াল করেন—বের্লীন্ জানতে চেয়েছেন প্রথমতঃ আপনি যদি এ-দেশ ছাড়বার অনুমতি লাভ করতে সমর্থ না হন তো ভবিষ্যতে জীবন-ধারণের উপায় কী ঠিক করেছেন ?

প্রশ্নের সারমর্ম গ্রহণ করতে দেরী হয় না। ওবা বলতে চায় দুটি কথা। এক, আমি 'ওদের তাঁবেয় মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডার কাজে যোগ দিতে রাজী কিনা। যদি সম্মত থাকি তো অবশ্য আমায় বার্লিনে চালান করে. তারই পরিধির মধ্যে এক অপূর্ব আজাদ হিন্দুস্থানে স্থান দিয়ে আমারই দেশের কাজে মুখ এবং কলম দুইই ছোটাতে অনুরোধ করা হবে। দুই যদি রাজী না থাকি তো আমায় দিয়ে দেশে লেখানো হবে, যেন আমার প্রতিপালনের জন্য বাড়ী থেকে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ এই উপায়ে যৎকিঞ্চিৎ বিদেশী অর্থ জার্মানীতে আমদানী করা যাবে। অবশ্য তাতে যে "রাইশ্ বাঙ্ক্" ফেঁপে উঠবে তা নয়, তবুও যতটুকু আসে। অন্য বহু বিদেশীদের সম্বন্ধেও ওরা ঐব্যবস্থাই অবলম্বন করেছে, আগেই শুনেছি। শুধু বিদেশী নয়, ওদেশের লোকদের মধ্যে অনেককে আপন আপন গ্রাসাচ্ছদনের জন্যে আমেরিকা বা অন্য দেশে প্রবাসী আত্মীয়-পরিজনের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করতে বাধ্য করা হয়েছে। সঙ্গতিহীন বয়স্থদের পেন্‌শন্ বন্ধ করে দিয়ে বলা হয়েছে, তোমার ছেলে বা জামাই বা ভাইপো বিদেশে আছে, তাকে টাকা পাঠাতে লেখো।

সুতরাং পূর্বোক্ত সওয়ালের জবাব দিতে দেরী হয় না।

বলি: যদি আমায় ছাড়া না হয় তো এখানে না খেয়েই মরতে হবে।

সওয়াল—আপনার মনে হয় না কি, এই সুবর্ণ সুযোগের ক্ষণে আপনার দেশের জন্য কাজ করা উচিৎ? এবং সে সুযোগ আপনি এখানে বসে যে রকম পাবেন তা ইংরেজদের কাছে ফিরে গেলে আপনার পাবার আশা নেই।

জবাব—আপনার প্রস্তাবে…

সওয়াল—মাফ্‌ করবেন, আমি কোনো প্রস্তাবই করি নি, শুধু এইটুকু আপনাকে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি যে, যদি আপনি যথার্থ দেশপ্রাণতায় প্রণোদিত হয়ে জার্মান সরকারের কাছে কোনো কাজের জন্য আবেদন করেন তো তা আমি হৃষ্টচিত্তে বের্লীনে পেশ করবো।

জবাব—আপনি যে ধরণের দেশের কাজের কথা বলছেন সে কাজের জন্যে আমি নিজেকে সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে করি। তা ছাড়া আমার বিদ্যার দৌড় শুধু ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য পর্যন্ত। তা দিয়ে কেউ কখনো দেশ উদ্ধার করেছে বলে আমাব জানা নেই।

সওয়াল—অর্থাৎ আপন রাজী নন্‌?

জবাব—এখানে রাজী-গররাজীর কথা ওঠে না। যে কাজে আমার সামর্থ্য নেই এবং যে কাজ আমি প্রাণ দিয়ে করতে পারবো না সে কাজের মূল্য আপনারা দেবেন না এবং আমিও তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করবো না। অবশ্য যদি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার জন্যে কোনো কাজ খালি থাকে তো তা নিতে আমার আপত্তি নেই।

সওয়াল—আপনার জবান-বন্দী আমি বের্লীনে পাঠাচ্ছি, এর পর বের্লীন যা স্থির করেন তাই হবে। এর মধ্যে যদি সকল দিক বিচার

করে আপনি মত পরিবর্তন করেন তো তৎক্ষণাৎ আমায় জানতে দ্বিধা বোধ করবেন না। হ্যাঁ, আর একটা কথা। আপনার যদি জীবন-ধারণের সংস্থান না থাকে এবং আপনি দেশে বা অন্য কোনো দেশে আপনার আত্মীয়, বন্ধু বা পরিচিতদের কাছে যদি সাহয্য প্রার্থনা করে চিঠি লেখেন তো তা যথাসত্বর তাঁদের কাছে পৌছে দেবার ব্যবস্থা আমরা করতে রাজী আছি। আজ আপনি যেতে পারেন। হাইল্‌ হিট্‌লার।

এর পর দেশে ফেরার কোনো সম্ভাবনাই মনে স্থান পায় না। তদন্তকারী পুলিসের লোকেরা এসে হেসে বলে, কী, হের্‌ ডক্টর, দেশে যাওয়ার গোছগাছ করছেন না যে বড়? সেখানে গিয়ে চিঠি লিখতে ভুলবেন না যেন, হা হা হা, বের্লীন যাতে আপনার রাহা-খরচেরও ব্যবস্থা করে দেয় তারও একটা দরখাস্ত করে দিন, ফর্ষ্টেহেন্‌ জী।

আবার সেই পচা আলু, পচা পেঁয়াজ আর পথের গলা বরফের কাদায় রুটির লাইন আর চারিপাশের মানুষের গভীর দীর্ঘশ্বাস। বসন্তের পুর্বাভাষের সঙ্গে মনে যে আশার মাদকতা জেগেছিল এখন তা নেশা ছুটে যাওয়ার অবসাদে পরিণত হলো।

কদিন থেকে সূর্যের আলোয় অল্প তাপ অনুভব করা যাচ্ছে, আকাশ পরিষ্কার, ঘরের ভেতরে রাখা বহুদিনের সঙ্গী ঘুমন্ত আজ্যালিয়া গাছটায় হঠাৎ একটি অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। বাইরের বারান্দায় যে জলের কলটা এতদিন জমে বরফ হয়েছিল তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে। থেকে থেকে ছাদের ওপর জমে-থাকা বরফের চাঁই গুলোর টুকরো টুকরো গড়ানে ছাদ বেয়ে ছোট ছোট হিম-শিলার মত পিছলে উঠোনে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

সকাল থেকে পথে বেরবার জন্যে মন অস্থির হয়ে ওঠে। পুলিশের লোকেরা এখনো আসে না। কাল কী খেয়েছি, কার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কোনো চিঠি পেয়েছ কিনা, জানা-শোনা কারো সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে কিনা, এই ধরণের কয়েকটা মামুলী প্রশ্নের উত্তরে একসঙ্গে প্রতিবার বলি "না"। ওরাও প্রতি প্রশ্নের ধারে বড় বড় অক্ষরে "না" লিখে সই করিয়ে নিয়ে যায়। আজ ওরা এখনো এলো না। হয়তো ওরা সবকটা ঘরে সেই মামুলী "না" বসিয়ে দিয়ে মদের ভাঁটিতে ঢুকেছে। অসহিষ্ণুতা দমন করতে না পেরে বাড়ীর সামনে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াই, যদি আসে তো পথেই "না" বলে দিয়ে তেল কেনবার ছুতো করে শহর ঘুরতে বেরবো।

বহুদিন পরে আবার যেন নিজেকে ফিরে পেলাম। চারিদিকে বসন্তের স্বর্ণাভ দিনের অভ্যর্থনা। পথ-চলা মানুষের বুকেও যেন আশার শিহরণ জেগেছে। রাস্তার বরফের কাদা সাফ-করা ইহুদী-ফৌজের বেগার খাটুনির মধ্যেও যেন শ্রমের আনন্দ। তুষার-মুক্ত গাছে গাছে হাজার হাজার চড়াই পাখীর ডাকে মনে হয় কে যেন চারিদিকে অবিরত ঘুঙুর বাজিয়ে চলেছে। নবাগত বসন্তের সে এক অদ্ভুত আহ্বান। জীবকে প্রাণবন্ত করে, ত্রস্তকে করে অকুতোভয়।

মনে হলো সেই একটি দিনের জন্যেও যেন আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। পায়ে পায়ে বাড়ী থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। ইস্কুল-পালানো ছাত্রের চোখে যেমন বহু পরিচিত পথ, পল্লী শুধু সেই একটি দিনের জন্যে গল্প-রাজ্যের মত রহস্যময় হয়ে ওঠে আমার চোখেও তেমনি কিসের ঘোর লেগেছে। ঐ ভাঙা, অবিশ্বাস্যরূপে বিধ্বস্ত শহরটাকে আর বাস্তব বলে মনে হয় না। তাই সেদিন যে-ঘটনাটাকে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করলাম, মনে হয় কোথায় কোন উপন্যাসে যেন তার বিবরণ পড়েছি, কিংবা তা যেন কী একটা ফিল্মের চিত্রময় গল্পাংশ মাত্র।

অনেকক্ষণ ধরে অন্যমনস্কভাবে পথ চলে ক্লান্ত হয়ে একটা চায়ের দোকানে ঢুকেছি। হাতে গরম হেরবাতুমের গেলাস ধরে আছি, অথচ সেই দোকানটাই যেন বাস্তব নয়। একটু দূরে একটা টেবিলে দু-জন মুখোমুখি বসে কিসের তর্ক করছে, একজন পোল আর একজন জার্মান অফিসার। তারাও যেন বাস্তব নয়। শুধু গল্প সাজাবার জন্যে যেন তাদের মুখোমুখি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তর্কের কথাগুলোও যেন সাজানো, ফিল্ম-ডিরেক্টরের কাঁচি-চালানো, হিসেব-করা। যেন এই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। আর আমার সামনে একটি যুদ্ধ বিষয়ক নাটক অভিনীত হচ্ছে। তর্কের শেষের দিকে শুনতে পেলাম পোল ভদ্রলোকটি

বলছেন—আপনি অভিশাপে বিশ্বাস করেন? যদি নাও করেন তবুও জানবেন, পোলজাতির সমবেত অভিশাপ আপনাদের বংশপরম্পরায় যুগ যুগান্তর ধরে অনুসরণ করবে।

হঠাৎ পিস্তলের আওয়াজ হলো। স্বপ্নাবিষ্টের মত দেখি জার্মান অফিসারটি উঠে চলে গেল। পোল ভদ্রলোকটি চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসে রয়েছেন। তাঁর দৃষ্টি স্থির, প্রাণহীন, তাতে আর রোষ বা অভিশাপ কিছুরই চিহ্নমাত্র নেই। জার্মান অফিসারটি সৃষ্টির নশ্বরতাকে সপ্রমাণ করে তর্কে জয়লাভ করে গেছে।

পণ্য ও অর্থ পরস্পর আপেক্ষিক বলেই এতদিন যে অর্থচিন্তা করতে হয় নি তার কারণ পণ্যের অভাবে অর্থেরও অভাব ঘটেনি। দৈনন্দিন সেই একপো রুটি এবং কদাচিৎ বোতলটাক সর্ষের তেল ছাড়া মাথা খুঁড়ে মরলেও আর কিছু কেনবার উপায় নেই। ক্রমে অদূর ভবিষ্যতে তারও অভাব ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিলে। তার ওপর একদিন বাড়ীওয়ালার লোক এসে ভাড়ার তাগিদ জানালে। আমি যে ঐ পোড়া বাড়ীর পেছন দিকের পাঁচতলার ওপর ঐ কফিনের আয়তনের ঘরখানিকে ভোগ দখল করছি সে-খবর কেমন করে বাড়ীওয়ালার কানে উঠেছে। তাছাড়া আমি যে মহারাজা-জাতীয় একটি হিন্দুস্ এই অনুমান করে ঘরখানির ন্যায্য ভাড়াকে তিনি দুই দিয়ে গুণ করে কয়েক মাসের পাওয়ানা ভাড়ার একখানি রসিদ পাঠিয়ে দিতেও ভোলেন নি।

অর্থাৎ আবার সেই সকল অনর্থের মূল অর্থকে উপার্জন করতে হবে। নচেৎ আস্তানা হতে নিষ্ক্রান্তি এবং তখন জামানরাও দয়াপরবশ হয়ে নিকটবর্তী কোনো কেন্দ্রীকরণ শিবিরে আস্তানা ঠিক করে দিতে দ্বিধা বোধ করবে না।

উপার্জনের পন্থাও প্রচুর, ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে তাকাও কাজের অভাব নেই। ভাঙা বাড়ী থেকে বেছে বেছে ইট উদ্ধার করা, রাস্তা

সাফ করা, পথের ধার থেকে মড়া খুঁড়ে বের করে ময়লার গাড়ী বোঝাই করা ইত্যাদি যাবতীয় পৌর কার্য তো আছেই, তাছাড়া শিক্ষিত লোকের একচেটে ব্যাবসা জানলার কাচ মেরামত করা, রেস্তোরাঁয় রেস্তহীন লেখক, চিত্রকর বা অভিনেতাদের দলে যোগ দিয়ে টেবিলে টেবিলে খাবার সরবরাহ করা, অথবা পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শহরের একমাত্র সরকার-পরিচালিত খবরের কাগজ ফেরি করা।

একদিন শহরে কাজ খুঁজতে বেরিয়ে যেসব তথ্য আবিষ্কার করলাম, তা তখনো আমার ঐ পোড়া বাড়ীর আস্তানায় এসে পৌঁছয় নি। এতদিন মনে করেছিলাম যদি ও-দেশ ছাড়তে আমায় না দেয়, এবং আমায় কেন্দ্রীকরণ শিবিরে পাঠানো না হয় তো জীবিকা উপার্জনের জন্যে অন্তত: মাষ্টারী করা কেউ কেড়ে নেবে না। সেদিন ছাত্র খুঁজতে বেরিয়ে সেই প্রথম জানতে পারলাম, ও-দেশে আমার একমাত্র মূলধন ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা পড়ানো বা অন্য কোনো উপায়ে বিস্তার করা শাস্তি-বিধেয় বলে ঘোষিত করা হয়েছে। সুতরাং সে ভাষা শেখবার ছাত্রের অভাব না থাকলেও পড়ালে উভয় পক্ষেরই বিপদ সমূহ। ওদেশে বিশ্ববিদ্যালয় তো নেইই, এমন কি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে যে পাড়ায় পাড়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল সেগুলোও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অনুসন্ধান করি, ঐসব ছেলেমেয়েদের বাড়ীতে বসে ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য, গণিত প্রভৃতি শেখানো চলবে কিনা। তারও উপায় নেই, ও-দেশে শিক্ষাদানও শাস্তি-বিধেয়। শুধু তা নয়, বাড়ী বাড়ী খানাতল্লাসী করে ছেলেদের প্রাথমিক বইগুলো পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে আরো জানা গেল যে, শহরের বইয়ের দোকান-গুলোর যে-কটা বাকি ছিল সেগুলোও একে একে বন্ধ হয়ে

যাচ্ছে। সমগ্র পোল সাহিত্যের যে-কথানা বই আইন-সঙ্গত-রূপে বিক্রয় করতে সরকারের বাধা নেই সে বইয়ের সম্বন্ধে শহরের মানুষের কোনো অনুসন্ধিৎসা নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক যে-কোনো ভাষায় যে-কোনো বই কেনা এবং বেচা দুইই শাস্তি-বিধেয়। একমাত্র বই যার বিক্রয়ে সরকারের কোনো বাধা নেই তা আদিরস সম্বন্ধীয় শস্তা নভেল এবং যতখুসী ডিটেক্টিভ উপন্যাস, অবশ্য ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় ছাড়া। সুতরাং জীবিকা-উপার্জনের যে শেষ আশা ছিল, বাণ্ডিলখানেক বই কাঁধে করে বাড়ী বাড়ী ফেরি করা যাবে সে আশাতেও জলাঞ্জলি দিতে হলো। ও-দিকে দেশের সর্বত্র বরফ গলতে শুরু হওয়াতে আমার সিন্দুকের জমে-যাওয়া পচা আলু ও পচা পেঁয়াজগুলোও গলে গিয়ে একেবারে অখাদ্য হয়ে উঠেছে।

ঠিক এই সময়ে একদিন ঘর গোছাতে গিয়ে চোখে পড়লো ঘরের এক দুর্গম কোণে একখানা উল্টো-করে-রাখা চেয়ারের ওপাশে প্রকাণ্ড একটা কাচের কুপোর খানিকটা কানা। নিজের সম্পত্তির সঙ্গে বহু দিন পরিচয় না থাকায় ওটা কুপো কিনা, এবং যদিই বা হয় তো ঐ কুপোতে কী থাকতে পারে তাই নিয়ে স্মৃতির আনাচে-কানাচে বহুক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজির পর হঠাৎ মনে পড়লো, গরমের ছুটীর সময়ে আচার প্রস্তুতে একটা এক্স্‌পেরিমেণ্ট্‌ করবার জন্যে একটা বড় কাচের কুপোয় সের পাঁচেক য়াগদা * আর সের তিনেক চিনি ভরে রেখেছিলাম। বাসা বদল করবার সময়ে দিদি সেটাকেও ফেলে রেখে আসেন নি।

কয়েক ঘণ্টা অবিরাম পরিশ্রম করার পর প্রায় সমস্ত ঘরখানাকে আবার বাইরে এনে অবশেষে চেয়ারখানার ঠেঙ ধরে যখন সরিয়ে দিলাম

* বঁইচের মত এক রকম কালো রঙের বন-ফল।

তখন আবিষ্কার করলাম সেই য়াগদা-ভরা কূপো, ছিপি আর গালা দিয়ে মুখ-আঁটা। বোতলটার গায়ে ইঞ্চিখানেক ধুলো পড়াতে ভেতরে কী আছে না আছে তাও দেখবার উপায় নেই। আবার ঘণ্টাখানেক নানা কারসাজির পর কুপোটাকে সত্যিই উদ্ধার করা গেল। সর্বাঙ্গে ধুলো মেখে অতি সন্তর্পণে পাঁজা-কোলা করে কুপোটাকে বার কয়েক মারাত্মক দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করে বারান্দাব কলতলায় এনে তার ওপর তোড়ে কল খুলে দিলাম। দেখতে দেখতে কুপোটার ভেতরে হাতখানেক পুরু য়াগাদার একটি গাঢ় উজ্জ্বল বেগুনী রঙের লোভনীয় স্তর আত্মপ্রকাশ করলে। এবং তার ওপর বিগৎখানেক উঁচু কী একটা জলীয় পদার্থ তরল সোণার মত চক্‌চক্ করছে। য়াগদাগুলো এত দিনে পচে গেছে কিনা দেখবার জন্য অসহিষ্ণুভাবে কুপোর ছিপিব চারিপাশের গালা খুলে ফেলতেই ছিপিটা খাস পিস্তলের গুলীর মত আওয়াজ করে এক লাফে ছাদে গিয়ে ঠেকলো। তারপর বেপরোয়াভাবে এক চামচ ঐ তরল পদার্থ মুখে ফেলে পরীক্ষা করতে গিয়ে আবিষ্কার করি, য়াগদা ও চিনির সংমিশ্রণে যে রস নির্গত হয়েছে তা প্রথম শ্রেণীর কাস্‌সি (cassis) † ছাড়া আর কিছু নয়। উক্ত পেয়কে রাজা-রাজড়ার বাড়ীর বিবাহ বা জন্মোৎসবে অসঙ্কোচে টেবিলে দেওয়া চলে।

মাসখানেকের জন্যে অন্ন-সমস্যারসমাধান হয়ে গেল। সেই দৈনন্দিন এক পো রুটিতে মাখাই য়াগদার জ্যাম্ আর আধ কাপ তীব্র কাস্‌সির সঙ্গে আধ কাপ গরম জল মিশিয়ে তৈরী হয় উৎকৃষ্ট গরম মদ যা লুই চতুর্দশের অতি প্রিয় পেয়রূপে ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ।

† ফরাসী ব্ল্যাক-বেরীর মদ।

ইতোমধ্যে বিধি সদয় হলেন। পাস্‌স্‌-ষ্টেলে থেকে একটুকরো ফিকে নীল কাগজের মার্ফতে জানানো হয়েছে, আমি যেন তৎক্ষণাৎ উক্ত আফিসে হাজির হই, আমার স্বদেশ-যাত্রা সম্বন্ধে এক জরুরি খবর আমার অপেক্ষা করছে। কাগজের ওপর "তৎক্ষণাৎ" লেখা থাকলেও সরকার সকাশে পৌঁছতে অন্ততঃ দু-দিন লাগে। এক্ষেত্রে পাঁচ দিন লেগে গেল। কারণ দু দিন ভিড় ঠেলে পাস্‌স্‌-ষ্টেলেতে উপস্থিত হয়ে জানা গেল, পাস্‌স্‌ষ্টেলের চিহ্নমাত্র সে-তল্লাটে নেই, শহরের আর এক জায়গায় আফিস উঠে গেছে। তারপর ঠিকানা মত সেখানে গিয়ে দেখা গেল সে-আফিসে ঢোকবার আশা-ভরসা বিশেষ নেই। সমস্ত পাড়া জুড়ে সারি দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে গেছে, হাজার রকমের "আউস্‌ভাইস্‌" বা অনুমতিপত্র এইখানেই বিলি করা হচ্ছে, এবং সে অনুমতির প্রয়োজন প্রতি পদে।

আরো তিন দিন পথে অতিবাহিত করে যখন অবশেষে সেই পাস্‌পর্ত্‌-অফিসারের সম্মুখীন হলাম তখন তিনি একেবারে ঢালোয়া হৃদ্যতার সহিত হস্তমর্দন করে বললেন—ভাব্‌ছিলাম, আপনি বুঝি মত পরিবর্তন করেছেন। যাই হোক, শুনে সুখী হবেন, আপনার স্বদেশ-যাত্রা সম্বন্ধে বের্লীনের কোনো আপত্তি নেই; অবশ্য যদি ভারশৌ পোলিৎসাই-

এর (পুলিসের) তরফ থেকে কোনো বাধা না থাকে। এখন আপনার কর্তব্য এই : প্রথমতঃ গেস্তাপোর কাছ থেকে একখানি ফরম সই করিয়ে আনা যে তাদের আপনার যাওয়া সম্বন্ধে কোনো আপত্তি নেই। দ্বিতীয়তঃ, রাজকর-বিভাগ থেকে আর একখানি ফরম সই করিয়ে আনা যে আপনার কাছে কারো কিছু পাওনা নেই। এবং তৃতীয়তঃ বের্লীনের দেভীজেন্‌-ষ্টেলেতে * দরখাস্ত করা, যেন আপনার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সঙ্গে নিতে অনুমতি দেওয়া হয়।

সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করি—পথের খরচের জন্যে কিছু সঙ্গে নেওয়া যাবে কী ?

অবশ্য, দশ মার্ক †। তা এদেশ ছাড়বার অনুমতির সঙ্গেই আপনার পাস্‌পর্তে লেখা থাকবে।

দশ মার্কে কতদূর যাওয়া যাবে বলে আপনার মনে হয় ?

সে-সমস্যার সমাধান আপনাকেই করতে হবে। তাছাড়া যতদূর মনে পড়ে আপনি আগেই জানিয়াছেন, আপনার এদেশে জীবন-ধারণেরই সঙ্গতি নেই। সুতরাং অনুমান করি, এর মধ্যে এমন কোনো মূলধন আপনার হাতে জমে নি যার মায়া কাটানো আপনার পক্ষে অসম্ভব হবে।

আমতা আমতা করে বলি, যুদ্ধের আগে বাঙ্কে যে টাকা ছিল তার কিছু অংশও যদি সঙ্গে নেবার অনুমতি দেওয়া হয় তো নির্ঝঞ্ঝাটে দেশে পৌঁছতে পারা যায়, এই আর কী।

হো হো, আপনি এখনো সে টাকা ফিরে পাবার আশা পুষে রেখেছেন দেখছি। যুদ্ধের আগের টাকা এবং যুদ্ধের পরের টাকার

* বৈদেশিক অর্থ বিভাগ। † ৮৲।

পার্থক্য এখনো হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি, এইটুকুই আশ্চর্য! ও-সব পুরোনো কথা নিয়ে মন খারাপ করবেন না। এখন কী কী জিনিষ সঙ্গে নিতে চান্‌ তারই একটি তালিকা যথাসত্বর দেভীজেন্‌-ষ্টেলেতে পেশ্‌ করুন।

এইবার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করি—আমার সঙ্গিনীর পাস্‌পর্ট্‌ পেতে দেরী হবে কী?

ওহ্‌ য়া। ফ্রয়্‌লাইনের কথা আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। এ-দেশ থেকে স্ত্রীলোকদের ছেড়ে দিতে আমাদের কোনো আপত্তিই নেই। ওঁর যাওয়ার অনুমতি এখান থেকেই পাওয়া যাবে, অবশ্য যদি সে-বিষয়ে গেস্তাপোর কোনো বাধা না থাকে।—এই বলে আমাদের দুজনকার জন্যেই প্রয়োজন "দুখানি" গেস্তাপোর ফরম হাতে দিয়ে ক্রূর স্মিত হাস্যে বিদায় জানালেন—হাইল্‌ হিট্‌লার্‌।

বেরবার পথে করিডরে আবার সেই আউস্ত্রীয় ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হলো। যেন এতক্ষণ আমাদেরই প্রতীক্ষা করছিলেন। আমাদের হাত থেকে গেস্তাপোর ফরম দু-খানা নিয়ে দেওয়ালের ওপর রেখে ভর্ত্তি এবং সই করিয়ে নিয়ে বললেন—গেস্তাপোর ছাপ সমেত ফরম দু-খানা আপনার ঠিকানায় যথাসময়ে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবো। আপনারা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী যান। এখন যত শীঘ্র পারেন দেভীজেন্‌-ষ্টেলেতে দরখাস্ত করে দিন।

ও-দেশ থেকে চলে আসবার সময় সঙ্গে নেবার মত যা সঞ্চয় করেছিলাম তার জন্যে রেলের গোটা একখানি বগীর প্রয়োজন হতো। বাড়ী ফিরে কী কী সঙ্গে নেবো তা বাছতে গিয়ে মনে হয় একটা জিনিষও ফেলে যেতে পারবো না। বিশেষ করে হাজার দেড়েক বইয়ের লাইব্রেরীটার ওপর এই কমাস ধরে শুয়ে বসে কেমন যেন ওটার ওপর মায়া বেড়ে গেছে। সত্যিই হাতের কাছে যখন তখন বইগুলোকে না পেলে আজ আমার মন ও স্নায়ুর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠতো। কঠোর নিঃসঙ্গতায় ছাপা লেখা প্রত্যেকটি শব্দ নিকট বন্ধুর জীবন্ত কণ্ঠস্বরের মত দিবারাত্রি শুনেছি। দুঃখের আখ্যানে তারা আমায় কাঁদিয়েছে, হাসির কথায় হাসিয়েছে, ওদের মুখে জ্ঞানের কথা শুনে কতবার বিক্ষিপ্ত চিত্তকে স্থির করেছি। চারিদিকের উন্মাদ নিষ্ঠুরতায় মন যখন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তখন এদেরই সঙ্গলাভ করে আবার প্রাক্‌সামরিক যুগের মানসিক অনুভূতি নিজের মধ্যে ফিরে পেয়েছি। আমি এদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। তবুও এদের ফেলে যেতে হবে।

প্রয়োজনীয় বলতে আর কী আছে? একটা ঘড়ি, একটা ক্যামেরা একটা টাইপরাইটার, আর পোষাক পরিচ্ছদ। লিষ্টি করতে বসি:

কুলটুব্‌কাম্‌প্‌ফ্‌

১ ঘড়ি (সোনার), ১ আংটি (সোনার), ১ টাইপ্‌রাইটার (করোনা), ১ ড্রেস্‌ স্যুট, ২ স্যুট (সাধারণ), ৪ জোড়া জুতা (চটি সমেত), ১ ডজন শার্ট ২ ডজন রুমাল, ৯ জোড়া মোজা, ৩ টুপী, ১০০ বই ইত্যাদি। তারপর গুরুচণ্ডালী ভাষায় একখানি দীর্ঘ আবেদন লিখে লিষ্টিসহ চিঠির বাক্সে অর্পণ করি। ও-দেশ থেকে ঐ অমূল্য দ্রব্যসামগ্রীগুলি বের করে নিয়ে গেলে যদি জার্মানী রাইশ্‌ বাংক্‌ ফেল না করে তবেই দেভ়ীজেন্‌-ষ্টেলে থেকে অনুমতি পাওয়া যাবে, সেগুলো সঙ্গে নিতে আপত্তি নেই।

হালীনার আবেদনেও যে অমূল্য সামগ্রীগুলির কথা লেখা ছিল, তার মধ্যে মনে পড়ে, এক ছড়া সরু হার (সোনার), দুটো আংটি (সোনার), একটি ঘড়ি (রূপোর), একটা ফার্‌-কোট ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেভ়ীজেন্‌ষ্টেলেতে দরখাস্ত পেশ করে আশা করা গেল, যখন আমাদের ও-দেশ থেকে ছেড়ে দিতেই আপত্তি নেই, তখন সঙ্গে ঐ সামান্য জিনিষগুলো নিতে দিতে কী বাধা থাকতে পারে? অথচ দিনের পর দিন যায়, বের্লীন্‌ নিরুত্তর। এবং দেভ়ীজেন-ষ্টেলের ছাড়পত্র না পাওয়া পর্যন্ত ও-দেশ ত্যাগ করবার অনুমতিলাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। শোনা গেল, খাস বের্লীনে পাস্‌স্‌-ষ্টেলে ও দেভ়ীজেন্‌ ষ্টেলেতে যেরকম মন কষাকষি তাতে দেভ়ীজেন্‌-ষ্টেলের পক্ষেও পাস্‌স্‌-ষ্টেলেকে খোঁচা মারবার জন্যে শেষোক্ত ষ্টেলের অনুমতিকে নাচক করে দেওয়া একটি মাত্র কলমের আঁচড় অপেক্ষা করে।

দেভ়ীজেন্‌-ষ্টেলের অনুজ্ঞার প্রতীক্ষা করতে করতে অবশেষে তিতিক্ষার বিচ্যুতি ঘটলো। স্থির করলাম, ও-দেশ থেকে ছাড়া পাই বা না পাই ঐ অতটুকু ঘরের মধ্যে চারিদিকে যে খুচরো সম্পত্তিগুলো দিন রাত আমার জীবন থেকে আলো-হাওয়ার অধিকার হরণ করছে, সেগুলোর হাত থেকে মুক্তিলাভ করতে হবে। সরকারী দৈনিকে

বিজ্ঞাপন দিলাম, অমুক ঠিকানায় গৃহস্থালীর বহু সামগ্রী স্বল্প মুল্যে বিক্রয় করা হবে।

বিজ্ঞাপন দিয়ে এসেই একটা হাত-গাড়ী ভাড়া করে বইগুলোকে দিদির বাড়ীতে তুলে দিয়ে এলাম। তারপর দুদিন সমস্ত দিন পরিশ্রম করে অনেকগুলো জিনিস করিডরে সাজিয়ে রাখা গেল, আর খুচরো জিনিষগুলোকে শ্রেণীবিভাগ করে ঘরের মধ্যেই সেগুলোকে এমনভাবে গুছিয়ে ফেললাম যে, কে বলবে ব্যবসাদারীতে আমার মাথা খেলে না?

তৃতীয় দিন ভোর থেকেই দরজার ওপর মুহুর্মুহু করাঘাত পড়তে লাগলো। খরিদ্দার এসেছে।

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে কিছু অভিজ্ঞতা * থাকলেও দোকানদারী আমার জীবনে সেই প্রথম। তাই খরিদ্দাররা কোনো জিনিষের দাম জিজ্ঞেস করলে বহুক্ষণ ভেবে পাই না, কী বলবো। যা দাম চাই তা মুখ ফুটে বলতেও বাধো বাধো ঠেকে। মনে হয় বলি, যা হয় দিন, যদি পয়সা না থাকে তো এমনিই নিয়ে যান। আমার কুণ্ঠা-বোধ লক্ষ্য করে সেই প্রত্যুষের ক্রেতার দল নাক কুঁচকে অত্যন্ত তাচ্ছল্যের স্বরে বলে—শুনুন পানিয়ে, এই সমস্ত আস্‌বাবপত্রের যে অবস্থা দেখছি তাতে তা মেবামত করতেই সর্বস্বান্ত হতে হবে। ধরুন এই সবগুলোর জন্যে যদি শ খানেক জ্‌লতী ধরে দি, তাহলে আপনার লোকসান হবে বলে মনে হয় না।—এই চক্ষুলর্জ্জাহীন প্রস্তাবে প্রথমে "না" বলতে সমীহ হয়। কিন্তু ওরা যে দাম দিতে চায় তা তখন চার বোতল সর্ষের তেলের দাম মাত্র। অল্পক্ষণ আমতা আমতা করে বলি—"না"। খরিদ্দার প্রচুর ভদ্রতার সঙ্গে

* সুইট্‌সারল্যাণ্ডে থাকবার সময়ে কিছুদিন লক্ষ্মীঠাকরুণের বান্দাগিরি করা গিয়েছিল, তারপর সরস্বতী ঠাকরুণের খপ্পরে পড়ে লক্ষ্মীসেবা ছেড়ে দিতে বাধ্য হই।

বিদায় গ্রহণ করে। আবার খানিকক্ষণ পরে দরজায় করাঘাত। আর একজন এসেছে। তারও ঐ একই দাম। এমনি করে খরিদ্দারের পর খরিদ্দার আসে। সবারই দাম হয় ৯০ না হয় ১১৫। সমস্ত সকাল ধরে দর-কষাকষি করে একটি জিনিষও বিক্রী করা গেল না।

তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কারো দেখা নেই। অবস্থা দেখে আফশোষ হয়, সকালের খরিদ্দারদের হাত ছাড়া করে ফেলে হয়তো ভালো করি নি। বিজ্ঞাপনের টাকা-কটাও উঠলো না।

দুপুরের দিকে ঘরখানাকে গরম করবার জন্যে প্রিয় ছাগীটিকে তোয়াজ করে চাঙ্গা করে তুলতে চেষ্টা করছি, এমন সময় দরজায় আবার করাঘাত। আবার খরিদ্দার এসেছে। কী চাই? তার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সে নিজেই বেছে নেয়। সকালের অভিজ্ঞতায় নিজে দর বলতে ইচ্ছে হয় না। বলি, যা হয় দিয়ে নিয়ে যান। সে প্রথমতঃ আমায় বাতুল ঠাওরায়, তারপর অনেকক্ষণ দ্বিধা করে দর দেয়। তার কথা শুনে আমারও মনে হয় সে বাতুল ছাড়া আর কিছু নয়। যে টেবিলটার দাম যুদ্ধের আগে ছিল ২০০ জ্লতী, তা এখন ব্যবহার-করা এবং যুদ্ধের সময়ে নাড়ানাড়িতে চোট-খাওয়া হলেও তার জন্যে সে অত্যন্ত সঙ্কোচে ৪০০ জ্লতী দিতে সম্মত। যে চেয়ারগুলোর দাম ছিল ১০ বা ১৫ জ্লতী তার জন্যে সে দিতে চায় ২০ বা ৩০। হাজার খানেক জ্লতীর পরিবর্তে আমার আসবাবপত্র যা ছিল গাড়ী বোঝাই করে মুখে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে বারংবার অভিবাদন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল। যাবার সময়ে আমার শোবার জন্য আলাদা করে রাখা দিভানখানাও বেচবার জন্যে বহু সাধাসাধি করে গেল। যা চাই সে তাই দিতে সম্মত। দু-শ পাঁচ-শ যা চাই। সে চলে যাবার পর হাজার

টাকার এক তাড়া নোট মেকী কিনা পরীক্ষা করবার জন্যে নীচে গিয়ে খানকয়েক ভাঙিয়ে দেখলাম সে টাকা আসল টাকা। যে-আসবাবের জন্যে সকালে ৯০ জলতী দর পেয়েছিলাম তা যে কী করে হাজার জ্‌লতীতে বেচা গেল সে-প্রশ্নের সমাধান করা গেল না যতক্ষণ না আর একজন খরিদ্দার এসে দরজায় করাঘাত করলে। তখন আর আসবাবের বিশেষ কিছু বাকী নেই, কিচেন্‌-টেব্‌ল্‌, কার্বার্ড্‌, টুল, ঝি'র খাট ঐ জাতীয় জিনিষ। যার দাম ন্যায্য হওয়া উচিৎ গোটা পঞ্চাশেক জলতী তাই শ খানেক জ্‌লতী দিয়ে কিনে মহা স্ফুর্তিতে সে বিদায় নিলে। এইবার বুঝতে পারলাম শহরে আসবাব নেই। যারা ব্যাবসা করে দু'পয়সা কামিয়েছে তারাও যে সংসার গুছিয়ে বসবে তারও উপায় নেই। তাই বিজ্ঞাপনে দেখলেই শহরের পয়সা-ওয়ালা লোকেরা যা হাতের কাছে পায় তাই কিনে নেয়। তাছাড়া টাকার মূলধনে আর কারো আস্থা নেই। কাজেই এই উপায়ে শহরের মানুষ মূলধনকে মালে পরিবর্তিত করছে। সকালে যারা দল বেঁধে এসেছিল তারা শহরের পূর্বকথিত হামস্ত্‌ভো। এক সঙ্গে সড় করে আস্‌বাবগুলো মাটির দরে কিনে সোনার দরে বেচে মোটা মুনাফার চেষ্টায় ছিল।

বিকেলের দিকে দলে দলে খরিদ্দার আসে। অবাক্‌ হয়ে দেখি আমার সংসারে এমন কোনো জিনিষ নেই যা কারো না কারো প্রয়োজন নয়। ইলেট্রিকের ইস্ত্রী, ল্যাম্প্‌, বাল্‌ব্‌, সুইচ, শেড, থালা, বাসন, ছুরী, কাঁটা, হাঁড়ি কুঁড়ি, হাতা-খুন্তী, ছাঁকনী, সব কিছুরই চাহিদা আছে। ঐ ছোট্ট ঘরখানা আর করিডরে লোক ধরে না। তারা নিজেদের মধ্যেও কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিয়েছে। শহরে কেনবার মত কোনো জিনিষই নেই, তাই বিজ্ঞাপন খুঁজে খুঁজে লোকে ঘর সংসারের জিনিষ কিনছে। ওরা ঘরের মেঝে থেকে যা পায় তাই কুড়িয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, এটার

কত দাম? চক্ষু মুদে যা মুখে আসে তাই বলে দি। সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজীর মত হাতে পয়সা এসে হাজির হয়। পানিয়ে, এই চাকী-বেলুনটার দর কত?—১০ জলতী (৫ টাকা)। তথাস্তু। পানিয়ে, এই সাড়াশীটার দর কত!—৫ জলতী! তথাস্তু। পানিয়ে, এই সুতোর গুলী আর ছুঁচ কটার জন্যে কত দিতে হবে?—৭ জ্লতী। তথাস্তু। আর এই চালুনীটার?—৫ জ্লতী। আর এই ইস্ক্রুপ-ড্রাইভারটার? ওটার হুঁ, কত আর দেবেন, ৮ জলতী। তথাস্তু। আর এই ছেঁড়া জুতো জোড়াটার?—হুঁ, ও-জোড়াটার দাম ১০। আর এই কাঁচিখানার? ১০। আর এই ইস্ক্রুপ আর পেরেক-কটার! ৫। আর এই ভাঙা সিন্দুকটার (পচা আলু আর পেঁয়াজ ভরা)? ওটার, এই কী বলে, হুঁ, ৬০ জলতী। রফা হয় পঞ্চাশে।

দোকানদারীতে তখন দিব্যি হাত পেকে গেছে। খুচরো জিনিষ বেচা শেষ হলে পুরোনো পোষাক বেচা শুরু হলো। দেখতে দেখতে যত বাজ্যের ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া পেন্টুলেন, ছেঁড়া মোজা, ছেঁড়া শার্ট, ছেঁড়া রুমাল যা আমার আগেকার ফ্ল্যাটে একটা বাক্সে ভরা ছিল রাস্তাব ভবঘুরে ডেকে বিলি করবার জন্যে অথবা ডাষ্টবিনে ফেলে দেবাব জন্য, এবং যা দিদি বাক্স-শুদ্ধই সরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, তারও খরিদ্দারের সংখ্যা দেখে অবাক্ হয়ে যাই। ছেঁড়া মোজাগুলো ৫ জলতী, রুমালগুলোব প্রত্যেকটা ১ জলতী, একটা ছেঁড়া সুটের বদলে হাতে আসে শ-খানেক।

সন্ধ্যের কিছু আগেই ঘরে আর কিছুই পড়ে রইলো না, শুধু দেশে যদি ফিরতে পারি তাহলে সঙ্গে নেবার যে পোষাকগুলো আলাদা করা ছিল সেগুলো বহুকষ্টে এই ক্রেতার পঙ্গপালের কবল থেকে বাঁচানো গেল। আর বাকী রইলো একটি ওভার-কোট যেটা দরজায় টাঙানো ছিল বলে দরজা খোলাতে এমন ভাবে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল যে তা কারো চোখে পড়ে নি।

পরের দিন হাজার তিনেক জ্‌লতী পকেটে ভরে যখন দিদির কাছে মহা আড়ম্বরে আমার পাকা ব্যবসাদারীর বিবরণ দিলাম, তখন দিদি গালে হাত দিয়ে বললেন—ও-ও মা, বলিস্‌ কিরে? তোর মতন বোকা দুনিয়ায় দুটো পাওয়া যাবে না। ঐ একঘর জিনিষ তুই কী বলে তিন হাজারে ছেড়ে দিলি বল্‌তো? আমাকে একবার বলতে হয়! আমায় ডাকলে পাঁচ হাজারের এক কানা কড়ি কম পেতিস্‌ না। দেখোদেখি কাণ্ড!

আজও দিদি "বেচারী" হিরণের ঐ হাজার দুয়েক জ্‌লতীর লোকসানের কথা ভুলতে পেরেছেন কিনা জানি না।

কয়েকদিন পরে মার্চের শেষাশেষি গেস্তাপোর ফরম-দুখানি ছাপ ও সই সমেত দুটি পোষ-মানা পায়রার মত আমার চিঠির খোপে ফিরে এলো। তারপর দিন কয়েক ধর্ণা দিয়ে রাজকর-বিভাগের কাছ থেকেও ছাড়পত্র পাওয়া গেল, ও-দেশে আমার কাছে কারো কিছু পাওনা নেই, যদিচ এখন মনে পড়ে, আগেকার ফ্ল্যাটের ইলেক্‌ট্রিকের বিল বাবদ আমার কাছে বেশ কিছু পাওনা ছিল। যাই হোক, ঐ অমূল্য কাগজগুলি সঙ্গে নিয়ে আবার পাস্‌স-ষ্টেলেতে হাজির হলাম।

পাস্‌পর্ত্‌-অফিসার আমাদের দেখেই বল্‌লেন—ভাগ্যিস এলেন! আপনার নিশ্চয় জানা ছিল না, বের্লীন থেকে আপনার এ-দেশ ত্যাগ করা সম্বন্ধে যে অনুমতি এসেছিল তা মার্চ মাসেই শেষ হয়ে যাবার কথা। যাওয়া সম্বন্ধে যদি আপনি সত্যই মতপরিবর্ত্তন করে থাকেন তাহলে অবশ্য অনুমতিপত্রখানি আপনার ধন্যবাদসহ বের্লীনে পাঠিয়ে দিতে আমার দিক থেকে কোনো আপত্তি নেই।

আজ্ঞে না। যেতে আমি এই মুহূর্তেই প্রস্তুত, এমন কি এই কদিনে আমার যথাসর্বস্ব আমি বিক্রী করে ফেলিছি। সঙ্গে নেবার মত জিনিষ-

পত্রও গোছানো হয়ে গেছে। এইবার দেভীজেন্‌ষ্টেলে থেকে ছাড়পত্র পেলেই বেরিয়ে পড়বো।

হুঁ। দেভীজেন্‌-ষ্টেলে। তাদের অনুমতি না পেলে যাওয়া হতেই পারে না। কী লিস্টি পাঠিয়েছেন একবার দেখতে পারি?

অবশ্য।

লিস্টির নকলখানার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই উক্ত পাস্‌পর্ত্‌ অফিসার বলে উঠলেন—হের গংৎ (ও হরি), করেছেন কী? এই সমস্ত কষ্ট্‌ব'রেন (মহামূল্য জিনিষ) সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছেন? তাই দেরী হচ্ছে। ওরা এই দেখে এমন চটেছে যে হয়তো আপনাকে কিছুই সঙ্গে নিতে দেবে না। (স্বর নামিয়ে) ওদের মত বদমাস্‌ সারা রাইখে পাবেন না মশায়। আপনাকে আর বলবো কী, জার্মানীতে তো আপনি গেছেন, সুতরাং নিজেই জানেন।

এখন উপায়?

তা আপনি স্থির করুন। এদিকে আজকালের মধ্যেই আপনার যাওয়া সম্বন্ধে বের্লীনের অনুমতি পাস্‌পর্তে লেখা না হলে আবার কত দিনে অনুমতি পাবেন তা বলা শক্ত। যদি আমার পরামর্শ চান তো তা এই। আপনি যখন এসেছেন তখন আজই ষ্ট্যাম্পের দাম দিয়ে পাস্‌পর্তে অনুমতি লিখিয়ে নিন্‌। অবশ্য তার সপ্তাহ দুয়ের মধ্যেই আপনাকে এদেশ ছাড়তে হবে। না গেলে আপনাকে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এইখানেই থাকতে হবে, তা বলাই বাহুল্য।

আচ্ছা আজই না হয় ষ্টাম্প-খরচা দিয়ে পাস্‌পর্তে অনুমতি লিখিয়ে নিলাম। কিন্তু আপনার অজ্ঞাত নেই যে আমার বাগ্‌দত্তার পাস্‌পর্ত্‌ না পেলে আমার এদেশ ছাড়বার বাসনা নেই।

ওহ্‌ য়া, ফ্রয়লাইনের পাস্‌পর্তের কথা এখনো কিছু ঠিক হয় নি। হুঁ।

আপনি তো আচ্ছা রোমান্টিশ্‌ মশায়! যাই হোক গেস্তাপোর অনুমতি যখন পেয়েছেন তখন ওর পাস্‌পর্ত্‌ পেতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। উনি যুদ্ধের আগে কী করতেন?

এ-প্রশ্ন যে উঠবে তা বহুদিন আগেই আশঙ্কা করেছিলাম, এবং তার উত্তরও বহুদিন ধরে মনে মনে সাজানো ছিল। বলি—উনি ছাত্রী ছিলেন, সে-কথা দরখাস্তেই লেখা হয়েছে।

হুঁ, লেখা হয়েছে তো দেখছি। কিন্তু উনি যে ছাত্রী ছিলেন তার কোনো প্রমাণ আছে কী?

অবশ্য।—কয়েক বছরের পুরোনো একখানি ফটো সমেত একখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনাক্তপত্র * সামনে মেলে ধরি।

হুঁ। কিন্তু এ যে অত্যন্ত পুরোনো। উনি এখনো ছাত্রী !!

এ ছাড়া আর কোনো সনাক্ত-পত্র ওঁর কাছে নেই। কাগজপত্র যা ছিল তা ইউনিভার্সিটির সঙ্গেই পুড়ে গেছে।

অচ্ছা, ওতেই হবে। আপনি এখন নিজের পাস্‌পর্তে অনুমতিটা লিখিয়ে নিন। ফ্রয়লাইনের খবর দিন কয়েক পরে আপনাকে জানাবো।

সেইদিনই ষ্ট্যাম্প খরচা দিয়ে আমার পাস্‌পর্তে অনুমতি লিখিয়ে নেওয়া গেল। আমার সঙ্গিনীর পাস্‌পর্ত্‌ এবং আমাদের উভয়েরই দেভীজেন্‌-ষ্টেলের ছাড়পত্র তখনো সুদূরপরাহত।

কয়েকদিন পরে আবার ফ্রয়লাইনের ডাক পড়লো, কয়েকটি বিষয়ে মুচলকা লিখে দিয়ে আর একখানি দরখাস্ত করতে হবে। মুচলকার সার মর্ম এই যে, তাঁর ওদেশে যা-কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে তার সমস্ত সত্ব

* ও-দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রীর কাছে একখানি আইডেন্টিটি-কার্ড থাকতো যার বদলে ট্রাম, ট্রেন, সিনেমা, থিয়েটার সর্বত্র কম দরে টিকিট পাওয়া যেত।

ফ্লুট্‌ব্‌কাম্‌প ফ্‌

সরকারকে অর্পণ করতে হবে। তথাস্তু। তিনি যে এই দেশ ছাড়ছেন, যুদ্ধের পরেও সে-দেশে ফেরবার কোনো অধিকারই তাঁর থাকবে না। তথাস্তু। মনে মনে অবশ্য "ইতি গজ" করে বলি, অবশ্য যদি ততদিনে ও-দেশে জার্মান রাজত্ব টিকে থাকে।

আবার দিন যায়, সপ্তাহ যায়, আমার অনুমতির তারিখ পার হয়ে যায়, তখনো দেভীজেন-ষ্টেলেরও উত্তর নেই এবং ফ্রয়লাইনেরও পাস্‌পর্তের দেখা নেই। অবশেষে পাস্‌-ষ্টেলে থেকে খবর পাওয়া গেল, ফ্রয়লাইনের পাস্‌পর্ত্‌ প্রায় তৈরী। হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে যাই। কিন্তু কোথায় পাস্‌পর্ত্‌? পাস্‌পর্তের বই তৈরী বটে কিন্তু তাতে যে-কোনো দেশের ভীজা বা প্রবেশাধিকার না পাওয়া গেলে সে-পাস্‌পর্তের কোনই মূল্য নেই।

আমার পাসপর্তের অনুমতির কী হবে?

হুঁ, তাও তো বটে। তবে একবার যখন অনুমতি পেয়েছেন তখন তা এই আফিস থেকেই আর দু-সপ্তাহের জন্যে বাড়িয়ে দিতে পারি। অবশ্য তার জন্যে আলাদা ষ্ট্যাম্প খরচ লাগবে।

তথাস্তু।

এখন আপনারা যে-কোনো কন্‌সুলাৎ থেকে ফ্রয়লাইনের জন্যে ভীজা জোগাড় করে নিয়ে এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অবশ্য দেভীজেন-ষ্টেলের কথা স্বতন্ত্র।

এতক্ষণ পরে মনে পড়লো ভার-শাএ তখন কোনো কন্‌সুলখানে-ই নেই। মার্কিনীরাও বার্লিনে চলে গেছে। হতাশ হয়ে জিজ্ঞাসা করি, ভীজা আনতে কি আপনি বার্লিন যেতে বলেন?

বের্লিনে গেলে অবশ্য কোনো হাঙ্গামাই থাকে না। কিন্তু সেখানে যেতে হলেও পাস্‌পর্ত্‌ চাই। খোঁজ নিয়ে দেখুন, হয়তো এখনো ইতালীয় কন্‌সুলাৎ এখান থেকে চলে যায় নি।

তৎক্ষণাৎ উঠি কি পড়ি করে ইতালীয় কন্‌সুলখানেয় গিয়ে হাজির হলাম। ভারশৌএর ফ্যাসানেব্‌ল্‌ পাড়ার চমৎকার একখানি বাড়ীতে ইতালীয় কন্‌সুলাৎ। চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সিঁড়ির ওপর দামী কার্পেট পাতা। শহরে যে এত বড় একটা যুদ্ধ ঘটে গেছে তার চিহ্নমাত্র এ বাড়ীখানার কোথাও চোখে পড়ে না, এমন কি জানলার কাচগুলো পর্যন্ত চিড় খায় নি। আশায় বুক বেঁধে দোতালায় কন্‌সুলের আফিসের সামনে এসে দেখি দরজা বন্ধ। অনেকক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করার পর একটি দারোয়ান বেরিয়ে এসে "হাত ঘুরোলে লাড়ু দেবো" ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বললে—ইল্‌ কন্‌সোলাতো এ কিউজো। সিঞর—কন্‌সুলাৎ বন্ধ হয়ে গেছে।

বলো কী হে?!

সি, সি, দু-দিন থেকে আর কোনো কাজই করছি না আমরা।

সিঞর কনসুল অবশ্য এখানেই আছেন?

সি, কিন্তু তিনি কারো সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না।

একবার গিয়ে বলো তো, একজন ইন্দিয়ানো প্রফেসরে এসেছেন। ভীষণ জরুরী, তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

লক্ষ্য করলাম, "ইন্দিয়ানো" কথাটা দারোয়ানের মনে ভেল্কি খেলিয়ে দিলে। যে ইন্দিয়ানোরা রসি-বাজি দেখায়, চক্ষু মুদে সূক্ষ্মদেহ গ্রহণ করে এক দেশ থেকে আর একদেশে বিচরণ করে, তাদেরই যে একজন কন্‌সুল সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে সে-বিষয়ে বোধ হয় তার মনে কোনো সন্দেহই রইলো না।

খানিক্ষণ পরে আবার দোর খুলে মোগলাই কায়দায় অভিবাদন করে বললে—প্রেগো, আসতে আজ্ঞা হোক।

কন্‌সুলখানে বন্ধ থাকলেও ভেতরে ভিড় কম জমে নি। যাদের

প্রয়োজন তারা আমাদেরই মত একটা না একটা ছুতো করে ঢুকে পড়েছে। এবং একবার ঢুকে পড়লে বের করা দেওয়া ইতালীয় ভদ্রতার কোডে লেখে না। তাই কন্‌সুলখানের কাজ বন্ধ হয়ে গেলেও বেচারী কন্‌সুল আগের মতই ব্যস্ত। কন্‌সুলের ঘরের সামনে কাতারে কাতারে লোক অপেক্ষা করছে। মুখের ছাঁদ আর চোখের শঠ দৃষ্টি দেখে সহজেই অনুমান করা যায় এরা ইহুদী. ইতালীয়দের ভদ্রতার সুবিধা নিয়ে ও-দেশ ছাড়বার আগে যথাসম্ভব বিষয়-সম্পত্তি সঙ্গে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে এসেছে। মাঝে মাঝে শুনতে পাই বেচারী কন্‌সুলের বিরক্তি-মেশানো কণ্ঠস্বর—না, না, ও-সব কাজ করতে আমায় অনুরোধ করবেন না। যান্‌, এ-বিষয়ে সাহায্য করা আমার দ্বারা হবে না।

এই রকম বিরক্তিকর আবহাওয়ায় আমার ভিজিটিং কার্ড তাঁর কাছে হয়তো কথঞ্চিৎ প্রীতিকর বলে বোধ হলো। তাই তাঁর নির্দেশে অন্য দরজা দিয়ে দারোয়ান আমাদের নিয়ে তাঁর সামনে হাজির করে দিলে।

তারপর চলে ঘণ্টাখানেক ধরে গল্প-গুজব। দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, কিছুই বাদ যায় না। অবশেষে তিনি প্রেমের কথা তুললেন। ভারতবর্ষে প্রেম বলতে আমরা কী বুঝি তাই তাঁর জ্ঞাতব্য। 'প্রসাধন, শৃঙ্গার প্রভৃতি, কামসূত্রের ব্যাখ্যায় যুবক কন্‌সুল কখনো উত্তেজিত, কখনো চমৎকৃত, কখনো কণ্টকিত হয়ে ওঠেন। তাঁর সুন্দর মুখশ্রীতে ক্ষণে ক্ষণে আবেগের রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরি আমার গাঁট-ধরা সিনিক মনেও মাঝে মাঝে যেন রস-সঞ্চার করে। তারপর শকুন্তলার গল্প, বিক্রমোর্বশীর গল্প, মেঘদূত, লয়লা-মজ্‌নু। সিঞর কন্‌সুল একেবার বাহ্যজ্ঞান-লুপ্ত। গল্প শেষ হলে কাজের কথা পাড়ি—আমার সঙ্গিনী এই সিঞরীনাটির * পাস্‌পর্তে ভীজ়া চাই।

* মাদ্‌মোয়াজেল্‌।

তিনি অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানান—ভীজ়া দেওয়া তাঁর অধিকারের বাইরে। সপ্তাহখানেক আগেই রোমের নির্দেশে ভীজ়া দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। এমন কি ভীজ়ার ছাপগুলো পর্যন্ত বাক্স-বন্দী করা হয়ে গেছে। তা না হলে ভীজ়া দিতে তাঁর কোনোই আপত্তি হতো না।

উত্তরে আমিও দুঃখ প্রকাশ করে বলি—তা হলে সিক্রীনাকে রেখে একলাই যেতে হবে। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উদ্বাহ-কার্যেরও কোনো সম্ভবনা নেই।

বাধা দিয়ে কনসুল বলেন—মাত্রিমনিও? † ভীজ়া না পেলে আপনাদের মাত্রিমনিও আটকে যাবে!! কোথায় মাত্রিমনিও করবার ঠিক করেছেন?

সেই কথাই তো আপনাকে জানাতে এসেছিলাম। আমাদের মাত্রিমনিও হবে ইতালীয়ায়।

বলেন কী? ইতালীয়ায়?

সি, সি, সিঞর।

তা হলে আপনাদের ভীজা না দিয়ে অবশ্য উপায় নেই। তাঁর কর্মচারীর নাম ধরে হাঁক ছাড়েন। তারপর হুকুম হয়, যেন বাক্স খুলে ভীজ়ার ছাপ বের করে সিঞরীনার জন্যে তন্মুহূর্তে একখানি ভীজাপত্র তৈরী করে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে যেন রোমা-য় একখানি টেলিগ্রাম করে দেওয়া হয় যে, সিঞরীনাকে ভীজ়া দেওয়া হয়েছে per considerzione straordinario. (বিশেষ কারণে)।

† বিবাহ।

এইবার ফ্রয়লাইনের পাসপর্ত্ পেতে আর কোনো বাধা নেই। এবং যথারীতি দক্ষিণা দিয়ে পাস্পর্ত্খানি যখন সত্যিই হাতে পাওয়া গেল তখনো আমরা নির্দিষ্ট দিনে ওদেশ ছাড়তে পারবো কিনা সে বিষয়ে কোনোরূপই আশ্বাস পাওয়া গেল না। দেভীজেন ষ্টেলে পূর্বের মতই নিরুত্তর। তাছাড়া পাস্পর্ত্ পাওয়া গেলেও ভারশৌ থেকে ট্রেন পাওয়া যাবে কিনা তারও কোনো স্থিরতা নেই। যুদ্ধের সময়ে ও-দেশে যে-সব রেলের লাইন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেগুলো মেরামত করা হচ্ছে সে খবর কাগজে প্রায়ই পড়তাম বটে, তবে ভারশৌ থেকে জার্মানীর বাইরে যাবার কোনো পথ খোলা হয়েছে কিনা সে খবর কেউ দিতে পারে না। প্রত্যহ ষ্টেশনে গিয়ে খবর নিই, ভারশৌ-ভিয়েনার লাইনটা খোলা হয়েছে কিনা। উত্তরে শুনি, ফৌজ যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে বটে, কিন্তু বেসামরিকদের যাওয়ার কী ব্যবস্থা হয়েছে সে কথা বের্লীন্ ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না।

এই সমস্যারও সমাধান করে দেন পাস্‌স্-ষ্টেলের সেই আউস্ত্রীয় ভদ্রলোকটি। তাঁর নির্দেশ ও টেলিফোন অনুযায়ী জার্মান পরিচালিত রেলের হেড আফিসে গিয়ে আবেদন কবি, যেন আমাদের ইতালীয় বা সুইস্ সীমান্ত পর্যন্ত দুখানি টিকিটের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

সুইস্ সীমান্তের টিকিট চাইবার কারণ : কয়েকদিন আগে রেড-ক্রস্ মার্ফৎ আমাব বিশেষ একটি সুইস্ বন্ধু তাঁর ওখানে আসবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যেহেতু বহুকষ্টে জার্মানীব কোনো একটি সীমান্ত ষ্টেশন পর্যন্ত টিকিট কেনবার অনুমতি পাওয়া গেছে, এবং ইতালিয়ায় আমার জানাশোনা কেউই নেই, তাই সীমান্ত পৌঁছে যে সুইস্ বন্ধুটির সাহায্য পাওয়া যেতে পারে সেও কম ভরসার কথা নয়। যাই হোক পাস্‌পর্ট প্রস্তুত, ভীসা প্রস্তুত, টিকিট কেনবার অনুমতি পর্যন্ত প্রস্তুত, তবুও টিকিট কেনবার কোনো স্থিরতা নেই। রেলের হেড্ আফিসে গিয়ে শুনলাম, টিকিট কেনা চলতে পারে, অবশ্য যদি একখানি সার্টিফিকেট জোগাড় করি যাতে লেখা থাকবে আমরা আর্য। কারণ কয়েক দিনের মধ্যেই যে একখানা বেসামরিক গাড়ী ভারশৌ থেকে ভিয়েনায় যাবে তাতে আর্য ব্যতীত আর কারো ভ্রমণ করবাব অধিকাব নেই।

আবার আধ ঘণ্টা ধরে অভিনয় করতে হয়। আর্য! কী রকম আর্য হওয়া চাই? কর্তার কী জানা আছে, আর্যদেব আদিবাস হচ্ছে ভারতবর্ষ? সুতরাং যদি সেই ট্রেনখানি যথার্থই আর্যদের জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তো আমার চেয়ে আর্য তাবা পাবে কোথায়? ঋ-ধাতুর যত রকম হেরফেব হতে পাবে প্র-পরা-উপ-সম যোগ করে, ণ্যৎ, ক্ত যোগ করে, যে প্রকারের যে আকারেরই আর্য চাও তার প্রতীক হচ্ছি আমি!

এব পর আর সার্টিফিকেটেরও প্রয়োজন হয় না। ২৬শে এপ্রিল আর্যদের জন্যে নির্দিষ্ট ট্রেনে ভিয়েনা হয়ে সুইট্‌সারল্যাণ্ড্ যাবার জন্যে দু-খানি টিকিট কেনবার ছাপানো আউস্‌ভাইস্ হাতে পেয়ে সেই প্রথম মনে হলো, কয়েকদিন পরেই হয়তো সত্যিই ট্রেনে চড়ে বসবো।

এতদিন পরে দেভীজ্জেন-ষ্টেলেরও মৌনব্রত ভঙ্গ হলো। আমার

আবেদনের উত্তর এসেছে, যদিও যা যা সঙ্গে নিতে চেয়েছিলাম তার বেশীর ভাগই কেটে ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়েছে। সোনা-দানার কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, এমন কি পোষাক-পরিচ্ছদেরও বহু জিনিষ সঙ্গে নেওয়া চলবে না। ড্রেস-স্যুট নয়, জুতো দু জোড়ার বেশী নয়, মোজা চার জোড়া, রুমাল এক ডজন, শার্ট্‌ চারটে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার সঙ্গিনীর আবেদনের উত্তর পর্যন্ত আসেনি। অর্থাৎ অনুমান করা গেল, তিনি কিছুই সঙ্গে নিতে পারবেন না। এক বস্ত্রে যদি দেশ ছাড়তে রাজী থাকেন তো ভালোই, নচেৎ তাঁর গিয়ে কাজ নেই।

এইখানে ইহুদীদের পরামর্শ আমাদের সঙ্কট থেকে উদ্ধার করলে। খবর পাওয়া গেল, একটি জার্মান শুল্ক কর্মচারী যৎকিঞ্চিৎ পারিশ্রমিকের পরিবর্তে বন্ধ বাক্সের চারিদিকে দড়ি বেঁধে শিষে দিয়ে শীল করে দিতে রাজী আছেন, যে-শীল সীমান্ত অতিক্রম না করা পর্যন্ত খোলা যাতে না হয় সে বন্দোবস্ত রেল ও অন্যান্য শুল্ক-কর্মচারীদের সঙ্গেই তাঁর করা আছে। আমাদের কর্তব্য শুধু জিনিষপত্র বাক্সে বন্ধ করে, অবশ্য হীবে জহরৎ যেন না ভরা হয়, উক্ত কর্মচারীর দক্ষিণা সমেত তাঁর এক ইহুদী অনুচরের হাতে পৌছে দেওয়া। দক্ষিণাটি যে বেশ মোটা রকম তা বলাই বাহুল্য।

অবস্থা বিচার করে এই উৎকোচ দেওয়া ছাড়া যখন উপায় নেই, তখন তাতেই রাজী হওয়া গেল। আমারই বাক্সগুলোর তলায় পূর্বোক্ত কণ্ঠ্‌হারেন বা মহামূল্য দ্রব্যগুলি সাজিয়ে রেখে তা অনুচর হস্তে অর্পণ করলাম। তা ছাড়া দুটি এ্যাটাচি কেসে এমন কতকগুলো জিনিষ সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা করলাম, যা নিয়ে যেতে না দিলে সীমান্তেই ফেলে রাখা চলবে। এই সূত্রে জার্মান সরকারের প্রতি এটুকু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা অসঙ্গত হবে না যে, ৫০খানি বই সঙ্গে নেবার অনুমতি

তাঁরা অসঙ্কোচে দান করেছিলেন। এবং এই বইগুলোর প্রসাদেই কতকগুলো আপত্তিজনক ছবি নীরাপদে সঙ্গে আনতে সমর্থ হই।

যাত্রার সকল ব্যবস্থাই ঠিক হয়ে গেছে। শুধু সেই ২৬শে এপ্রিলের নির্দিষ্ট আর্য-রথের প্রতীক্ষা। এমন সময়ে আবিষ্কার করলাম, যাত্রার তোড়জোড় করতে করতে কোন্ কালে সেই তিন হাজার জ্‌লতী খরচ হয়ে গেছে। রাহা-খরচের জন্যে যে দশ মার্ক্ কিনতে হবে তারও সংস্থান নেই, এই শেষ কদিন জীবনধারণের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক্।

সমস্থার সমাধান করে দরজার গায়ে ঝোলানো পুরোনো ওভার-কোটটি যেটি সেদিন ক্রেতার পঙ্গপালের দৃষ্টি এড়িয়ে আত্মরক্ষা করেছিল। নীচের উঠোনে নিয়ে গিয়ে ঘণ্টাখানেক ধরে আছড়ে এবং লাঠিপেটা করে তার যে চেহারা দাঁড় করানো গেল তাতে তাকে যে-কোনো ভদ্র-লোকের হাতে তুলে দিতে দ্বিধা বোধ হয় না। ঘাড়ের কাছে ফারের কলারটায় মুঠো মুঠো মথ্ বাসা বেঁধেছিল, সেগুলো কয়েকবার আছাড় দিতেই একরাশ বাদলা পোকার মত উড়ে গেল। ফারগুলোকে চিরুণী ব্রুস্ লাগাতে লাগাতে সমস্ত কলারটা একটি আস্ত পোষা কালো স্পেনিয়েলের মত মসৃণ হয়ে উঠলো। এইবার তাকে অনায়াসে মোটা মুনাফায় বেচা চলতে পারে।

তখন আর বাজারে বিজ্ঞাপন দিয়ে বেচবার সময় নেই, তাছাড়া সেই দিনই আমার রেস্তর প্রয়োজন এবং বিজ্ঞাপনের খরচও পকেটে নেই। জানা-শোনার মধ্যে কাউকে বেচা যায় কিনা খোঁজ করবার জন্যে মামুস্তার কাছে গিয়ে হাজির হই। মামুস্তা বলেন—চল্ এক কাজ করি, কেৎসেলাকে * গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কাউকে বেচে দিয়ে

* শহরের চোর-বাজার জাতীয় একটি পুরোনো জিনিষের হাট।

আসি। এখন শহরে দলে দলে পয়সাওয়ালা চাষারা সওদা করতে আসছে, হয়তো তাদেরই কারো পছন্দ হয়ে যাবে।

ঐ বয়েসে মামুস্তার সাহস দেখে অবাক হয়ে যাই। বলি—ন মামুস্ত্য, আপনি থাকুন, আমিই যাচ্ছি।

বাজে বকিস্ নি, তুই একবার তোর সর্বস্ব বেচে যে ঠকানটা ঠকেছিস্ তাতে তুই বেচবার নাম করচিস্ কোন্ মুখে রে? তোকে আর একটুও বিশ্বাস হয় না। চল্ তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিয়ে বেরোনো যাক্।

এই সঙ্গে স্থির হলো, হালীনাও তার একটা ফাল্‌তু পুরোনো ওভারকোট সঙ্গে নেবে। কেৎর্সেলাকে তিনজনে ফেরী করে ওভারকোট ছুটো বেচে প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়ে বাড়ী ফেরা যাবে। শেষবার আপত্তি জানাই, হালীনাই যখন সঙ্গে যাচ্ছে তখন মামুস্তার যাবার দরকার কী?

মামুস্তা আপত্তি খণ্ডন করেন—বুড়ো হলেও তোদের চেয়েও এখনো ঢের সহ্য করতে পারি রে, তোরা একটা যুদ্ধ দেখলি, আর আমি দেখলাম একটা বিদ্রোহ, † আর ছুটো যুদ্ধ। তাছাড়া আমার বাপু ও-সব ছুঁই-ছুঁই নেই। চুরি করতে যাচ্চি নে, ডাকাতি করতে যাচ্চিনে, নিজের জিনিষ হাটে বেচতে যাচ্চি, তাতে লজ্জা কিসের শুনি? চল্।

ছুটো ওভারকোট কাঁধে ফেলে আমরা শহরের শেষ প্রান্তে কেৎর্সেলাকে গিয়ে হাজির হলাম। চারিদিকে ভাঙা আর পোড়া বাড়ী। এদিকটায় সরকারের এখনো চোখ পড়ে নি। তাই ভগ্ন-ও ভস্মস্তূপগুলো ঠিক যুদ্ধের সময়কার মতই পড়ে আছে। পথের ওপর রাবিশের গাদা, তার নীচেই বরফ গলে

† ১৯০৫ সালে রুশিয়ার বিরুদ্ধে পোলদের বিদ্রোহ।

হাঁটুর সমান পাঁক তৈরী হয়েছে। তার ওপরেই চলে ব্যবসা-বাণিজ্য। বে-আইনী রুটি, বে-আইনী মাংস, বে-আইনী চিনি থেকে আরম্ভ করে সব রকম জিনিষই কেনা-বেচা চলছে, এই জন্যই এর চোর বাজার নাম সার্থক। বিক্রেতাদের মধ্যে দু-শ্রেণীর লোক চোখে পড়ে। চাষা যারা গাঁ থেকে সামান্য সামান্য খাদ্য সামগ্রী লুকিয়ে বেচতে এনেছে, আর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক যাঁরা আমাদেরই মত আপন আপন পোষাক পরিচ্ছদ বা গৃহস্থালীর এটা-ওটা বেচে ঐ হাট থেকেই কিছু বেআইনী খাবার কিনতে এসেছেন।

সেই কাদার মধ্যেই একটি ছোট্ট এঁটেল মাটির দ্বীপ আবিষ্কার করে তার ওপর দাঁড়িয়ে আমরা তিনজনে বাণিজ্য শুরু করলাম। হাতে ওভারকোট ঝুলিয়ে মাথার টুপীটাকে একটু তেরচা করে বসিয়ে দিলাম। কর্ণবিবরে একটি আধলা এবং কর্ণপৃষ্ঠে একটি সিগারেট এঁটে দেওয়ার অপেক্ষা রইলো। এতেও আমার মুখ দিয়ে কথা বেরয় না। এদিকে দলে দলে খরিদ্দার আমাদের ওভারকোটগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে চলে যায়। আমরা ওগুলো বেচতে এনেছি কি কিনে কারো জন্যে অপেক্ষা করছি তা কেউই বুঝতে পারে না। অবশেষে একটি চাষা এসে অত্যন্ত সাহসভরে জিজ্ঞাসা করে—ঐ কোট দুটো কত দিয়ে কিনলাম?

এইবার মুখ ফুটে বলি— ওদুটো বেচতে এসেছি।

দাম কত?

মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে আর কী—পঞ্চাশ জ্‌লতী!

মামুস্তা আমায় চোখ রাঙিয়ে তাড়াতাড়ি বলেন—এইটার দু-শ আর এইটার তিন-শ।

দরে বনে না। তারপর অনেকক্ষণ আর কারো দেখা নেই।

আমাদের অবস্থা দেখে কাঁধে গোটা দুই বিছানার চাদর আর এক জোড়া পুরোনো জুতো হাতে নিয়ে একটি লোক এসে বলে—এমনি করেই আপনারা ব্যবসা করেছেন! তার কথায় শিক্ষিতের টান অতি সহজেই ধরা পড়ে। ভদ্রলোক উপদেশ দেন—হাঁকুন মশায় হাঁকুন, যেমন করে ফেরিওয়ালারা হাঁকে। আর কাদা বাঁচিয়ে ঐখানটিতে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে বরং বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম করুন। আপনাদের ঐ বাবুয়ানা দেখলে চাষারা কিছু কিনবে না মশায়, আপনাদের স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। ওরা চায় বাবুরা পাঁক ঠেলে ওদের সাধাসাধি করুক যেমন ওরা যুদ্ধের আগে করতো। তবেই ওদের যদি মন গলে। আসুন, নামুন ওখান থেকে

বীরদর্পে ঐ দ্বীপটি থেকে আমি সটান এক হাঁটু পাঁকে নেমে পড়লাম বটে, কিন্তু আমার গলশ জোড়াটা * আপন আভিজাত্য বজায় রাখলে, এঁটেল মাটি কামড়ে এমনভাবে পড়ে রইলো যে তাদের অনেক টানা-হেঁচড়া করেও সেখান থেকে এক পা নড়ানো গেল না। যাই হোক, এখন আর কোনোই সঙ্কোচ নেই। পাঁক ভেঙে ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে বাজার প্রদক্ষিণ করে বেড়াতে লাগলাম। তবুও মুখ দিয়ে কথা বেরয় না। ভদ্রলোক হাঁকেন—আরে, এই চললো চাদর, চললো জুতো, জলের দরে, লাও, লাও, লিয়ে যাও, সস্তা মাল।—আমার মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে বেরয়—কে ওভারকোট কিন্‌বে?—ভদ্রলোক বলেন—আসুন আপনাকে শিখিয়ে দি কী করে বেচতে হয়; কোটটাকে বাঁ হাঁতে ঝুলিয়ে ডান হাত দিয়ে ফারটার গায়ে হাত বুলোন, যেন ওটা আপনার পোষা বেরালটি, তারপর চোখ ঠেরে এত বড় হাঁ করে হাঁকুন—এই লিয়ে যাও, সস্তা, পাঁকের দরে ওভারকোট, চললো, চললো, চললো,

*জুতোর ওপরে পরবার রবারের বহিঃ-পাদুকা।

চলে গেলে আর পাবে না।—কয়েকবার চেষ্টা করতেই দিব্যি মুখ দিয়ে বেরতে লাগলো—চললো, চললো, চললো, চলে গেলে আর পাবে না।

এবার আমরা নিজেরাই দিব্যি পোক্ত হয়ে উঠলাম। চাষারাও অসঙ্কোচে এসে দাম জিজ্ঞাসা করে, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে ইয়ার্কি করতে চায়। ওভারকোট ড়ুটো এখনো বেচতে না পারলেও আশা হলো, সে ড়ুটো আর একটু ধৈর্য ধবে থাকলেই সন্ধ্যার আগে বেচা যাবে।

এর মধ্যে কেউ কেউ পরে দেখলে গায়ে হয় কি না, কেমন দেখাচ্ছে, ভেতবে ওম আছে কিনা। কিন্তু মামুস্তার দরে কেউ রাজী হয় না। দর করতে করতে এক একবার বাজী হতে যাই, মামুস্তা আমায় চোখ রাঙিয়ে বলেন—এটার দাম ড়ু-শ ওটার তিনশর একটি গ্রশ্ কম নয়।

ফেরী করতে করতে দেখি আমাদেরও মুখে সরস্বতী অবতরণ করেছেন। মুখে মুখে ছড়া বানানো হয়ে যায়—কমু, কমু, কমু?

—য়্যুঝ্ ইদৈ দ দমু। অর্থাৎ কে নেবে নাও; এইবার বাড়ী চললাম। ঠাট্টা-বটকেরাতেও আমরা কারো কাছে হার মানি না। ওভাবকোট ঘুরিয়ে হাঁকি—কে নেবে ওভারকোট, সল্ত্যিসেব * ওভারকোট! আর থেকে থেকে—কমু, কমু, কমু? য়্যুঝ্ ইদৈ দ দমু। ক্ষণে ক্ষণে মাথা খাটিয়ে নতুন নতুন মেঠো ইয়ার্কি বানাতে হয়। কখনো হাঁকি—রাতে পেতে শোও, দিনে গায়ে চড়াও, কম্বলীকে কম্বলী, কোট কে কোট। কখনো হাঁকি—বরের কোট, কনের কোট, এই চললো জোড়া কে জোড়া! কখনো হাঁকি—চোরাই মাল, শস্তা, শস্তা, চললো, চললো।

* সল্ত্যিস্—গাঁয়ের মোড়ল বা পাটেল।

সারাদিন বাণিজ্যের পর সন্ধ্যার দিকে সত্যিই ওভারকোট দুটো একটি সমৃদ্ধ কৃষক-দম্পতীর স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়া গেল। মামুষ্যার দু-শ আর তিনশ পাওয়া না গেলেও দুটোকে একসঙ্গে সাড়ে তিনশতে পাব করে দিলাম। যুদ্ধের আগে ও-দুটোব নূতন দাম এক শ কি দেড় শ-ব বেশী ছিল না।

টাকাগুলো গুণে নিয়ে পকেটে পুরতে গিয়ে উত্তেজনার বশে হঠাৎ পা পিছলে "শী"-করার ভঙ্গিতে সটান কাদায় চিৎপতিত হলাম, এবং হালীনা আমার উক্ত আচরণে বাধা দিতে গিয়ে অনুরূপ ভঙ্গি করে আমার হুবহু অনুকরণ করলে, লক্ষ্য করলাম।

এইবার—য়্যাঝ্‌. ইদেঁ দ দমু।

কর্দমাক্ত কলেবরেই দিদিকে সুখবরটা দিতে গিয়ে তাঁর ওখানেই আটকে পড়লাম। আমাদের চেহারা দেখে দিদি অনেক দিন পরে যে প্রাণ খুলে হাসতে পেলেন এইটুকুই সান্ত্বনা। অবশ্য হাসির জের সামলাতে হলো তাঁকেই। আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ছাড়িয়ে নিয়ে তন্মুহূর্তে স্নান করে আসতে হুকুম করলেন। তারপর চা খেতে বসতে বসতেই সাতটা বেজে গেল, এবং মামুস্তা, হালীনা ও আমার দিদির ফ্ল্যাটেই রাত কাটাবার ব্যবস্থা হলো। কয়েক দিন পরেই যে ও-দেশ ছেড়ে চলে যাবো সে কথাটা যেন বারে বারে মনে না পড়ে সেই জন্যে দিদি ইচ্ছে করেই আমাদের নিয়ে কোনো আড়ম্বর করলেন না। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে ক-জনে গল্প করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেল। তারপর আমার মাথায় হাত দিয়ে ঠিক আগেকার দিদির মতই আদর করে শুতে পাঠাতে গিয়ে বললেন—তোর গাটা কেমন ছেঁক্ ছেঁক্ করছে কেন রে ?

ও কিছু না, ঠাণ্ডা জলে চান করেছি কিনা তাই।

ঠাণ্ডা জলে মানে ? তুই যদি এই সন্ধেবেলা ঠাণ্ডা জলেই চান করবি তো আমি মরতে চায়ের জন্যে গরম-করা এক কেৎলী জল তোকে দিলাম কী জন্যে শুনি ?

চুপ করে থাকি। দিদি বলেন—এখন জ্বর না এলে হয়, দেখি থার্মোমিটার দিয়ে।

জবরদস্তি থার্মোমিটার দিয়ে দেখা গেল একশ দুয়ের ওপরে উঠে গেছে। সারাদিন কেৎসেলাকে পাক ভেঙে ঘুরে বাড়ী ফিরে সন্ধ্যাবেলা ঠাণ্ডা জলে স্নান করলে জ্বর আসা এমন কিছু আশ্চর্য নয়। দুটো এ্যাস্পিরিনের বড়ী ও গরম লেবুর জল গলাধঃকরণ করিয়ে দিদি যখন গর গর করতে করতে শুইয়ে দিয়ে গেলেন তখন বাহাদুরী করে বললাম, কাল সকালে রাঁধবার পালা আমার।

কিন্তু শেষ রাত্রের দিকে জ্বর ছাড়বার বদলে এমন ভাবে বেড়ে চললো যে সকালে যখন দিদি হাসিমুখে আমার খবর নিতে এলেন তখন তাঁকে চেনবার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই। জ্বরের ঘোরে মনে আছে, কে যেন আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসছে অথচ সে যে কে তা কিছুতেই মনে আসছে না। তারপর সারাদিন ধরে কী হলো জানি না। কয়েকবার দিদিকে যেন দেখেছি মনে হলো, আর একজন অচেনা লোক বিছানার ধারে বসে দাড়ীতে হাত বুলোতে বুলোতে দিদিকে কী বলছেন তাও মনে আছে। সন্ধ্যার দিকে যখন জ্ঞান হলো তখন দেখলাম আর একখানা খাটে দিদি শুয়ে আছেন। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন সকালে আমার জ্বর কমে গেলেও একেবারে ছাড়লো না। শরীর এমন দুর্বল হয়ে পড়েছে যে মনে হয় যেন এর মধ্যে ছ মাস রোগ ভোগ করা হয়ে গেছে। দিদি তেমনি খাটে শুয়ে আছেন : ইসারায় মামুস্তাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করি—দিদি শুয়ে কেন? মামুস্তা চুপি চুপি বলেন—ওর যেমন গোঁ, এখন ভুগুক! কাল তোর জন্যে ডাক্তার ডাকতে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে এলি বাপু, কাপড়চোপড় ছাড়, তা নয়, সটান জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোর সেই কাদা-মাখা স্যুটটা কাচলে।

তার ঘণ্টাখানেক পরেই জ্বর! ওদিক থেকে চিঁচিঁ স্বরে দিদি প্রতিবাদ করেন—হ্যাঁ, তোমার আর ব্যাখ্যানা করতে হবে না মামুস্ত্যু, ঢের হয়েছে। কাপড় কেচে জ্বর হয়েচে না হাতী! পৃথিবীতে জ্বর কার না হয় শুনি? তোমরা বাবু অমন ভ্যান্ ভ্যান্ করো না, আমায় স্বস্তিতে ঘুমোতে দাও। মরে গেলে গোর দিয়ে এসো, এখন অন্ততঃ স্বস্তিতে মরতে দাও।

দিদির মুখে ও ধরণের ভাষা আগে কখনো শুনিনি। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরেও তাঁর মুখে যে হাসি দেখেছি তাঁর মনের ভেতরকার সেই হাসির উৎসটিও যেন এই কদিনে শুকিয়ে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় একটি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, ইউনিভার্সিটির একটি অধ্যাপক ডাক্তার, অল্প বয়েস, ভারী সুন্দর ভাবভঙ্গি। তাঁর দাড়ী দেখে মনে পড়লো কোথায় যেন এর আগে তাঁকে দেখেছি। জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছি। তাঁর স্ত্রী আর মামুস্ত্যা যুদ্ধের সময়ে একই হাঁসপাতালে নার্স হয়েছিলেন, পরিচয় দিলেন। অনেকক্ষণ ধরে তাঁর হাবভাব আর দাড়ীতে হাত বুলোনোর ভঙ্গি লক্ষ্য করে মনে পড়লো, কাল জ্বরের ঘোরে এঁকেই দেখেছিলাম। আমার চিকিৎসার ভার এঁর হাতেই দেওয়া হয়েছে। বললেন—কলেগ,* কাল আপনি যে ভাবিয়েছিলেন! কিন্তু জ্বর আপনার এখনো ছাড়লো না তাই ভাবছি···

ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করি—কী ভাবছেন?

ভাবছি আপনার যাওয়া হবে কি না।

মানে? কতদিনে সারবো বলে মনে হয়?

আমাদের কলেজের এক্স রে-গুলো শ্বাব্রা তুলে নিয়ে গেছে, কাজেই

* একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে পরস্পরকে সম্বোধন করবার রীতি; Colleague বা বন্ধু।

আপনার বাঁ দিককার ফুস্‌ফুসটার ফটো না নিলে কিছুই বুঝতে পারছি না। যতদূর মনে হয় একটু যেন প্যাচের মত তৈরী হয়েছে। সেই জন্যেই জ্বর ছাড়ছে না।

অর্থাৎ আপনার সন্দেহ হয় টি, বি ?

না হতেও পারে। আমার অনুমান মাত্র।

সঙ্গেই ওষুধ এনেছিলেন। কয়েক খোরাক দিয়ে গেলেন। তিনি চলে যাবার পরে রাত্রে কাশি শুরু হলো, সঙ্গে সঙ্গে আবার জ্বর। দিদিকে আর বিছানায় রাখা যায় না। তিনি ধড়মড় করে উঠে বসে তাঁর দেশী টোটকার ব্যবস্থা করতে লেগে গেছেন। দেখি ঘরে আলো জ্বলছে, আর দিদি আর মামুস্যা টেবিলের ওপর একরাশ ছোট ছোট কাচের গেলাস সাজিয়ে রেখে পরামর্শ করছেন, কুড়িটা দেওয়া হবে কি পঞ্চাশটা দেওয়া হবে। ওদেশে শক্ত জ্বর বা কাশি সারাবার জন্যে ঐ ছোট ছোট গেলাসগুলো তাতিয়ে গায়ের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়। ঐ চিকিৎসার নাম বাঞ্কি লাগানো। ওঁরা তিন মায়ে-ঝিয়ে আমার গায়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঞ্কি লাগাবার ব্যবস্থা করেছেন। সারা রাত ধরে আমার বুকে পিঠে গোটা তিরিশেক বাঞ্কি লাগিয়ে দেওয়া হলো। ছোট ছোট কাচের গেলাসগুলো সারারাত জোঁকের মত আমায় কামড়ে ধরে রইলো। সকালবেলা ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল। শুনি দিদি আবার গরগর করছেন—টি, বি, না হাতী ! হতচ্ছাড়া, হাড়হাবাদে ডাক্তারটা বাছাটাকে মিছিমিছি ভয় দেখিয়ে গেল। কী ভাগ্যি আমায় দেখতে দিই নি। তাহলে আমাকেও টি, বি, বলে যেতো।

মামুস্যা বাধা দিয়ে বলেন—তুই বাপু আর বাহাদুরী করিস নে। জ্বর এখনো ছাড়েনি তা জানিস। যা, গিয়ে শো।

দিদি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন—আমি মরি বাঁচি, তা নিয়ে তোমাদের

মাথা ঘামাতে হবে না। ওরা কাল চলে যাবে, আর আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে নভেল পড়ি আর কী?

ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেদিন ২৫শে এপ্রিল। ২৬শে এপ্রিল পূর্বোক্ত আর্য-রথে চড়ে হিটলারী আর্যাবর্ত ত্যাগ করতে না পারলে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে আর সেখান থেকে বেরবার উপায় নেই। পাস্‌পর্তে্‌র ওপর ও-দেশ ছাড়বার অনুমতিকে যে দু-সপ্তাহের জন্যে বাড়িয়ে নেওয়া গিয়েছিল তারও শেষ দিন ৩০শে এপ্রিল। এবং এর মধ্যে আবার কবে গাড়ী পাওয়া যাবে তারও ঠিক নেই। তাছাড়া বারে বারে দিন বাড়িয়ে নিতে গেলে জার্মানদের ধারণা বদ্ধমূল হবে যে, আমি ও দেশে ইংরেজদের গোয়েন্দাগিরি করবার জন্যেই ইচ্ছে করে যুদ্ধের সময়ে আটকে পড়েছিলাম। এবং যাবার অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও নানা তথ্য সংগ্রহ করবার জন্যেই গড়িমাসি করছি। তাছাড়া মনে পড়লো, এর মধ্যে যদি গেস্তাপোর লোকেরা সেই ছাপাখানার দরজা খুলে আমার রচনার পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করে ফেলে তাহলে যাবার নামেও ইতি, এবং তারপর কতদিন এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ অবাধে উপভোগ করা যাবে তাও সন্দেহের বিষয়।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘোরে; তবুও চলাফেরা অভ্যেস করবার জন্যে যতটা পারি ঘরের মধ্যে পায়চারী করি। এবং আশ্চর্য এই যে, কয়েক ঘণ্টা পরে দেওয়াল ধরে ধরে নীচে গিয়ে চুল ছেঁটে যখন আবার ওপরে উঠে এলাম তখন নিজেকে অনেকটা স্বাভাবিক বোধ হতে লাগলো। এর মধ্যেই মামুস্যা আমার সেই pied-à-terreটি তুলে দিয়ে হাত বাক্স-দুটো এনে হাজির করেছেন। সারাদিন বারে বারে বাক্স গুছিয়ে প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় এবং স্বল্প-প্রয়োজনীয় জিনিষের মধ্যে যথাযথ প্রার্থক্য স্থির করতে না পেরে আবার জিনিষগুলো ছত্রাকার করে

ছড়িয়ে ফেলি, আবার চলে গোছানো, এটা বাদ দিয়ে ওটা, ওটার বদলে সেটা। বাদ-বাকী বাক্সগুলো শুল্ক-বিভাগে জমা করা আছে, এবং কয়েকদিন আগেও খবর পাওয়া গেছে, চিন্তার কোনো কারণ নেই।

ভারশৌএ আমাদের শেষ রাত্রি। আমাদের সঙ্গে গল্প করবারও দিদির সময় নেই। তাঁর ভাঁড়ারের শেষ ছাতা-পড়া ময়দা মেখে তৈরী হয় কেক্‌, বিস্কুট। সঙ্গে খাবার না দিলে আমরা খাবো কী? আমরা যে দু-দিন পরে এমন দেশে গিয়ে পৌছবো যেখানে ঘরে বিস্কুট তৈরী করতে হয় না, সে-কথা দিদি বিশ্বাস করতে চান না। অনেক বোঝালেও ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন—আমি তো সঙ্গে দেবো, তারপর তোরা না খাস, জানলা গলিয়ে ফেলে দিস্‌।—তারপর কী ভেবে আবার আগের মত হেসে বলেন—এগুলো খাবার সময়ে দিদির কথা মনে পড়বে তো রে? তাঁর চোখে জল টলটল করে, বলেন—আজকাল এমন অকর্মণ্য হয়ে পড়েচি যে শেষ ক'দিন যে প্রাণ পুরে খাওয়াবো তাও পারলাম না।—আমায় জোর করে শুতে পাঠিয়ে দিয়ে আবার কী কাজে মেতে গেলেন। সারা রাত যতবার চোখ খুলি, দেখি দূরে আলো জ্বলছে।

সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি সব তৈরী, আমার শার্টদুটো কাচা, ইস্তিরী করা, পেণ্টুলেন রিপু করা, জিনিষপত্র গোছানো। কবে দিদির কাছে আব্দার করেছিলাম, একটা মনিব্যাগে একটি ছোট্ট পেতলের ঘোড়ার ক্ষুর সেলাই করে বসিয়ে দিতে, সেটিও বাদ যায় নি। সকাল থেকেই দিদির মুখে আবার হাসি দেখা দিয়েছে। আমাদের কাছ থেকে তাঁর গায়ের জ্বরটাকে চাপা দেবার জন্যেই যে এই হাসির কারসাজি তা বুঝতে পারলেও একটা কথা পর্যন্ত বলবার সাহস জোগায় না। তাঁর আদেশ মত আমরা খাই, বিশ্রাম করি, পোষাক পরি, তারপর গাড়ী ডাকতে বেরই। আমরা যে কিছুক্ষণের মধ্যেই কতদূরে চলে যাবো, যুদ্ধ শেষ না

হওয়া পর্যন্ত যে আমাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না, এমন কি একটা চিঠিও লেখা চলবে না, সে-কথা যেন দিদির মনেও পড়ে না।

ঘোড়ার গাড়ী করে যেতে যেতে ষ্টেশনের মাঝপথে হঠাৎ দিদি বলেন—হ্যাঁরে তোর টুপীর বাক্সটা নিস্ নি?—বলেই গাড়ী থামিয়ে পায়ে হেঁটে সেই জ্বর গায়ে দিদি টুপীর বাক্স আনতে ছুটলেন। আমরা গাড়ী ফিরিয়ে যে বাক্সটা আনতে যাবো সে স্বাধীনতাও আমাদের দিলেন না। সব কাজ তাঁকে নিজেকে করতে হবে, সব দিকে তাঁর নজর, কারো সামান্য অসুবিধা তিনি এক মুহূর্ত সহ্য করতে পারেন না।

ষ্টেশনে যখন পৌছলাম, তখনো গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টাখানেক দেরী। শুল্ক-বিভাগের সেই ইহুদী অনুচরটি মুখ কাঁচু-মাচু করে যে-কথা ব্যক্ত করলে তাতে সেদিন যাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ আশা আছে বলে মনে হলো না। বললে—বাক্সগুলো আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আজ সকালে শীল করিয়েছি। খানিক্ষণ আগে আনতে গিয়ে দেখি গুদোমঘরের দরজা বন্ধ।

অর্থাৎ?

তাইতো ভাবছি, কী করা যায়। আপনাদের এ-ট্রেণে যদি যাওয়া না হয় তো বিশেষ কোনো অসুবিধা হবে কী?

মেজাজ হারিয়ে বলি, তামাসা রাখুন। গুদোমঘর কোথায়, চলুন তো। আমায় আজই যেতে হবে। চলুন।

সেই গাড়ীতে চড়েই অনুচরটি আমায় গুদামঘর দেখাতে নিয়ে যায়। ষ্টেশন থেকে অনেক দূরে রেলের গুদামঘর। পথ ফুরোয় না। বক্‌শিশের লোভে গাড়োয়ান আধমরা ঘোড়াটাকে মেরে মেরে প্রায় মেরে ফেলে। আজই আমায় যেতে হবে। ঘোড়াটার গায়ে বিদ্যুতের মত ছপ্‌টির পর ছপ্‌টি পড়ে, আমার প্রতিটি স্নায়ুতে সেই কশাঘাত অনুভব করি, তবুও আজই আমায় যেতে হবে।

গুদামঘর সত্যিই বন্ধ। জার্মান দারোয়ান চাবী দিয়ে সেই যে কোথায় বীয়ার খেতে গেছে এখনো তার দেখা নেই। হঠাৎ মনে পড়লো, আমার কাছে উৎকোচ গ্রহণ করবার এ হয়তো শেষ কারসাজি। অনুচরটির হাতে কিছু দিয়ে বলি—যান্ ডেকে নিয়ে আসুন দারোয়ানকে। —খানিক্ষণ ধরে সে বারংবার আপন অসামর্থ্য জ্ঞাপন করে শেষকালে বললে, চেষ্টা করে দেখতে পারে। তারপর সেও সেই যে কোথায় উধাও হলো তার আর দেখা নেই। গাড়ী ছাড়বার তখন মাত্র আধ ঘণ্টা দেরী। একটু পরে দেখলাম দূরে অনুচরটি কাকে সঙ্গে নিয়ে আসছে। তাব সঙ্গীর কোনো তাড়া নেই, গজেন্দ্র গমনে নানা আপত্তি জানাতে জানাতে আমাদের দিকে আসছে।

সটান তার কাছে ছুটে গিয়ে কোনো বাক্যাড়ম্বর না করে বামহস্তে মোটা দক্ষিণা অর্পণ করতেই সে ক্ষিপ্র পদক্ষেপে গুদামঘরে গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঐ প্রকাণ্ড গুদামঘর থেকে বাক্সগুলো নিয়ে এসে আমাদের গাড়ীতে চাপিয়ে দিলে, এবং হাসি মুখে শুভযাত্রা জ্ঞাপন করতেও ভুললে না।

আবার সেই আধমরা ঘোড়াটাব পিঠে ছপ্‌টির পর ছপ্‌টি পড়ে। রেলের লাইন পার হয়ে, কাদা ভেঙে, মাঠ পার হয়ে, পোড়া বাড়ীর ছাইয়ের গাদার ওপর দিয়ে গাড়োয়ান যখন ষ্টেশনের সামনে পৌছে দিলে তখন ট্রেণ ছাড়তে মাত্র দশ মিনিট বাকী। দিদি টুপীর বাক্সটা হাতে নিয়ে একটা থামে হেলান দিয়ে কোনো রকমে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন।

ভাবশেত্র আমার এই শেষ দশ মিনিটের স্মৃতিতে হাজার রকমের চিত্র ও ঘটনা আজো মুদ্রিত হয়ে আছে। মাল-পত্র নামানো, টিকিট কাটা, মার্ক্ কেনা, জার্মান সৈনিকদের কুচকাওয়াজ, ষ্টেশনের চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ, ফল্ক্স্-ডয়েচদের সাহেবীয়ানা, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভিখারীদের পিঠে চাবুকের ঘা, পোলীয় রেল কর্ম্মচারীদের হতাশ্বাস-ভরা মুখের প্রকাশ, স্থানে স্থানে ভদ্র ভিখারীদের গোপনে যাচ্ঞা, অনাহার-ক্লিষ্ট, মুটেগুলো বাক্স মাথায় নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ট্রেনের দিকে চলেছে, আর আমরা যে মালপত্র নিয়ে বিদেশে চলেছি সেই আমাদের দিকে চেয়ে-থাকা হাজার চোখের ক্ষুব্ধ, অভিমান-ভরা দৃষ্টি। এরই মধ্যে মনে পড়ে একটি দৃশ্য।

প্লাটফর্মের কাদার ওপর বসে একটি পোল সৈনিক বাঞ্জো বাজিয়ে ভিক্ষা করছে। তার দুটি পা যুদ্ধে কাটা গেছে, গায়ে শতছিন্ন পোলীয় উর্দি, মাথায় সামরিক টুপীটা তেরচা করে বসানো, তার জীবনে যে হারাবার তার কিছুই নেই এইটুকুই যেন সে জোর গলায় ব্যক্ত করতে চায়। সে এক মনে সুরের পর সুর বাজিয়ে চলে, যা মনে আসে তাই, কখনো "ও কারো মিও," কখনো "লা দন্না এ মবিলে," কখনো পোলীয়

"মাজু র," কখনো "কুয়াভিয়াক্"। হঠাৎ কানে আসে সে পোলীয় জাতীয় সঙ্গীতের সুর বাজাতে শুরু করছে "পোল্‌স্কা য়েশ্চে ন্যে জ়গিনেঁলা" (পোল্‌স্কা হারায় নি আজও)। সেই পরিচিত সুর যার উন্মাদনায় সহস্র সহস্র পোল হাসি মুখে যুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়েছে। সেই সুর শুনে স্টেশনের জার্মান সান্ত্রী বন্দুকের বাঁট উঁচিয়ে তার মাথায় বসিয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়। তার চোখে পড়ে উরুমুল পর্যন্ত কাটা দুটো পা কৌপীনের মত করে পরা এক টুকরো পেণ্টুলেনের ভেতর থেকে যেন কুৎসিত মুখভঙ্গি করে তাকে উপহাস করছে। ভিখারীর বাজনা থামে না, সে সান্ত্রীর মুখের দিকে দিকে চেয়ে সেই একই সুর বাজিয়ে চলে। সে এক অদ্ভুত স্নায়ুর যুদ্ধ। একের অস্ত্র বাঞ্জো অপরের অস্ত্র বন্দুক। শেষ পর্যন্ত কী হলো জানি না। ট্রেন ছাড়বার দেরী নেই। কামরায় বাক্সগুলো কোনোরকমে তুলে দিয়ে উঠে পড়তেই গাড়ী ছেড়ে দিলে। জানালা দিয়ে দেখি মামুস্যা আর দিদি আমাদের দিকে হাসিমুখে চেয়ে আছেন। শেষ পর্যন্ত ওঁরা আমায় বিদায়ের বিষাদটুকু পর্যন্ত অনুভব করতে দিলেন না। পা-কাটা ভিখারীটা সমানে বাজিয়ে চলেছে :

পোল্‌স্কা হারায় নি আজও।
Polska jeszcze nie zginęła.

কলিকাতা, শ্রীপঞ্চমী ১৩৪৯—বোম্বাই, ৫ই ফাল্গুন ১৩৫০।

পোল-ভাষার উচ্চারণ

পোলীয় ও অন্যান্য স্লাভ ভাষা-সমূহেব উচ্চারণ সংস্কৃত-জ ভাষা-সমূহেরই অনুরূপ। বাংলা ও পোল-ভাষাব মধ্যে যে পার্থক্য তা এই গ্রন্থে অক্ষরের নীচে বিন্দুর সাহায্যে বা অন্য উপায়ে প্রকাশ কবতে চেষ্টা করেছি। যথা :

জ়	=	ইংবেজী z.
ঝ়	=	ফবাসী j.
ভ়	=	ইং v.
য্যী = y	=	উচ্চাবণ য-ফলা এবং দীর্ঘ ঈ

গ্রন্থকারের সর্ববিধ সতর্কতা ও প্রয়াস সত্বেও বইখানিতে বহু ছাপাব ভুল রয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত এই যে, প্রবাসে বাংলা লেখা যায়, কিন্তু মুদ্রাকরের ভ্রম সংশোধন করা, যেমন পোলরা প্রায়ই বলে থাকে, "ছিন্ন মস্তকের দিবা-স্বপ্ন।"



গ্রন্থকার



Cover engraved and printed by
The Gaya Art Press Calcutta